নারী জাগৃতি ও বাংলা সাহিত্য

জ্ঞানেশ মৈত্র

ন্যাশনাল পাবলিশার্স
২০৬, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

॥ সূচীপত্র ॥

● **চতুর্থ অধ্যায়** (১৮৭২—১৮৯১)

● **পঞ্চম অধ্যায়** (১৮৯১—১৯২০)

● **ষষ্ঠ অধ্যায়** (১৯২০—১৯৪৯)

উৎসর্গ

পিতৃদেব

আচার্য দেবেন্দ্রনাথ মৈত্রের

স্মৃতির উদ্দেশে—

প্রকাশ আসন্ন

- মুসলমান নারী—সমাজ ও সাহিত্যে
- নব্য-হিন্দু আন্দোলন—সমাজ ও সাহিত্যে

॥ লেখকের কথা ॥

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে আধুনিক বাঙালীর সৃষ্টি যতখানি পুরুষের, ততখানি নারীর নয়। তবুও মহিলা সাহিত্যিকদের অবদান অবহেলনীয় নয়, বরং বহুক্ষেত্রে নতুন কয়েকটি চেতনা তাঁরাই সঞ্চারিত করেছেন। বাঙালীর আধুনিক ইতিহাসে মানবতাবোধ ও গণতান্ত্রিকবোধ মহিলা সাহিত্যিকদের রচনা ব্যতীত সম্পূর্ণতা লাভ করত না। 'নারী জাগৃতি ও বাংলা সাহিত্য' সেই ইতিহাসের এক তথ্যনিষ্ঠ বিবরণ।

প্রথম অধ্যায়ে বৈদিক যুগ থেকে রামমোহনের আত্মীয় সভা প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত ইতিহাসে নারীর ধর্মীয় অধিকার, পরিবার ও সমাজে তার অবস্থান এবং পুরুষ শাসিত সমাজে পুরুষের নারী সম্বন্ধীয় প্রবণতাগুলির কথা বলার চেষ্টা করেছি। দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে ষষ্ঠ অধ্যায় পর্যন্ত আধুনিক যুগের আলোচনা।

উনিশ শতকের প্রথম দিকে নারীর ধর্মীয়, পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার অর্জনে পুরুষের ভূমিকা ছিল প্রধান। ধীরে ধীরে নারীরাও তাঁদের অধিকার অর্জনে তৎপর হয়েছেন। এর পিছনে যে সব আন্দোলন সক্রিয় ছিল তার ইতিহাস বর্ণনা করেছি। স্বাধীন ভারতে সংবিধান রচিত ও গৃহীত হবার কাল পর্যন্ত নিবন্ধটির আলোচ্য-পর্ব। সংবিধানে নারী ও পুরুষের সমানাধিকার স্বীকৃত হল। আমার উদ্দেশ্য ভিন্ন হওয়ায় সব লেখিকার সাহিত্য আলোচনার প্রয়োজনবোধ করিনি। সে কাজ ইতিপূর্বেই যোগ্যতর ব্যক্তির দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে।

তথ্যশূন্য বিশ্লেষণ ও বিশ্লেষণশূন্য তথ্য দুই বিভ্রান্ত। এই গ্রন্থে অনেক বিতর্কিত তথ্য সন্নিবেশ করেছি। আবার অনেক নূতন তথ্য সংগ্রহ করেছি যা এযাবৎকাল গবেষকদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। লক্ষ্যে পৌছনোর জন্যে পত্র-পত্রিকা, সংবাদপত্র, দেশী-বিদেশী গ্রন্থ এবং নানা সময়ের দার্শনিক চিন্তার ভাবতরঙ্গকে অবলম্বন করেছি।

এই গবেষণা কার্যে আমার শিক্ষাগুরু ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নির্দেশ ও উপদেশ সর্বদাই প্রেরণা জুগিয়েছে। ডঃ সুরেশচন্দ্র মৈত্র মহাশয়, গবেষণার সর্ব পর্যায়ে পরামর্শ দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন। শ্রী ভবেশচন্দ্র মৈত্র সব সময় আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন। এঁরা তিনজনেই আমার প্রণম্য। এই গবেষণার পরীক্ষক ছিলেন স্বর্গত আচার্য প্রমথনাথ বিশী এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ভূদেব চৌধুরী। অবনীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী উমাদেবী তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহকে ব্যবহার করতে দিয়েছেন। আর একবার তাঁকে প্রণাম করবার সুযোগ পাওয়া গেল।

শ্রীঅমলমোহন রায় আমাকে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের সন্ধান দিয়ে কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করেছেন। অধ্যাপক তরুণ রায়, অধ্যাপক সুবঞ্জন বিশ্বাস ডঃ অজয়কুমার ভট্টাচার্য, অধ্যাপক মোস্তাফা বিন-কাসেম, অধ্যাপক অসীমকুমার ভট্টাচার্য, ডঃ অমূল্যভূষণ চক্রবর্তী, শিবশঙ্কর চক্রবর্তী এম. এ., বি. টি., মুরারীমোহন মণ্ডল এম এ. গ্রন্থরচনায় নানাভাবে সাহায্য করেছেন। এরা সবাই আমার অকৃত্রিম বন্ধু। কল্যাণীয় অনিন্দ্য মৈত্র, সুনন্দ মৈত্র, কল্যাণীয়া মধুমিতা মৈত্র ও সঙ্ঘমিত্রা ভট্টাচার্য আমার গ্রন্থের প্রুফ দেখা ও নির্ঘণ্ট রচনায় সাহায্য করেছে।

কল্যাণীয় শ্রীবণেন বন্দ্যোপাধ্যায় আমার কৃতি ছাত্র। প্রকাশনার ব্যাপারে শ্রীমান এগিয়ে না এলে হয়ত গ্রন্থটির প্রকাশে আরও কিছুদিন বিলম্ব ঘটত। অগ্রজপ্রতিম শ্রীগণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে ঋণী রয়ে গেলাম। আলোচ্য গ্রন্থটি বহুলাংশে ইতিহাস নির্ভর। ইতিহাসের নানা সমস্যা নিয়ে যার সঙ্গে আলোচনা করেছি তিনি কিন্তু এই প্রকাশনার আড়ালে থাকতে চান। তাই তাঁকে আর বিড়ম্বনায় মধ্যে আনলাম না।

মুদ্রণ প্রমাদের জন্য লজ্জিত।

নিবেদন ইতি—

জ্ঞানেশ মৈত্র

১লা বৈশাখ

১৩৯৪

নারী জাগৃতি ও বাংলা সাহিত্য

॥ প্রথম অধ্যায় ॥

ভারতীয় সাহিত্যে নব-জীবন ও নারী-জীবন সম মর্যাদা না পেলেও সমগুরুত্ব পেয়েছে। নরনারীর যৌথ জীবনেই পরিবারের প্রতিষ্ঠা। পরিবারের বহুত্বে সমাজ গঠিত হয়। বিভিন্ন সমাজ নিয়েই এক ভূখণ্ডে এক মানব গোষ্ঠী একটা জাতিকে সৃষ্টি করে। সেই সুদূর বৈদিক যুগ থেকে উনিশ শতকের আধুনিক কালসীমা পর্যন্ত নারীর সামাজিক অধিকার এবং দেশের সংস্কৃতি ক্ষেত্রে তার অবদান সাহিত্য ও সংস্কৃতি ব্যাখ্যায় একটা বড় উপাদান। উনিশ শতকের নারীজাগরণের হঠাৎ উজ্জ্বল অধ্যায় দেখে আমরা যেন অতীত সম্বন্ধে অনবহিত না হই। ইতিহাস এক এক যুগে এক এক জীবনের অবারিত সুযোগ উপস্থিত করে। বৈদিক যুগের পর নারী এই সুযোগকে অটুট রাখতে পারেনি। প্রত্যেক জাতির জীবনে একটি মূল সুর থাকে, যা নানা বিপর্যয়ে কালে কালে রূপান্তরিত হয় কিন্তু কখনই অন্তর্হিত হয় না, কখন দৃশ্য কখন অদৃশ্য থাকে। ভারতের জাতীয় জাবনের মূল সুরটি হল ধর্ম। ভারতবর্ষের মানবজীবন জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নানা ভাবে ধর্মের কঠিন নিগড়ে আষ্টে পৃষ্ঠে বাঁধা।

ভারতসংস্কৃতির ঐক্যসূত্রটি হিন্দুধর্ম। হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে এই ঐক্যসূত্রটি বিষ্ণুর বৈদূর্যমণি ধারণের মত। পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকে জাতি বা গোষ্ঠা বিশেষের ধর্ম বা সাংস্কৃতিক জীবনের উৎকর্ষ সন্ধানে নারী-জীবনের মর্যাদার তারতম্যকে বিচারের মাপকাঠি ধরে থাকেন।

ভারতীয় ইতিহাসের ব্রাহ্মমুহূর্তে রচিত হয়েছে ঋক্‌বেদ। প্রাচীন ভারতের একমাত্র প্রামাণ্য গ্রন্থ। ভারতবর্ষে আর্যাকরণের প্রথম পর্যায়ে আর্যরা অনার্য সভ্যতার মধ্যে প্রবেশ করে তাকে আত্মগত করেছে, নূতন রূপ দিয়েছে।

উনিশ শতকের সামাজিক প্রেক্ষাপটে যে নারীকে দেখি তা কোন বিশেষকালের সামাজিক পরিস্থিতির পরিণতি নয়, বরং দীর্ঘকালের সঞ্চিত বিধি-বিধানের সামগ্রিক রূপ। নারীর নারীত্ব থেকে দাসীত্বে অধঃপতন কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। ভারতের সুদীর্ঘকালের ইতিহাস যেমন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের উত্থানের ইতিহাস তেমনি আবার নারীর শূদ্রত্বে পরিণত হবারও ইতিহাস।

উনিশ শতকের বাংলাদেশে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও শিক্ষার আলোকে সমাজকে নূতন

করে দেখার ও নূতন করে গড়ার প্রেরণা দেখা দিয়েছিল। এ কালের সামাজিক আন্দোলনের কর্মসূচীতে অনেকখানি স্থান অধিকার করেছে সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, বিধবাবিবাহ, বহুবিবাহ, অসবর্ণবিবাহ, জাতিভেদ, অবরোধ প্রথা ও অশিক্ষা প্রভৃতি নারীমুক্তির প্রশ্ন ও প্রয়াস। উনিশ শতক উপলব্ধি করেছে নারী জীবনের অনগ্রসরতা, সমগ্র সামাজিক জীবনের অনগ্রসরতা। সমাজ ও সংসারে নর-নারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য যৌথ। একের বিকাশ ব্যাহত হলে সমাজের সামগ্রিক অগ্রগতিই ব্যাহত হয়। নবজাগরণের অনেকগুলি লক্ষণের মধ্যে অন্যতম অতীত-অবগাহন এবং বুদ্ধিবাদী মন নিয়ে তার বিশ্লেষণ। এই বিশ্লেষণে বৈদিকযুগ ও জীবন সম্বন্ধে কৌতূহল স্বাভাবিক।

নূতন যুগের নূতন মন্ত্র বোঝবার মত শিক্ষা বা সামাজিক পরিমণ্ডল তখনও সৃষ্টি হয়নি। কোন দেশেই তা অকস্মাৎ সৃষ্টি হয় না। অষ্টাদশ ও উনিশ শতকের ব্রাহ্ম মুহূর্তে নারী-বিধি-বিধানের শরশয্যায় শায়িত। এই শরগুলি একদিনে নিক্ষিপ্ত হয়নি। ইতিহাসের দীর্ঘকাল পরিধির মধ্যে শরগুলিকে সন্ধান করতে হবে।

ভারতীয় সাহিত্য : নারীর অধিকার ও কর্তব্য

ঋক্‌বেদের যুগে পুরুষের পাশে সমমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল নারী। সভ্যতার এ পর্যায়ে রাজনৈতিক সম্প্রসারণ ছিল বড় কথা। গোষ্ঠীচেতনা তখন বৃহত্তর সমাজ-চেতনার দিকে যাত্রা করেছে। সেখানে বৈধ-অবৈধ সূক্ষ্ম বিভাজনের চেয়ে চলার বেগটাই বড়। এ যুগে ধর্ম পরিবার ও সমাজকে সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করেনি। পুণ্যবানের জন্য স্বর্গ ও পাপীর জন্য নরক তখনও রচিত হয়নি। নারী পুরুষের মিলনে কোন সংস্কারকে প্রাধান্য দেওয়ার চেয়ে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি চরিতার্থ ও প্রজাবৃদ্ধির উপায় বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল। বিবাহকে আধ্যাত্মিক ভাবাবেগে ঊর্দ্ধগ না করে, পারিবারিক তথা সামাজিক প্রয়োজনটাই বড় করে দেখা হয়েছে। সম্প্রসারণের যুগে পুরুষেরা যুদ্ধক্ষেত্রে যখন শত্রুর মোকাবিলায় ব্যস্ত, নারী তখন গোচারণ, কৃষিকর্ম, গৃহকর্ম, যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম—এক কথায় যাবতীয় উৎপাদন ব্যবস্থার একচ্ছত্র অধিষ্ঠাত্রী। ঊষা স্তোত্রে নারীকে দেখি পরিবারের নেত্রীরূপে, পরিবারের সকলকে পালন করছেন। সপত্নীর উল্লেখ থাকলেও বহুবিবাহ সামাজিক আদর্শ নয়। বিধবা বিবাহের প্রচলন ছিল।[১]

ঋক্‌বেদে নারীদের রচিত সূক্তগুলি পুরুষের রচনা থেকে ভিন্ন স্বাদের। "বৈদিক নারী ঋষিগণের সূক্তসমূহ অধিকতর স্থূল, স্পষ্ট, সজোর ও অসঙ্কোচ, ভাবালুতার ধোঁয়া তাহাতে নাই, প্রকৃত কথা বলার মত সাহস তাহাদের ছিল।"[২] নারীদের কাম্য ছিল

পতিপ্রেম, বিবাহিত জীবনের সুখকেই তারা শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে মনে করেছেন। সমালোচক ওয়েবার মন্তব্য করেছেন—

"As regards love, its tender, ideal element is not very conspicuous; it rather bears throughout the stamp of an undisguised natural sensuality. Marriage is, however, held sacred; husband and wife are both rulers of the house (dampati), and approach the Gods in united prayer."[৩]

চর্মরোগাক্রান্ত স্বামী পরিত্যক্তা অপালা বা নিষ্পাপ জুহু যিনি পুরুষের উদ্‌ভ্রান্ত হৃদয় থেকে ছিট্‌কে পড়েছেন, কিন্তু শান্ত ও সহনশীল। বৃহস্পতি কন্যা রোমশা অগস্ত্যপত্নী, বিদর্ভরাজ কন্যা লোপামুদ্রা, বিশ্ববারা, শাশ্বতী, গোধা অকুণ্ঠভাবে আপন আপন অন্তরে নিগূঢ় কামনাকে ব্যক্ত করেছেন।

অথর্ববেদের যুগে সামাজিক পরিবর্তনের সূচনা হল। ভারতের আর্যদের একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হল। উৎপাদন ব্যবস্থায় নারীর স্থানে এল পুরুষ এবং দাস। যুদ্ধবন্দী দাসের শ্রম সহজলভ্য হওয়ায় এক নূতন সমাজ ব্যবস্থার উদ্ভব হল। সম্পত্তির অধিকার বংশ পরম্পরায় ভোগের আয়োজন হল। পিতৃত্বের প্রাধান্য নারীকে সন্তান উৎপাদনের যন্ত্ররূপে ব্যবহার করতে চাইলো। সন্তানকে 'আত্মজ', আত্মার প্রসূত রূপ বলে ধরে নেওয়ায় সন্তান পিতার সম্পত্তিতে পরিণত হল। সন্তান কামনার মধ্যে দাম্পত্য তথা পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের একটি বিশেষ মনোভঙ্গীর প্রকাশ পায়। ঋক্‌বেদে পুত্র সন্তানের কামনা আছে, অথর্ববেদের মত কন্যাসন্তানকে হেয় বা তাচ্ছিল্য করা হয়নি। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সমস্ত সংস্কার নারীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ছিল। অথর্ববেদের একাধিক সূক্তে দেখা যাবে, "In the male, indeed, grows (bhu) the seed; that is poured along into the woman; that verily is the obtainment of a son, the prajapati said."[৪]

পুত্র পরিবার ও সমাজে এক নূতন ধর্মীয় তাৎপর্যে প্রতিষ্ঠিত হল। ঐ পুত্র পিতা এবং পিতৃপুরুষের, ইহলোক ও পরলোকের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করলো এবং পুত্র পিতৃপুরুষকে 'পুন্নাম্' নামক নরক থেকে রক্ষা করবে। পুত্রকে গোষ্ঠীজীবনের মধ্যে সনাক্তকরণের জন্য পরিবার গঠিত হল। বিবাহ সংস্কারও ঠিক সেই কারণে দীর্ঘ এবং অবশ্য পালনীয় হল। স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য বলে ঘোষিত হল। অথর্ববেদে যাদু-মন্ত্র তন্ত্রের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। পুরুষের ভালবাসা পাবার, স্ত্রীকে ফিরে পাবার, নারীগর্ভ রক্ষার জন্য যাদুমন্ত্র ব্যবহৃত হয়েছে।[৫] পাপবোধ ও স্বর্গ সম্বন্ধে অহেতুক

মোহ সৃষ্টি হল। পাপ-পুণ্য, স্বর্গ-নরক ভাব সামগ্রী (idea) সমাজে তথা নারী জীবনে গুরুত্ব পেল। বহু বিবাহ প্রায় সর্বজনীন।[৬]

অথর্ববেদের যুগে ব্রাহ্মণ ইহ ও পরলোকের চালক।..."মহাকাব্যের পূর্ব পর্যন্ত যে বৈদিক সাহিত্যের ধারা নামিয়া আসিয়াছিল তাহা ষোল আনা ব্রাহ্মণ সাহিত্য মুলতঃ ধর্মীয়সাহিত্য।"[৭] এ যুগের সাহিত্যে যে ব্রাহ্মণকে দেখি তিনি— ..."acts like a physician, a mediator in love affairs, a purahit with the dignity of statesman, minister and director of the technique of war, an officiating priest in the domestic and sacrifical rituals and finally as a magician controlling the divine and demonic agencies for the benefit of his client."[৮]

বর্ণপ্রাধান্য ব্রাহ্মণের কাছে হল স্বর্ণ অলঙ্কার এবং অন্যদের ক্ষেত্রে হল লৌহ শৃঙ্খল। জাতিভেদ প্রথা ক্রমশঃ জীবিকা ও বিবাহ বিষয়ে (রোটি-বেটি) প্রাধান্য লাভ করলো।[৯] ব্রাহ্মণ্যগ্রন্থগুলিতে মুলতঃ যাগ-যজ্ঞের আচার-বিধির কথাই প্রাধান্য পেয়েছে। সমাজ বিকাশের এই পর্যায়ে ধর্ম ও সমাজ এমনভাবে মিলেমিশে ছিল যে তাদের পৃথক করা সম্ভব নয়। বরং জীবনের প্রকাশ ঘটতো ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে।

সমাজে মর্যাদার উচ্চশিখর থেকে নারী পতনশীল প্রস্তরের মত নিম্নমুখী হয়েছে। ব্রাহ্মণ ও সংহিতা-সাহিত্য পতনের গতিকে বৃদ্ধি করেছে মাত্র।

"If the treatment of women is a criterion of civilization, then the civilization of the Brahmana texts can expect only adverse verdict from posterity."[১০]

ব্রাহ্মণ্য যুগে নারীকে বলা হল নির্ঋতি।[১১] কন্যা ক্রয়-বিক্রয়, দাসীকে দান সামগ্রীর সঙ্গে দেওয়া স্বাভাবিক ঘটনা ছিল।[১২] প্রকাশ্য সামাজিক অনুষ্ঠানে নারীর যাতায়াত বন্ধ হল।[১৩] গৃহে সেই নারীই সকলের প্রিয় এবং সম্মানের পাত্রী যিনি শ্বশুরের সামনে নিজেকে অনাবৃত রাখেন না এবং স্বামী বা গুরুজনদের কোন কথায় প্রতিবাদ করেন না।[১৪] ব্রাহ্মণ্য যুগে বাইরের জগৎ নারীর কাছে বন্ধ হল এবং অন্তঃপুরেও অবগুণ্ঠনের অবতারণা হল। পুরুষের ক্ষেত্রে বহু বিবাহ প্রচলিত হল, নারীর ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ হল। যাজ্ঞবল্কের দুটি স্ত্রী, মনুর দশটি, দশরথের তিনটি এবং হরিশ্চন্দ্রের একশতটি স্ত্রী ছিল। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে নারীর হাতের খাবার গ্রহণ নিষিদ্ধ হল।[১৫] পুরুষের সঙ্গে একত্রে আহার করতে নিষেধ করা হল।[১৬] পুরুষের আহারের পর নারীদের আহার শাস্ত্রসম্মত বলে বিবেচিত হল। শতপথ ব্রাহ্মণে নারীকে পুরুষের

সাথে যজ্ঞে অংশ গ্রহণের জন্য 'ব্রতোপনয়ন'-এর বিধান দেওয়া হয়েছে।[১৭] নারী দেহের বিশেষ অংশ অপবিত্র, কুশরূপ শুদ্ধবস্ত্র দ্বারা তাকে পবিত্র করা হচ্ছে। "Impure indeed is that part of woman which is below the naval."[১৮] ব্রাহ্মণ্য যুগে নারীকে তুলনা করা হল জুয়া ও পাশাখেলার সাথে। তার স্থান হল শূদ্র, কুকুর ও কাকের সারিতে।[১৯] বিবাহ বাধ্যতামূলক হল। বিবাহ ব্যতীত নারী ও পুরুষের যজ্ঞে অধিকার থাকত না। একই পরিবাব ও সগোত্রে বিবাহ বন্ধ হয়ে গেল। পরবর্তীকালে বৌধায়ন দেশ ও জাতির প্রাধান্য দিলেন এবং আপস্তম্বগোত্র প্রবব নিয়মের প্রবর্তন করলেন।[২০]

ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিতে ধর্ম উদযাপনে নারীর স্বাধীনতা, পরিবারে নারীর গুরুত্ব এবং স্বামীর জীবনে তার মর্যাদার কথা বলা হয়েছে।[২১] অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা ক্ষেত্রেও নারীকে দেখা যাবে।[২২] পরক্ষণেই বলা হল নারী স্বামীর অনুবর্তিনী হবে। পরবর্তীকালে নারী আর সহধর্মিণী রইলো না, হল জীবনের সর্বক্ষেত্রে নির্ভরশীলা গৃহমুখী রমণী।

বাহ্মণযুগে যাগযজ্ঞ বিধি যেমন চবম উৎকর্ষতা লাভ করেছে তেমনি ব্রাহ্মণ্য শক্তিও অপ্রতিদ্বন্দী হয়ে উঠেছে। ভিন্‌তারনিজ্ বলেছেন, "Two kinds of Gods there are, indeed, namely the Gods are the Gods, and the learned and studying Brahmins are the human Gods."[২৩]

অগ্নি যজ্ঞের উপকরণ বহন করে নিয়ে যায় দেবতাদের কাছে। ব্রাহ্মণরূপী দেবতা দক্ষিণারূপ দান গ্রহণ করছেন। ব্রাহ্মণরূপী দেবতার মর্মভেদী বাণগুলি নিক্ষিপ্ত হয়েছে সমাজের দুর্বলতর শ্রেণী নারীদের উপর। সভ্যতা বিকাশের একটি বিশেষ পর্যায়ে নারীকে স্থাবর সম্পত্তি বলে গণ্য করা হত। কন্যা সমাজের শক্তি বৃদ্ধি না করে বোঝা হয়ে উঠতো।[২৪] পরিবার ও সমাজে কন্যার কোন মর্যাদা রইলো না। "The (son) is (a ship), well found to ferryover." পুত্রহীন কখনই স্বর্গলাভ করতে পারে না।[২৫] ভারতীয় দর্শনে কর্মবাদ প্রাধান্য পাচ্ছে এবং স্বর্গ ও নরক নামক দুটি কল্পিত স্থানের গুরুত্বও বেড়ে যাচ্ছে। পাপের শাস্তি নরক, পুণ্যের পুরস্কার স্বর্গ। ব্রাহ্মণ্য গ্রন্থগুলিতে একদিকে যেমন দেবতা ও ব্রাহ্মণ মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে, তেমনি স্বামী ও দেবতা মিলেমিশে একটি ইমেজ্ তৈরীর প্রস্তুতিও আরম্ভ হয়েছে।

উপনিষদে নারী সমাজের উচ্চ প্রকোষ্ঠে অবস্থান করছে। শিক্ষা এবং উচ্চতর জ্ঞান চর্চায় পুরুষের সমান মর্যাদা পেয়েছে। আবার তারই পাশে স্বামীর নির্দেশ অমান্য-

কারিণী অবাধ্য স্ত্রীকে বশে আনার জন্য দৈহিক বলপ্রয়োগ করার বিধান দেওয়া হয়েছে[২৬]। উপনিষদে পুত্র দার্শনিক তাৎপর্যে উন্নীত হল। "পিতার দুইটি আত্মা-এক স্বকীয়, দুই পুত্রদেহ, তন্মধ্যে উক্ত পিতার এই পুত্ররূপী দেহটি পুণ্য কর্ম সম্পাদনের জন্য নিজের প্রতিনিধি রূপে গৃহে স্থাপিত হয় ..."[২৭]। উপনিষদে নারীর সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে পরস্পর বিরোধী কথা আছে। সম্ভবতঃ নানা কালের সমাজ জীবনের কথা এতে স্থান পেয়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে।

মহাকাব্যের বিশাল পটভূমিকায় বিচিত্র নর-নারীর সমাবেশ ঘটেছে। মহাকাব্য-গুলির পূর্বে এমন বিস্তৃত সমাজচিত্র আর দেখা যায় না। সমাজ বিবর্তনের ইতিহাসে গ্রন্থদুটির মূল্য অধিক। অবশ্য প্রক্ষেপেরও অন্ত নেই।

মহাভারতে কন্যার জন্মকে হেয় করা হয়নি। রামায়ণে একমাত্র ঋষির আক্ষেপবাণী (কন্যাপিতৃত্বং দুঃখ হি সর্পেষাং মনোকাঙ্ক্ষিনাম—উত্তরকাণ্ড ১।১৮) ব্যতীত আর কোথাও কন্যাকে পুত্রাপেক্ষা হেয় করার নিদর্শন নেই। কন্যা জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত পুত্রের মত একই ধর্মীয় সংস্কারের বশীভূত ছিল। হস্তিনাপুরের রাজকোষের ভার ছিল দ্রৌপদীর উপর, গান্ধারী মন্ত্রনা সভায় সততই উপস্থিত থাকতেন।

মহাকাব্যদ্বয়ে একাধিক নারীকে স্বয়ংবর সভায় পতি নির্বাচন করতে দেখি। এই নির্বাচন প্রাপ্তযৌবনা ব্যতীত সম্ভব নয়। কুন্তি বিবাহের পূর্বেই কর্ণের জননী হয়েছিলেন। বর্ণ প্রাধান্য থাকলেও সব সময় তা মানা হত না। কন্যা সর্বগুণান্বিতা হলে উচ্চকুলের বধূ হতে তার বাধা নেই।

রামায়ণ-মহাভারতের যুগে 'স্ত্রী স্বাতন্ত্র্য নিন্দিত হয়েছে। 'নাস্তি স্ত্রীলোকে স্ত্রী-কাচিৎ যা বৈ স্বাতন্ত্র্যর্মহতি।' (অনুঃ ২০।২০)। মহাকাব্যে বর্ণিত যুগে স্বয়ংবর সভা সাধারণ ব্যাপার হলেও অভিভাবকদের পতিনির্বাচনকেই প্রশস্ত বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। কন্যার পতি নির্বাচনকে 'আসুর ধর্ম' (অনুঃ ৪৫।৪-৯) বলে বিবেচিত হত। পণ প্রথা ও কন্যাশুল্ককে বিক্রয়ের সমান বলে গণ্য হত।

রামায়ণ-মহাভারতের পাতিব্রত্যধর্ম ও সতীত্বধর্ম পরবর্তীকালের নারী-জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। ধর্মাচরণে নারীর অধীকার অস্বীকার করা হল। 'পত্যাশ্রয়ো ধর্মোঃ স্ত্রীণাং লোকে সনাতন।' (অনুঃ ৫৯।২৭) অনুশাসন পর্বে পাতিব্রত্য ধর্মের লক্ষণ নির্দেশ করতে যেয়ে বলা হল—প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ, গৃহকর্মে নিযুক্ত থাকা, গোময় দ্বারা গৃহাদি শুদ্ধ করা, দেবতা ও অতিথির সেবা করা, শ্বশুর-শাশুড়ী ও অপর গুরুজনের সেবা করা। যিনি এই কর্তব্য পালন করেন তিনি 'স্বর্গলোকে মহীয়তে' (অনু ঃ ২৩।২০)। নববধূ গান্ধারীকে এই সব কর্মে রত দেখা যায়। মহাভারতের আদিপর্বে ভার্যার প্রশংসা

করতে যেয়ে বলা হল ভার্যা পুরুষের অর্ধেক, শ্রেষ্ঠ সখা, ধর্ম-অর্থ কামের মুল উৎস। কোন ভার্যা? যিনি সাধ্বী ও পতিব্রতা।

নিয়োগ-প্রথা বিবাহিত ও বৈধব্য দুই জীবনেই প্রচলিত ছিল। পুত্রবতী তারা দেবরকে পতিরূপে গ্রহণ করেছে। পাণ্ডু কুন্তীকে নিয়োগ দ্বারা পুত্র লাভ করতে বলেছেন। মাদ্রী নিয়োগ মাধ্যমে সন্তান লাভ করতে চাইলে পাণ্ডু তা সমর্থন করেননি। বলিপত্নী সুদেষ্ণা দীর্ঘতমার দ্বারা সন্তান লাভ করেছেন। আবার অম্বালিকা এই প্রথাকে মেনে নেননি এবং বিরক্তি প্রকাশ করেছেন। কিন্তু এই নিয়োগ বা দেবরকে পতিরূপে নির্বাচন প্রথা সমাজে প্রাধান্য পায়নি। স্বামী নিরুদ্দিষ্ট হলে পুনরায় বিবাহের (দময়ন্তী, উলুপী) কথা জানা যায়।

বৈধব্যের পরিণতি ছিল দুটি—ব্রহ্মচর্য ও সহমরণ। পাণ্ডুর মৃত্যুর পর মাদ্রী অনুমৃতা হলেন। কিন্তু কুন্তী দীর্ঘকাল সংযম ও পতিচিন্তায় মগ্ন থেকে অবশিষ্ট জীবন যাপন করলেন। বসুদেবের পত্নী দেবকী, ভদ্রা, রোহিনী, মন্দিরা অনুমৃতা হয়েছিলেন। খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় ও চতুর্থ শতকে পঞ্চনদের চারপাশে গ্রীকদের প্রভাব ছিল এবং গ্রীক প্রভাবিত অঞ্চলে অধিক সতীদাহ হত[২৮]। শঙ্করাচার্যও সতীদাহকে সমর্থন করেছেন। তিনি শ্রুতিতে কোন সমর্থন না পেয়ে স্মৃতিকে আশ্রয় করেছেন[২৯]।

মহাকাব্যদ্বয়ে বৈধব্যের যে চিত্র পাই তা সমাজের উচ্চ প্রকোষ্ঠের। সাধারণ দরিদ্র সমাজের বিধবাগণের বেলায় সে রকম মনে হয় না। এক ব্রাহ্মণী পত্নীর মুখে শুনতে পাই, ভূপতিত আমিষখণ্ডে শকুনিদের যেরূপ লোলুপ দৃষ্টি, পতিহীনা নারীও সেইরূপ অনেকেরই অভিলষিত। রামায়ণে কুম্ভীনসী রাবণের চরণ ধরে বললেন, "রাজা আমার ভর্ত্তাকে বধ করো না, কুলস্ত্রীদের পক্ষে বৈধব্য অপেক্ষা অধিক ভয় কিছু নেই।" বৈধব্য জীবন ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। একদিকে দুঃসহ যৌবনজ্বালা ও পুরুষের প্রলোভন আর একদিকে ব্রহ্মচর্যের কঠিন কঠোর নিয়ম। মহাভারতের আশ্রমবাসিকা পর্বে দেখি বিধবাদের কোন ভূষণ নেই, শুক্লবস্ত্র, শুক্ল উত্তরীয় মাত্র পরিধেয়। সাধারণ নারীদের সম্বন্ধে সর্বদাই 'সপরিচ্ছদা' বলা হয়েছে। সমাজের সাধারণ নারীরা স্মৃতির নির্দেশ মেনে চলতেন। নারীরা পতিলোকরূপ-পুণ্যস্থান লাভের আশায় স্বামীর মৃত্যুতেও স্বামীর স্বামিত্ব নষ্ট হয় না বলে মনে করতেন।

রামচন্দ্র আমাদের জাতীয় জীবনের আদর্শ পুরুষ। সীতা উদ্ধারের পর রাম সীতাকে বললেন—"…এখন আর তোমার প্রতি আমার আসক্তি নেই, তুমি যেখানে ইচ্ছা যাও।" তপোবনে লক্ষণকে সীতা গর্ভলক্ষণ দেখিয়েছেন[৩০]। নারী সম্বন্ধে পুরুষের ধারণা নিম্নগামী হয়েছে এবং নারী জীবনে অনিশ্চয়তার পদ সঞ্চারের সূচনা হল।

মনুর মতে সাধ্বী রমনীর ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিবাহ এবং নিয়োগপ্রথা শাস্ত্র সম্মত নয়[৩১]। নারদ ও পরাশর কিন্তু কিছুটা নমনীয় মত প্রকাশ করেছিলেন। মনু বললেন শ্রুতি ও স্মৃতির মধ্যে বিরোধ ঘটলে শ্রুতিকে প্রাধান্য দিতে হবে[৩২]। বৃহস্পতি বললেন স্মৃতি-কারদের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে মনুর প্রাধান্য মেনে নিতে হবে। মনু বললেন—

"বৈবাহিকে বিধিঃ স্ত্রীণাং সংস্কারো বৈদিক স্মৃতিঃ।
পতিসেবা গুরৌবাসো গৃহার্থোহগ্নিপরিক্রিয়া।"[৩৩]

মহাভারতের অনুশাসন পর্বের সঙ্গে এ নির্দেশ মিলে যায়। নারীর বিবাহই তার উপনয়ন। 'নাস্তি স্ত্রীণাং মন্ত্রৈঃ ক্রিয়া'—[৩৪]কেননা 'ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি'[৩৫] মনু কন্যার বিবাহের বয়স আট নির্দিষ্ট কবে দিলেন। ফলে নাবীকে শাস্ত্র আলোচনা, শিক্ষা-দীক্ষা, ব্রত-উপাচার থেকে দূবে সরিয়ে দেওয়া হল। বিবাহযোগ্যা কন্যার যে গুণ নির্দেশ করেছেন তা মিলিয়ে কন্যা নির্বাচন করতে ঠক্ বাছ্‌তে গাঁ উজাড় হবে। ঋতুমতী হবার তিন বছরের মধ্যে কন্যাকে বিবাহ না দিলে কন্যা স্বয়ং পতি নির্বাচন করতে পারবে। পরক্ষণেই বলছেন যোগ্য পাত্র না পেলে কন্যাকে বিবাহ দেবে না। এ রকম স্ববিরোধ বহু স্থলেই লক্ষ্য করা যাবে। মনু কন্যা শুল্ক দিতে বারণ করেছেন। সমাজে মনুর এ নির্দেশ রক্ষিত হয়নি। "Hiranyakesin, for instance, urges that the girl should be married while she is still naked (nagnika), that is to say, before she has learnt to wear cloth."[৩৬]

নারী মন্ত্রহীন, শিক্ষাহীন, স্বাধীনতাহীন হল। মেধাতিথি ধর্ম-অর্থ-কাম এই তিন ক্ষেত্রেই নারীর স্বাধীনতা অস্বীকার করেছেন।[৩৭] গৌতম বললেন, পশু-ভূমি এবং নারীর উপর একবার সত্ব জন্মালে তা কোনরূপেই নষ্ট হবে না।[৩৮]

"In many passages women and Sudras are bracketted together as in Parashar."[৩৯]

নারীর দৈহিক পবিত্রতা ও বিশুদ্ধ সন্তান লাভের জন্যই এইসব ব্যবস্থা। বিশুদ্ধ সন্তান দ্বারাই শ্রাদ্ধাদি ও ঔর্ধ্বদৈহিক কার্যলাভ হয়।[৪০] স্বামী ধনমান, কুলশীলাদিতে যতই হীন হোক সে দেবতা। ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব এবং পুরুষের পৌরুষ কোন অবস্থাতেই অস্বীকার করা চলবে না। মেধাতিথি নারীকে রাজদ্বারে সাক্ষী গ্রহণে নিষেধ করলেন। কারণ নারী চপলমতি। ভার্যা, পুত্র, দাস এবং শূদ্র 'অধম'। এদের অর্জিত ধন এরা যার অধীনে থাকবে তার হবে।[৪১] নারী 'নিরিন্দ্রিয়' অর্থাৎ বীর্য, ধৈর্য, প্রজ্ঞা ও বল তাদের নেই।[৪২] স্মৃতিকারদের শাসনের এক্তিয়ার সমাজ ও সমাজের বাইরেও প্রসারিত ছিল। কোন রকম অনাচার করে সমাজ থেকে পালিয়ে গেলেও রেহাই নেই।

নারদ ব্যভিচারী নারীর ক্ষেত্রে মস্তক মুণ্ডন করে, কুৎসিৎ অন্ন, মলিন বস্ত্র এবং নিকৃষ্ট কাজ করাতে বলেছেন। স্বৈরিনী নারী সমবর্ণের ভোগ্যা হবে। ঘর ছেড়েও নারীর মুক্তি নেই।

বিষ্ণু নারীদের একাকী পথের ধারে, জানলায় দাঁড়াতে নিষেধ করেছেন।[৪৩] মহাভারতে অন্তঃপুর বা অবরোধ প্রথার কথা জানা যায়। বাৎসায়ন[৪৪] ও কৌটিল্যে[৪৫] এর সমর্থন পাওয়া যাবে। পাণিনি অসূর্য্যম্পশ্যার উল্লেখ করেছেন। ক্লাসিক্যাল সাহিত্যেও অবরোধ প্রথার কথা বলা হয়েছে। ভাসের 'স্বপ্নবাসবদত্তা' এবং 'প্রতিমা' নাটকে অন্তঃপুর ব্যবস্থা ছিল। 'প্রতিমা' নাটকে রাজ্যের জনসাধারণ রাম-সীতার যুগলমূর্তি দর্শন করতে চাইলে রামচন্দ্র সীতাকে অবগুণ্ঠন উন্মোচন করতে বলেছেন। অভিজ্ঞান শকুন্তলায় শকুন্তলা অবগুণ্ঠনাবস্থায় রাজা দুষ্মন্তের সামনে উপস্থিত হয়েছিলেন।

শতপথ ব্রাহ্মণ ও ছান্দোগ্য উপনিষদ পুরাণকে পঞ্চমবেদ বলে অভিহিত করেছেন। পুরাণগুলি স্মৃতিশাস্ত্রের ভূমিকা নিয়েছিল এবং নারী ও শূদ্রকে ধর্মীয় অধিকার দিয়েছিল। বৌদ্ধ, জৈন, বৈষ্ণব ও শৈব ধর্মের প্রভাবে মোক্ষ ও মুক্তির প্রতি আকর্ষণ ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ায় পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে বিশৃঙ্খলা মাথা তুলছিল। হিন্দু ধর্মের উপর প্রবল আঘাত এসে পড়লো। আত্মরক্ষার জন্য সে যুগের সাহিত্যে রোমান্টিক পরিবেশ এবং প্রেম ভাবনার মোহময় চিত্ররূপের মধ্য দিয়ে ভোগের আয়োজন হল। পুরাণ সংসারধর্মকে প্রাধান্য দিয়ে সমাজ ও পরিবারকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধতে চাইলো। পুরাণগুলি গৃহকেই ধর্ম উপার্জনের যোগ্য স্থান বলে নির্দেশ করলো। "The control of women and Sudras was a very difficult problem··· the Jains and the Buddhists allowed greater freedom and facilities to women and Sudras."[৪৬]

নারীর একমাত্র আশ্রয়স্থল গৃহ। কূর্ম পুরাণে বলা হল গৃহেই জীবনের তিনটি পর্যায়ের বিকাশ সম্ভব। একমাত্র নারীই এই গৃহকে তাঁর সেবা, ত্যাগ, সতীত্ব ও স্বামীর প্রতি প্রশ্নাতীত আনুগত্য দ্বারা আদর্শ গৃহে পরিণত করতে সক্ষম। ব্রহ্ম বৈবর্তপুরাণে বলা হল পতির মত পরম গুরু, পরম বন্ধু, পরম প্রিয়, পরম দেবতা, পরম প্রাণ এবং পরম বস্তু এ জগতে আর নেই। গরুড় পুরাণে বলা হল গৃহকর্মে, প্রিয়ংবদা প্রতিপ্রাণা ও প্রতিব্রতা স্ত্রী সব সুখের আকর। পদ্মপুরাণের সৃষ্টিকাণ্ডে সতী অনসূয়া কুষ্ঠরোগী স্বামীর ইচ্ছা পূরণের জন্য তাকে কাঁধে করে গণিকার গৃহে পৌঁছে দেন। কাহিনীটির মধ্যে সতীত্বের আদর্শ কতখানি বড় হল জানিনা, কিন্তু নারী সেবাদাসীতে রূপান্তরিত হল। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে নারীকে শুদ্ধ এবং সংযত জীবনযাপনের পরামর্শ দেওয়া হল।

পতিব্রতা নারী পরগৃহ, সুবেশ পরপুরুষ, যাত্রা উৎসব, নৃত্যগীত, পরের লীলাবিলাস কদাচ দর্শন করবে না। গৃহের বাইরের বৃহৎ জগতের দ্বার নারীর সামনে বন্ধ করে দেওয়া হল। পুরাণে বর্ণাশ্রম ধর্মকে বৈদিক ধর্ম বলে বোঝান হল। নারীর মধ্যে পুরাণ দুটি রূপ দেখতে পেল স্ত্রী এবং জননী। বিবাহ নারী জীবনের অবশ্য পালনীয় সংস্কারে পরিণত হল। ব্রহ্মাণ্ডস্থ প্রত্যেক স্ত্রীলোক প্রকৃতির অংশবিশেষ। পুরুষ স্ত্রৈণ হলে তার জ্ঞান, তপস্যা ও যশ ব্যর্থ হয়। স্বামী বিষ্ণুস্বরূপ। তার পূজা ও ধ্যানই বৈধব্য জীবনের পবিত্র কর্তব্য। সতীদাহকে নৈতিক দিক থেকে সমর্থন না করলেও আত্মত্যাগই নারীজীবনের একমাত্র লক্ষ্য। এই বোধির দ্বার দিয়েই দেহত্যাগ (সহমরণ) প্রসঙ্গটি ঢুকে পড়েছিল। পুরাণে মানুষ ও দেবতার পার্থক্য খুবই সামান্য। দৈবশক্তি, অক্ষয় স্বর্গ, অলৌকিক শক্তি প্রভৃতি ধারণাগুলি এবং দেবতা মানুষ মিলেমিশে এমন একটি পরিবেশের সৃষ্টি করা হল যা ইতিহাসের চেয়েও আকর্ষণীয়। মদালসা, শুক্লা, সাবিত্রী, উমা, সতী ও অনসূয়া প্রভৃতি চরিত্র এবং এদের দাম্পত্য জীবনের মূল্যবোধগুলি সমাজ ও পরিবারে আদর্শ হয়ে উঠলো।

ক্ল্যাসিক্যাল যুগে দেব ও মানবের স্থান-কাল-পাত্রের পরিবর্তন ঘটেছে। ইন্দ্র, বিষ্ণু এখন আর কেবল বীর নন্ প্রেমিকও। বৈদিক সাহিত্যে নারী-পুরুষের প্রেমের প্রেক্ষাপটে বীরত্বের কাহিনী আঁকা হয়েছিল। ক্ল্যাসিক্যাল যুগে বীরত্বের পটভূমিকায় আঁকা হয়েছে নারী পুরুষের রোমান্টিক প্রেমের কাব্য। ক্ল্যাসিক্যাল সাহিত্যের মূল সুর প্রেম। রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণে লক্ষ্য করা যায় রতি সুখ লালসার তীব্রতা, প্রবৃত্তির একচ্ছত্র আধিপত্য। কামের সাথে যুক্ত হল কলা অর্থাৎ কামকলা। শিল্প সাহিত্যে নারীর সচেতনতা শিল্পী মনে প্রাধান্য পেতে লাগলো। নায়িকা বহুক্ষেত্রেই গুণবতী। অথচ সমগ্র সাহিত্যে সে গুণের বিকাশ লক্ষ্য করা যাবে না। কালীদাসের মেঘদূত বৈধ প্রেমের শ্রেষ্ঠ কাব্য। নায়িকার বর্ণনা—

তন্বীশ্যামা শিখরিদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী
মধ্যে ক্ষামা চকিতহরিণী-প্রেক্ষণা নিম্ন-নাভিঃ।
শ্রোণী ভারাদলস-গমনা স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাং
যা তত্র স্যাদ্‌যুবতিবিষয়ে সৃষ্টিরাদ্যেব ধাতুঃ॥

অংশটির কাব্যসৌন্দর্য বহু আলোচিত। আলঙ্কারিকদের মতে রস কাব্যের প্রাণ। রসের ছয়টি অবস্থার মধ্যে শৃঙ্গার সর্বোত্তম। ক্লাসিক্যাল যুগের কবিদের কাব্যসমৃদ্ধি বা উৎকর্ষ শৃঙ্গারের বিলম্বিত লয়ে। "The tendency of Sanskrit love-poetry towards a highly erotic descriptions of feminine charms and its

essentially realistic view of love as a passion explain partly the Indian conception and idea of feminine beauty. The physical charm of men seldom directly described….”[৪৭]

পুরুষের মন ভোলানো, চিত্তে কামনা-বাসনা জাগিয়ে তোলার জন্যে নানা ছলা-কলা প্রয়াস প্রচেষ্টা নারীকে সযত্নে অর্জনে প্রয়াসী হতে হল। রচিত হল বাৎসায়নের কামসূত্র, রতিরহস্য প্রভৃতি গ্রন্থ। ‘স্বপ্নবাসবদত্তায়’ সে যুগের প্রসাধন সামগ্রীর এক বিস্তৃত বর্ণনা পাই। নারীর কেশ-বাস, দেহসজ্জা, হাস্য-লাস্য, সলজ্জ ভঙ্গিমা সাহিত্যের অনেকখানি অংশ জুড়ে বসলো। এ যুগের সাহিত্যে দেব-মানব সকলের কাছে, জীবন এবং জীবনের কামনা-বাসনা চরম সত্য বলে বিবেচিত হল।

সংস্কৃতে নারী কবির অভাব নেই। প্রেম তাদের কাব্যের প্রধান সুর। তারা নিজেদের রূপসজ্জা, ভোগ-কামনার কথা বললেও পুরুষের চিত্ত চাঞ্চল্য সম্বন্ধে আক্ষেপ করলেও দোষারোপ করেনি।[৪৮] পুরুষ নারীকে ভোগের সামগ্রী রূপে দেখেছে বলেই, পুরুষের ইচ্ছা অনিচ্ছায় তার ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হয়। শ্রীহর্ষের বাসবদত্তায় উদয়ন বাসবদত্তার প্রেমে মুগ্ধ হলেও নারী সৌন্দর্য তার চিত্তে বিভ্রম ঘটায় এবং আত্মসমর্পণে বাধ্য করে। ‘মালবিকাগ্নিমিত্র’ সম্বন্ধে সমালোচকের মন্তব্য—“But the fancy of man is so fickle that the favour may lapse any moment. The husband did what he liked, and the wife implicitly obeys and quitely accepts his will. A new love of the husband means dethronement of the former for all practical purpose.”[৪৯]

নারী ভোগের উপকরণে পরিণত হল। পুরুষের ইন্দ্রিয়সুখ লালসা যতই বৃদ্ধি পেতে লাগলো নারীর দৈহিক শুচিতার উপর ততই জোর দেওয়া হতে লাগলো। এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি বাল্যবিবাহ।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলায় নারী ও তার সামাজিক অবস্থান

ব্রাহ্মণ্য শক্তির বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিরোধ গড়ে তুললেন গৌতম বুদ্ধ। ভারতীয় জীবন ও ভাবনার মধ্যে নূতন প্রেরণা সঞ্চারিত হল।[৫০] বৌদ্ধধর্মে জাতি-বর্ণ ভেদ না থাকায় সর্বস্তরের মানুষই ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দিত।

বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাবের পূর্বেই ঔপনিষদীয় দুঃখবাদের প্রভাবে বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠান পরিত্যক্ত হচ্ছিল এবং অন্তরের একাগ্রতা প্রাধান্য পাচ্ছিল। বৌদ্ধধর্মের

যাত্রাও এই সত্যকে অবলম্বন করে। পুরাতন মূল্যবোধগুলির তার যৌক্তিকতা রইলো না।

ইতিহাসেব দিকে তাকালে দেখতে পাবো যখনি কোন ধর্ম, বিশ্বাস বা আন্দোলন উপস্থিত হয়েছে নারীরা এগিয়ে এসে তার প্রধান সমর্থক বা প্রচারকের ভূমিকা নিয়েছে। বিনয়পীটক, সুত্তপীটক এবং থেরীগাথায় তিয়াত্তর জন ভিক্ষুণীর রচনা পাওয়া যায়। তাঁরা পূর্ব জীবনের দুঃখ দুর্দশার কথা বলতে যেয়ে সমকালের সমাজের কথাই বলেছেন।

বৌদ্ধধর্মে জন্মান্তরবাদ প্রাধান্য পায়নি বরং জন্মান্তর থেকে মুক্তিই তাদের কাম্য। বৌদ্ধদের নৈর্বেক্তিক কর্ম নারীকে পুত্র জন্মের দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দিল। পারলৌকিক ক্রিয়ার জন্য পুত্রের আর প্রয়োজন রইলো না। পুত্র না থাকলে পিতার সম্পত্তি ও বংশ রক্ষার অধিকার কন্যায় বর্তালো।[৫১]

বৌদ্ধ ভিক্ষুণীরা সমাজের নানা স্তর থেকে এসেছে। রূপলাবণ্যের অধিকারিনী বিম্বিসার মহিষী ক্ষেমা, প্রতিভাশালিনী বাগ্মী পটচারা, বুদ্ধমাতা গৌতমী, ঋষীদাসী (তিনবার বিবাহ করেও সংসারে সুখ পাননি), স্বামী হন্তা ভদ্রা, সুন্দরী গণিকা অম্বপালী, বিমলা, পদ্মাবতী, শলাবতী, অর্ধকালী তারা এরা সমাজের নানা স্তরের নারী।

বুদ্ধদেব বলেছেন, সমুদ্রের স্বাদ লবণাক্ত, ধর্মের স্বাদ স্বাধীনতা। বুদ্ধদেব নারীদের মঠজীবনের অধিকার দিলেও পুর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা দেননি। ভিক্ষুণীরা যে কোন বয়সের ভিক্ষুকে দেখলেই অভিবাদন জানাতে বাধ্য থাকতো। নারীদের জন্য বিশেষ কিছু নির্দেশও ছিল। বুদ্ধদেব মনে করতেন, যে ধর্ম নারীকে গৃহহীন করতে শেখায় তার সামাজিক মূল্য দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না।[৫২]

বৌদ্ধযুগে শিক্ষা-দীক্ষা, রূপ-গুণ, নৃত্য-গীতে অদ্বিতীয়া রমণীরা সর্বজন ভোগ্যা অর্থাৎ গণিকা হতেন। রাজগৃহ, বৈশালী, উজ্জয়িনী ও কাশীতে উপার্জনের জন্য তারা ভিড় করতেন।

বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের মধ্যে কোনই পার্থক্য ছিল না। "তারানাথের বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস এবং অন্যান্য তিব্বতী বৌদ্ধ ধর্মের সাক্ষ্য হইতে অনুমান হয়, বর্ণাশ্রয়ী হিন্দু ও বৌদ্ধদের মধ্যে কোন পার্থক্যই ছিল না।[৫৩] সামাজিক ব্যাপারে মনুর অনুশাসনই বলবৎ ছিল।" বৌদ্ধরা পৃথক সমাজ সৃষ্টি করিয়াছিলেন এমন কোন প্রমাণ নাই।'[৫৪] সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে নারীর অবস্থানগত তারতম্য ঘটেনি।

বাংলাদেশ চিরদিনই তন্ত্রপ্রভাবিত। স্মার্ত রঘুনন্দন স্মৃতির বিধান রচনা করতে যেয়ে তন্ত্রকে স্বীকার করেছেন। তন্ত্রে সর্বস্তরের স্ত্রী-পুরুষের সমানাধিকার স্বীকৃত। বামদেব্য উপাসনার বড় কথা, ধর্মসাধনে স্ত্রীলোককে পরিহার করা চলবে না। "সুখেন প্রাপ্যতে বোধি সুখং ন স্ত্রী বিয়োগতঃ।"[৫৫] বৈষ্ণব সুফী প্রভৃতি ধর্মে নায়ক নায়িকার প্রেম বা রতিসুখকে ভগবদুপাসনার রূপকে কল্পনা করা হয়েছে। মধ্যযুগে খৃষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যেও ফ্রাইয়ার (Friar) নারী পুরুষের যুগল বাঁধনের সাধনা।[৫৬] সাধন বেগের চেয়ে অবৈধ ভাবাবেগের দ্বারা পরিচালিত হত। এমন একটা সময় এসেছিল যখন কামশাস্ত্র ও তন্ত্রশাস্ত্রের মধ্যে কোনই ব্যবধান ছিল না। তন্ত্রশাস্ত্রে বলা হল মৈথুন পরমতত্ত্ব, সৃষ্টিস্থিতির কারণ, মৈথুন ব্যতীত সিদ্ধি সম্ভব নয়।[৫৭] নারী পুরুষের দেহগত মিলনের প্রক্রিয়া (আলিঙ্গন, চুম্বন, শীৎকার, অনুলেপ, রমন ও রেতোৎসর্গ) আধ্যাত্মিক মৈথুন ব্যাপারেও দেখা গেল।[৫৮] আধ্যাত্মিক সঙ্গমের ক্ষেত্রে জাগতিক প্রক্রিয়ার প্রাধান্য ঘটায়, সাধারণ সাধক সাধিকার ক্ষেত্রে তা দেহ সীমায় আটকে গেল। (স্বয়ম্ভু লিঙ্গং তন্মধ্যে সরন্ধ্রং ইত্যাদি, শক্তিনন্দতরঙ্গিনী, চতুর্থ উল্লাস, পৃ-৭০)। দেবীর রূপ বর্ণনা করতে যেয়ে নায়িকার রূপ বর্ণনা করেছেন। পীনোন্নত পয়োধরা ষোড়শী চপলা, চঞ্চললোচনা সদা মধু হাস্যময়ী নারী ভক্তির চেয়ে বাসনাকে জাগ্রত করে বেশি।[৫৯]

জননী রূপই বাঙালী নারীর একমাত্র সিদ্ধরূপ। মধ্যযুগের সাহিত্যে বিবাহ পূর্বরূপ, সমাজ বহির্ভূত রূপ। মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণবপদাবলী ও শাক্ত পদাবলীতে স্নেহবিগলিতা জননী যশোদা, মেনকা ও সনকাকে পাই।

বাংলা সাহিত্যে নায়িকা জন্মক্ষণেই স্বতন্ত্রা, স্বৈরিণী। তীব্র কামনা বাসনার সংরাগে সতত কম্পমান। চর্যাপদের নায়ক-নায়িকা প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার অংশীদার নয়। ডোম্বী, শবরী, চণ্ডালীর তীব্র সংরাগময়ী মদনবিহ্বলা রূপ পরবর্তীকালে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মদনজ্বালাময়ী রাধার মধ্য দিয়ে, ময়মনসিংহ গীতিকা হয়ে বৈষ্ণব পদাবলীর দীর্ঘ প্রবাহে যুক্ত হয়েছে।

আউল-বাউল-বৈষ্ণব সুফী এ সব দার্শনিক মতবাদ হিন্দুর হিন্দুয়ানির আঙিনার বাইরে। ভাবাবেগে এদের স্থান থাকলেও অন্দরমহলের আচার বিচারের জগতে অচ্ছুৎ। হিন্দুর প্রচলিত ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এরা বিদ্রোহ করেছিল। অন্দরের চারিদিকে যখন এক এক করে অর্গল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, বাইরের বিচিত্র কলতান যখন স্তব্ধ তখনি রসকলি আঁকা বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী খঞ্জনির তালে তালে বাঙলার আঙিনায় মেঠোসুরে সহজপিরীতির মধুর গানে কুলবধূদের মনকে ক্ষণিকের জন্য হলেও চঞ্চল করে তুললো।

বাংলা কাব্য সাহিত্যের উৎকৃষ্ট ফসল নারী হৃদয়ের স্বাধীনতার পলল মৃত্তিকায় ফলেছে। চর্যাপদের সহজ সুন্দরীর প্রতি উন্মত্ত শবরের কামনা 'কণ্ঠে লইয়া মহাসুহে রাতি পোহাই।' পরবর্তীকালের বাংলা সাহিত্যে নারী পুরুষের একান্ত মিলনের মধ্যে রজনী পোহানোর বাসনা পুরুষের কণ্ঠে ঘোষিত হয়েছে।

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে মুক্তির বন্যা এসেছিল। "মুক্তি কেবল জ্ঞানীর নহে, ভগবান কেবল শাস্ত্রের নহে, এই মন্ত্র যেমনি উচ্চারিত হইল অমনি দেশের যত পাখি সুপ্ত হইয়াছিল, সকলেই এক নিমেষে জাগরিত হইয়া গান ধরিল।"[৬০] হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে নারীরা ক্ষণকাল বিমূঢ় হয়েছিল। নারীরা পুরুষের পেছনে খঞ্জনি বাজিয়ে ধুয়ো গাইতো। অচিরেই নারী কণ্ঠ শোনা গেল।

তুমি যদি বল, পরাণ বধূঁ,
তবে, কুলে বা আমার কি।
ইঙ্গিত পাইলে, সব সমাধিয়া,
কুলে জলাঞ্জলি দি।
* * * * * *
কহে রসময়ী দাসী।[৬১]

নারী কেবল ভাবাবেগে গা ভাসিয়ে দেয় না। ধরা ছোঁয়ার বাস্তব সত্যটি জানতে ও পেতে চায়।

তুমি সে আমার, আমি সে তোমার
সুহৃৎ কে আছে আর।
খেদে রামী কয়, প্রাণনাথ বিনা,
জগৎ দেখি আঁধার।[৬২]

রমণীমোহন মল্লিক রামমণিকেই বাংলা সাহিত্যের প্রথম স্ত্রী কবি বলে মনে করেন। ইনি চণ্ডীদাসের সম-সহায়িকা, জাতিতে রজক কন্যা। চণ্ডীদাসের মত রামীও সহজিয়া পন্থী ছিলেন। চণ্ডীদাস-রামীর সম্পর্ক নিয়ে অপবাদ ছড়াল। উত্তর দিতে যেয়ে রামী বললেন—

বাসুলী দেবীর যদি কৃপাদৃষ্টি হয়।
মিছে কথা সেঁচা জল কতক্ষণ রয়॥
আপনার নাক কাটি পরে বলে বোঁচা।
সে ভয় করে না রামী নিজে আছে সাঁচা॥[৬৩]

প্রাচীনা স্ত্রী কবিদের মধ্যে ইন্দুমুখী, মাধুরী, গোপা, রসময়ী দাসী, রাসমণি, দুঃখিনী, শিবাসহচরী প্রভৃতি ভনিতায় আরও পদ পাওয়া গেছে। বহুপদে ব্রজবুলির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে সমাজের নেতৃত্বের হাত বদল হল। "হিন্দু সমাজের আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য, এই যুগে অনেক কুলস্ত্রী বৈষ্ণবমণ্ডলে গুরু বলিয়া গৃহীত হইয়াছিলেন। অদ্বৈত গৃহিনী সীতা দেবী, নিত্যানন্দের কনিষ্ঠা পত্নী জাহ্নবী দেবী, শ্রীনিবাস আচার্যের কন্যা হেমলতা ঠাকুরানী ইঁহারা বৈষ্ণবসমাজে শুধু অতিশয় মান্যই ছিলেন না, সপ্তদশ শতাব্দীর গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে একটা বড় অংশ অনেক সময় তাঁহাদের নির্দেশেই পরিচালিত হইত।"[৬৪] নিত্যানন্দ বিলাস, ভক্তিরত্নাকর ও প্রেম-বিলাস গ্রন্থে জাহ্নবীর মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়েছে। নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্রবধূ সুভদ্রা দেবী সংস্কৃতে শ্বশ্রূ ঠাকুরাণী জাহ্নবী দেবীর 'অনঙ্গকদম্বাবলী' নামে প্রশস্তি রচনা করে-ছিলেন। শ্রীনিবাস আচার্যের কন্যা হেমলতা বৈষ্ণব পদরচনা করেছিলেন। অষ্টাদশ শতকে ভবানী, হটি বিদ্যালঙ্কার, শ্যামমোহিনী দেবী, দ্রবময়ী দেবীর সংস্কৃত জ্ঞান ও রচনার কথা সবারই জানা ছিল।

বৈষ্ণবরা অন্তঃপুর প্রথা মানতেন না। নারী স্বাতন্ত্র্যকে মর্যাদা দিতেন। অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, শ্রীনিবাস, শ্যামানন্দের গৃহে নারীরা শাস্ত্রীয় আলোচনা করতেন। নাট্য-অভিনয় দর্শনেও কোন বাধা ছিল না। জাহ্নবী দেবী উৎসব ও শাস্ত্র আলোচনায় অংশ নিতেন। সীতাদেবী ও ইচ্ছাময়ীদেবী পদ রচনা করেছিলেন। বৈষ্ণবীরা উনিশ শতকে নারী শিক্ষা প্রচলনের পূর্ব পর্যন্ত নারী শিক্ষার একটি বিশেষ ধারা বহন করে এনেছিল।

চৈতন্যদেবের পর বৈষ্ণবসমাজে নৈতিক শিথিলতা লক্ষ্য করা যায়। নেড়া নেড়িরা বৈষ্ণবসমাজভুক্ত হওয়ায়, তাদের আচার-আচরণ, যৌনাচারের শিথিলতা বৈষ্ণব সমাজের মধ্যে সংক্রামিত হয় এবং নৈতিক অবনতি ঘটায়। "অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বৈষ্ণব-ধর্ম, সমাজ ও সম্প্রদায় ক্রমশই শিথিল হইয়া পড়িল, অলৌকিক 'উজ্জ্বলরস' লৌকিক জীবনের পাত্রে ক্রমেই গাঁজাইয়া উঠিতে লাগিল।"[৬৫]

নিত্যানন্দ দাসের 'প্রেমবিলাসে' জানতে পারি অদ্বৈত বৃদ্ধবয়সে বিবাহ করে-ছিলেন।[৬৬] মাধবধারী নিজেকে কৃষ্ণ নারায়ণ বলে প্রচার করতেন আর গোয়ালবধূদের সতীত্ব নাশ করতেন।[৬৭] নিত্যানন্দ বসুধারাকে বিবাহ করে জাহ্নবীকে যৌতুক পেয়ে-ছিলেন।[৬৮]

বৈষ্ণবদের দর্শনশাস্ত্রে ও সাহিত্যে পতিনিন্দা নেই, কিন্তু কুলবধূদের চিত্তবিকারের দৃশ্য আছে।

নববধূগণ দূরে রৈয়া
না ধরে ধৈরয গোরা চান্দ পানে চায়া॥[৬৯]

কুলবধূরা গৌরচন্দ্রের রূপের সায়রে ডুব দিয়ে আত্মবিস্মৃত হত। সোনার অঙ্গ ছোঁবার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়তো।

পুলকে ভরয়ে সব গা।
ঝাঁপয়ে বসন দিয়া তা।

'নরোত্তমবিলাসে'-ও দেখি—

চাঁচর কেশের ঝুটা পিঠেতে লোটায়।
কুলবতী কুলটা হইল হেরি তায়।

চৈতন্য পরবর্তী বৈষ্ণব সমাজ 'মৎস্যের ঝোল আর কামিনীর কোল' (নিত্যানন্দ) সম্বল করেছিল। দেবীবর ঘটকের কুল মর্যাদার অনুকরণে 'মালাচন্দনের' আয়োজন হয়েছিল। বলরাম দাস বলেছেন—'সংকীর্তন মাঝে নাচে কুলের বৌহারি।'

ইসলামের অনুপ্রবেশ ও বাঙ্গালী-নারী-সমাজ

মুসলমানরা বহিরাগত জাতি। ইতিপূর্বে ভারতে যে সব ধর্ম বা জাতির আবির্ভাব হয়েছিল তারা ভারতীয় সংস্কৃতির অঙ্গীভূত হয়ে গেছে। একেশ্বরবাদী মুসলমানদের ঈশ্বরের বহুত্বেই কেবল অবিশ্বাস নয়, অপোষহীন মানসিকতার সৃষ্টি করেছে। ভারতে যে মুসলমানরা এসেছিল বা পরবর্তীকালে ধর্মান্তরিত হয়েছিল সকলেরই দৃষ্টি কিন্তু মক্কাশরীফের দিকে ছিল।[৭০]

কোরআন্ নারী ও পুরুষ, বর্ণ বা জাতি সব ক্ষেত্রে সাম্যকেই বড় করে দেখেছে। কোরআনে নারী ও পুরুষ পরিপূরক।[৭১] পুরুষ নারীর আচ্ছাদন এবং নারীও পুরুষের আচ্ছাদন। মহম্মদ পুত্র এবং কন্যাকে সমভাবে পালন করতে বলেছেন।

বিবাহ সমাজ ও পরিবারে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। বিবাহে নারীর যে সব অধিকার ও মর্যাদাকে স্বীকার করে নেওয়া হয়, তাই তার সামাজিক স্থান ও অধিকারকে নির্দিষ্ট করে দেয়। মুসলমানদের বিবাহে দৈহিক অপটুত্বই একমাত্র বাধা। নারী পিতা ও স্বামী উভয়েরই সম্পত্তির অধিকারিনী হতে পারে। বিবাহে পাত্র-পাত্রী-উভয়েরই পূর্ণ সম্মতির প্রয়োজন। ইসলাম বিবাহ ও বিবাহিত জীবনকে অচ্ছেদ্য বলে মনে করেনি।

গোটা পারিবারিক জীবন একটা চুক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। চুক্তি ভঙ্গ করলেই বিবাহ বিচ্ছেদ। 'তালাক' শব্দটি উচ্চারণের মধ্য দিয়ে পুরুষ যেমন নারীর বিবাহিত জীবনের সব অধিকারকে অস্বীকার করতে পারে তেমনি দেন্‌মোহর দিয়ে ক্ষতিপূরণ করতেও বাধ্য থাকে।

আরবের বাইরে যখন ইস্‌লামের প্রসার ঘটলো তখন ইস্‌লামধর্ম স্থান-কাল অনুরূপ রূপান্তর ঘটতে লাগলো। একজন বিদেশী পরিব্রাজক ভারতীয় মুসলমানদের সম্বন্ধে লিখেছিলেন, ভারতীয় মুসলমানদের আচার-আচরণ তুরস্ক ও পারস্যের মুসলমানদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।[৭২] ভারতীয় সমাজ ও পরিবারে দ্রুত রূপান্তর ঘটতে লাগলো। বিবাহ ব্যতীত মুসলমান নারীর অস্তিত্বই ভাবা গেল না। "There are no instances of divorce or the remarriage of widows in the chronicles of the sufis".[৭৩] হিন্দুদের মত মুসলমান সম্প্রদায়ের নারীদেরও সতীত্ব, অস্তিত্বের চেয়ে বড় হয়ে উঠলো। পরিবারের বাইরের লোকেদের সাথে মেলামেশা বন্ধ হয়ে গেল। বিবাহে পণ প্রথা চালু হল। বিবাহ ব্যাপারে পাত্রীর ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোন মূল্য রইলো না। বিবাহ যোগ্যা কন্যার বিবাহ না হওয়াটা পারিবারিক অমর্যাদার বিষয় হল।[৭৪] মালিক মহম্মদ জৈসী বলেছেন, নারী এবং জমি তরবারির অধীন।[৭৫] যদি কোন নারী তার পতিশয্যার অবমাননা করে বা কোন অবিবাহিতা নারী স্ব-ইচ্ছায় নিজের সতীত্ব নষ্ট করে তার শাস্তি মৃত্যু।[৭৬] নারী পুরুষের সহজ স্বাভাবিক মেলামেশা নিন্দনীয় হল। ভারতে ধর্মান্তরিত মুসলমানরা তাঁদের পুরানো অভ্যাস ও বিশ্বাস সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করতে পারেনি। বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রথা চালু হল, কন্যার মনোনয়ন করার অধিকার থাকলো না। যে কোনো বয়সের পুরুষকেই নাবালিকা কন্যার স্বামীরূপে নির্বাচন প্রথা চালু হল। স্বামীর মৃত্যুর পর মুসলমান বধূরা হিন্দুদের মত মাথা কামাতো, রঙীন বস্ত্র অলঙ্কার প্রভৃতি বর্জন করতো। হিন্দুদের কৌলীন্য প্রথার মত অভিজাত শ্রেণীর সৃষ্টি হল। বিবাহ ব্যাপারে পারিবারিক মর্যাদা ও বিত্ত প্রাধান্য পেল। বিধবা-বিবাহ বন্ধ হল। নারী শিক্ষা অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হল। শাস্ত্রচর্চা নারীদের ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ না হলেও বাল্যবিবাহের ফলে তার প্রচলন স্বাভাবিক ভাবেই বন্ধ হল।

ভারতীয় মুসলমান সমাজে নারীর পরিচয় অবিশ্বাসিনী, চপলা। একজন বিদেশী ঐতিহাসিক মুসলমান পরিবারে বধূর অবস্থা বর্ণনা করেছেন—"The women are comfortable to the wills of their husbands, being truly no more

than the chief slaves. Dressing the victuals, and waiting till their lords have dined before they eat themselves."[৭৭]

বাৎস্যায়ন কৌটিল্য নির্দেশিত নারীদের দৈনন্দিন কর্মতালিকার সাথে মিলে যাচ্ছে।[৭৮]

কোরআন্ নারী-পুরুষ উভয়কেই আব্রু রক্ষা করে চলতে বলেছে। প্রকৃতপক্ষে নারীর আব্রু বা পর্দার ফলে সামাজিক অধিকার খর্ব হল। তুর্কীরা ভারতে প্রবেশের পর নারীরা সম্পূর্ণভাবে পর্দার আড়ালে চলে গেল। ফিরোজ তুঘলক ও সিকেন্দার লোদী নারীদের পবিত্র স্থানে ভ্রমণেব অধিকার হরণ করেন। মহিলাদের বোরকা ব্যতীত বাইরে যাওয়া নিষিদ্ধ হল। আকবর ঘোষণা করলেন—"...If a woman was found running about the lanes and bazars of the town, and while; so doing either did not veil herself, or allowed herself unvelied,... was to go to the other-side and become a prostitute."[৭৯]

ঢাকা-গাড়ী বা পাল্কী ব্যাতীত নারীদের ভ্রমণ নিষিদ্ধ হল। গৃহে 'জেনানা মহল' বলে একটি বিশেষ অংশের নির্মাণ কৌশল ক্রমশ প্রাধান্য পেতে লাগলো। 'জেনানা-মহল' অন্তঃপুরের আধুনিক সংস্করণ মাত্র। মহম্মদ বরকত উল্লা ভারতীয় মুসলমান হারেম্ সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন—"To say that a Moslem Harem is a pandemonium of misery, where women are caged like wild beasts, to toil and be tortured, is an assertion no less imaginary than a freak of fiction."[৮২] ইতিহাস কিন্তু তা বলে না।

এই পরিবেশকে মেনে নেবার শিক্ষাই মেয়েরা শৈশব থেকে পেয়ে আসে। প্রবীণা রমণী অনেক দুঃখে মন্তব্য করেন—"...she had been carried in as a bride and would be carried out as a corpse."[৮৩]
হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নারীরা জান্‌তো এটাই মা-ঠাকুরমার আমলের প্রথা, এটাই তাদের ভাগ্য এবং এটাই তাদের নারীধর্ম

মুসলমানরা যখন ভারতে প্রবেশ করলো তখন হিন্দুনারী অন্তপুরের প্রকোষ্ঠে বন্দিনী। একদল হিন্দু রাজধর্ম গ্রহণ করে সামাজিক ও রাজনৈতিক সুবিধা ভোগের চেষ্টা করতো। আর একদল জাতধর্ম নিয়ে দূরে সরে গেল। আলাউদ্দীন খিলজীর সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে সম্পন্ন হিন্দু গৃহস্থেরা দরিদ্র প্রজায় পরিণত হল। পুরীর মন্দিরে ও জাজনগরে নারীদের উপর নির্মম অত্যাচার হিন্দুদের মনোবল ভেঙ্গে দিয়েছিল। আঘাতটা এসেছিল নারীদের উপর তথা হিন্দুর পারিবারিক জীবনের উপর।

স্মার্ত্ত রঘুনন্দন বলেছেন বাংলা দেশে চতুবর্ণের মধ্যে দুটি বর্ণ আছে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র। মঙ্গলকাব্যে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ভাবের প্রকাশ থাকলেও তার নায়ক-নায়িকারা শূদ্র। মঙ্গলকাব্য মূলতঃ দেবতা ও মানবের কাহিনী। স্বর্গের সাথে মর্তের কাহিনীগত মিলরক্ষা মঙ্গল-কাব্যের, বিশেষতঃ শাক্ত মঙ্গলকাব্যের প্রধান লক্ষণ। শাক্ত সাহিত্যের এই বিশেষ লক্ষণটিই এর দোষ গুণের কারণ। দেবতাদের চরিত্র চিত্রণে স্বাভাবিক ভাবেই এসে পড়েছে সমাজের উচ্চশ্রেণীর কথা। শাক্তধর্মের উপর তান্ত্রিক ধর্মের প্রভাব সবচেয়ে বেশি। মারণ, উচাটন, বশীকরণ প্রভৃতি পরের অনিষ্ট সাধক ষট্ কর্মের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। পঞ্চ 'ম'-কারের বশবর্তী হয়ে সাধারণ মানুষ ব্যভিচার, সুরাপান, অনাচারে গা ভাসিয়ে দিয়েছিল। আগমবাগীশ কৃষ্ণানন্দ এবং শাক্ত তরঙ্গিণী প্রণেতা ব্রহ্মানন্দ গিরি 'বশিষ্ট' পদ্ধতি অনুসারে 'শৈব বিবাহের' প্রচলন করেন। মগ, আরাকানী, ভুটিয়া, তিব্বতী ও পাঠান রমণীরা শাক্ত সাধকের গৃহাঙ্গনে প্রবেশাধিকার পেয়েছিল। ব্রহ্মানন্দ গিরি ও নন্দকুমার পাঠানরমণীকে শক্তিরূপে গ্রহণ করেছিলেন।[৮৪] হিন্দু সমাজে নারী ও পুরুষের নৈতিক অবনতি ঘটেছিল। শিবের পদ্মবনে গমনের ইচ্ছা, ডোমনীকে দেখে কামজর্জর শিব, পদ্মবনে পদ্মার জন্মবৃত্তান্ত ও মনসাকে দেখে তার ভোগাকাঙ্ক্ষা, বেহুলাকে দেখে চিত্ত চাঞ্চল্য, তারকার সঙ্গে লখিন্দরের রসিকতা, বাসরে নারীদের বিবস্ত্র হওয়া প্রভৃতি খুব উচ্চ সমাজ সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে না। দেবীর ডোম রমণীর সাজে শিবকে অনুসরণ এবং তার বাহুবন্ধনে ধরা দেওয়া, শিবের কুচকামিনী সংসর্গ ইত্যাদি প্রমাণ করে সমাজের নিম্নশ্রেণীর নারীরা উচ্চশ্রেণীর পুরুষের ভোগের বস্তু ছিল। ঊষা-অনিরুদ্ধের কাহিনীতে, ঊষা চিত্রপটে অনিরুদ্ধকে দেখে তার মিলনাকাঙ্ক্ষা জাগে। স্বপ্নে তাদের মিলন হয় 'অবিবাহি গর্ভবতী-হৈল সেই দিনে।'[৮৫] দেব চরিত্রগুলিতে দেবত্ব দূরের কথা সাধারণ মানবিক গুণেরই অভাব ঘটেছে।

মধ্যযুগের শেষ অধ্যায় ও নারী সমাজ ঃ

মধ্যযুগের সাহিত্য ভোগের আবিলতায় মন্থর। অর্থের মানদণ্ডে সমাজে মানুষের মর্যাদা নিয়ন্ত্রিত হত। ধর্মীয় বিশ্বাস নষ্ট না হলেও তাতে ফাটল ধরেছে। বাঙালী গোষ্ঠীসর্বস্ব জীবন থেকে আত্মসর্বস্বতায় বিলীন হচ্ছে। যৌন-ব্যাভিচার, উৎকোচ, নৈতিক শৈথিল্য-মধ্যযুগের সাহিত্যে এ সবের বিপুল আয়োজন। সপ্তডিঙা ডুবে গেল, চাঁদ বেণে চরম বিপর্যয়ের মুহূর্তে বলছে—'চান্দো বলে অর্ধেক কড়ি বৈসায় খাইবো। আর অর্ধেক কড়ি আমি নটিরে বিলাইবো।' ভারতচন্দ্রের হীরার মুখে শুনি 'বন্ধু নাহি

কড়ি বই' কড়ি দিয়ে 'বুড়োর বিয়ে হয়', 'কুলবধূ ভুলে কড়ি দিলে।' উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তির বিকৃত রুচির সদম্ভ প্রকাশ প্রচণ্ড অবক্ষয়ের সামনে আমাদের দাঁড় করিয়ে দেয়। মঙ্গলকাব্যে নারী দেখলেই দেব মানবের পরিধানের বস্ত্র শ্লথ হয়ে যায়। কৌলীন্য-প্রথা, বাল্যবিবাহ, সতীদাহ, সতীন নিয়ে ঘর, বৈধব্য প্রভৃতি নারী জীবনকে জর্জরিত করেছে। নারীরা সামাজিক ব্যবস্থাকে অস্বীকার করতে পারছে না। কিন্তু তাদের মনে ক্ষোভ—বিক্ষোভ ফল্গুধারার মত প্রবাহিত হচ্ছে। কারণ নারী তার যৌবন ও কর্তব্য দিয়ে 'পুরুষ ভ্রমরা' জাতিকে ধরে রাখতে পারছে না। মাতৃহীনা মনসাকে ভাওড় পিতা মহাদেব দেখেশুনে মুনিপুত্রের সাথে বিবাহ দিলেন। 'কিন্তু এক রাতি না কৈলাম বসতি'। এ তো সে যুগের শত শত কুলীন কুলবধূর মনের কথা। ক্ষোভের কথাও বটে। ভবানী, মনসা, চণ্ডীর সর্বত্র গতায়াত। একমাত্র মধ্যবিত্তের জীবনে বাধা-নিষেধের প্রাচীর গড়ে উঠেছিল। যখন নগর পোড়ে দেবালয় তো রক্ষা পায়না। তাই এরাও রক্ষা পায়নি। মধ্যবিত্তের সমর্থ যুবতী বধূ বৃদ্ধ স্বামীর ঘর করে। মনের যাতনায় সে বলে, 'আমি এই যুবতী আমার পতি বুড়া' বা 'নৈলে নয় তেঁই করি কষ্টেতে শয়ন। রোগী যেন নিম খায় মুদিয়া নয়ন।' শাক্ত-পদাবলী বাল্য বিবাহ জনিত কন্যার জন্য মাতৃহৃদয়ের করুণ বিলাপ। যে দেহে মনে নারী হয়ে উঠলো না, বাল্যবিবাহের ফলে তাকে অকালে স্বামী, স্বামীগৃহ, সংসার ও পুত্রের সাধনা করতে হল। সাধ্যের কথা সমাজে স্থান পেল না।

সম্ভ্রান্ত ঘরের স্ত্রীদের সতীত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের অবকাশ ছিল। কবিকঙ্কনের চণ্ডীমঙ্গলে ধনপতি দূরদেশে যাবার আগে গর্ভবতী খুল্লনাকে অপবাদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য 'জয় পত্র' লিখে দিয়ে যান। অষ্টাদশ এবং উনিশ শতকের প্রথমার্ধে সমাজে পতিতার সংখ্যা এত বৃদ্ধি পায় যে, "বেশ্যাগৃহের অশুদ্ধ উল্লাস ধ্বনি গৃহিণীগণের অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিতেছে।"[৮৬] তখনকার পারিবারিক জীবনও খুব উচ্চাদর্শ দ্বারা চালিত হত না। ঘরে ঘরে স্বামী পরিত্যক্তা কুলীন কন্যা ও বিধবাদের ব্যভিচার প্রায় সাধারণ ঘটনায় পরিণত হয়েছিল। কুলীন কন্যাদের নামেমাত্র বিবাহ হত এবং তারাও বাল্ বিধবাদের মত পাপের পথে নেমে যেত।[৮৭] সবচেয়ে বিপদের কথা হল,' 'তাহাদের সংসর্গদোষে পরিবারস্থ অনেকানেক সধবা স্ত্রীও তাহাদিগের অনুগামিনী হয়।'[৮৮] যে বিধবা বা কুলীন কন্যা শ্বশুরালয়ে, পিত্রালয়ে বা মাতুলালয়ে স্থান পেতনা, পাচিকা বা দাসীবৃত্তিও জুটতো না তারা স্থান পেত পতিতালয়ে। অর্থাৎ সমাজে 'অধর্ম ধর্মবৎ প্রচলিত হইতেছে।'[৮৯]

পাশ্চাত্য শিক্ষা ও চিন্তাধারা বাঙালীর চিত্ত ভূমিকে স্পর্শ করে সমাজদেহে সঞ্চারিত

হবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত বঙ্গীয় জনগণ অবনত মস্তকে রঘুনন্দনের ব্যবস্থাকে শিরোধার্য করেছে। রঘুনন্দন বাল্যবিবাহ, গৌরীদান প্রথার উৎসাহী সমর্থক ছিলেন। বিবাহ ক্ষেত্রে বর্ণ, প্রবর, গোত্র, সপিণ্ড এবং কৌলীন্য অত্যধিক গুরুত্ব পেল। "যদি কোন ব্যক্তি তিনবার বিবাহ করিয়া চতুর্থবার তাহা না করে সে আপনার সপ্তকুল পর্যন্ত নরকগামী করে।"[৯০] সহমরণকে স্পষ্ট ভাষায় সমর্থন না করলেও, সহমরণে স্বর্গলাভের লোভ দেখালেন। বৈধব্য জীবনে ব্যভিচারিতা দোষ যাতে স্পর্শ না করে তারজন্য বিধবাদের সম্বন্ধে কঠোরতর ব্যবস্থা দিলেন। একাহার, একাদশী প্রভৃতি অবশ্য পালনীয় বলে বিধান দিলেন। বাল্ বিধবাদের কথা তিনি ভেবেছিলেন কি?

বল্লাল সেন গুণ দেখে কূল মর্যাদার ব্যবস্থা করেছিলেন।[৯১] দেবীবর দোষ দেখে কূল মর্যাদার ব্যবস্থা করেছেন।[৯২] প্রথম পাঠান অভিযানের পর কণৌজিয়া ব্রাহ্মণ-জাতির কন্যাদের পাঠানরা অপহরণ করে। কণৌজিয়াদের মধ্যে নারীর অভাব দেখা দেওয়ায় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ কন্যাদের তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে আনা হয়। সমাজ দোষ যুক্ত হল। পাঠানীর গর্ভজাত সন্তান হিন্দুধর্মের মধ্যে প্রবেশ করলো। দেবীবর মেল, পালটি, থাক প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে বিবাহক্ষেত্রে সামাজিক শুদ্ধির যে আয়োজন করলেন তা পরবর্তীকালে রোটি-বেটির ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল।[৯৩] কুলীনকন্যাদের বিবাহ ব্যাপারে সমস্যা সৃষ্টি করলো। কুলীন পিতা ও শ্রোত্রিয় বঙ্গজ পিতা উভয়েই কুলীনকে কন্যা দিয়ে কূলরক্ষা এবং সামাজিক মর্যাদা পেতে চাইতো। চাহিদার তুলনায় যোগান বেশি অর্থাৎ পাত্রের তুলনায় কন্যা বেশি হওয়ায় পাত্রের মূল্য বৃদ্ধি পায়। বহুবিবাহ সর্বজনীন হয়ে পড়লো এবং কাঞ্চনের প্রাধান্য দেখা দেয়। ৫৫ বৎসরের কুলীন পাত্র ১০৭ জন কন্যার পাণিগ্রহণ করেছেন।[৯৪]

বিধবারা অমঙ্গল ও অশুচির প্রতীক হয়ে দাঁড়াল।[৯৫] সামাজিক সব অনুষ্ঠানে তাদের বর্জন করা হল। স্কন্দপুরাণে বিধবাজননী ব্যতীত আর সব বিধবা অমঙ্গলা বলা হয়েছিল। মধ্যযুগের শেষপাদে জননীও রেহাই পেলেন না। এমন কি পুত্রের শুভ কার্যেও।

প্রধান স্মৃতিকারেরা সতীদাহ সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি। শঙ্খ, অঙ্গীরা, সতীদাহকে সমর্থন করে, অজ্ঞ নারীদের সামনে অক্ষয় স্বর্গের প্রলোভন বিস্তার করলেন। মিসেস স্পেয়ার[৯৬] ও মিসেস ক্লিম্যানের[৯৭] গ্রন্থদ্বয়ে সতীদাহের বহু লোমহর্ষক চিত্র দেওয়া হয়েছে। উলার মুক্তারাম নামক ব্যক্তির তের জন স্ত্রী তাঁর সাথে সহমরণে যান। একজন পালাতে উদ্যত হলে পুত্ররা তাকে ধরে পিতার চিতায় নিক্ষেপ করে।[৯৮] বাগনান পাড়ায় এক ব্রাহ্মণের একশত স্ত্রী ছিল। ১৭৯৮ খৃঃ তার মৃত্যুতে

৩৭ জন স্ত্রী সহমৃতা হন। এই মারণ যজ্ঞ তিনদিন ধরে চলেছিল।[৯৯] ১৭৫৭ সালে পলাশী যুদ্ধের পর থেকে ১৮২৯ খৃঃ পর্যন্ত প্রায় ৭০,০০০ সতীদাহ হয়েছে।[১০০] ১৮১৫-২৩ সালের মধ্যে সতীদাহের ফলে ৫,১২৮টি বালক বালিকা পিতৃমাতৃহীন হয়।[১০১] সমাচার দর্পণে খবর পাই, "হিন্দুস্থানে যত সহমরণ হয় তাহার সাত অংশের একাংশ কেবল জেলা হুগলীতে হয়।" এই হুগলীতেই রামমোহনের আবির্ভাব—সতীদাহের বিরুদ্ধে প্রথম বলিষ্ঠ প্রতিবাদ।

সমাজের নিম্নশ্রেণীর লোকেরা এবং যোগী সম্প্রদায়ের মধ্যে সতীকে স্বামীর সঙ্গে জীবন্ত সমাধি দেওয়া হত। ১৮২৭, ১৫ই ফেব্রুয়ারী সমাচার দর্পণে এই সংবাদ পাই। আর্নেস্টরিস লিখিত কেরীর জীবনীতেও এর উল্লেখ আছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া হাউসে সতীদাহ নিয়ে বিতর্কের সময় জীবন্ত সমাধির বহু ঘটনা উল্লেখিত হয়েছিল। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল, কেতকা দাস ক্ষেমানন্দেব মনসামঙ্গলে, মানিকচন্দ্রের গানে, ঘনারাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গলে সহমরণের চিত্র পাই।

মধ্যযুগের সাহিত্যে দেখি নারী 'স্বতন্তরা' হতে চলেছে। দেবদেবী বন্দনা, কাচুলি নির্মাণ, বারমাস্যা প্রভৃতির মত 'কলির বর্ণনা' এবং নারীর স্বভাব ও কালধর্মের বর্ণনা বিশেষ স্থান পেয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে চণ্ডীদাস নারীদের সম্বন্ধে বলেছেন—[১০২]

সেবকেঁ লংঘিবে প্রভু নারী নিজ পতি। আপনা মজায়িব ব্রত লংঘিআঁসতী॥

কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গলে—[১০৩]

পরহিংসা পরদার। পরদ্রব্যে মতি যার। কলিতে হৈব তাহার উন্নতি॥

* * * * * *

পুরুষেরা বশ হৈব। অবলা প্রবল হৈব। স্ত্রী হইব কলির দেবতা॥

* * * * * *

অষ্টম বৎসরের বালা। গর্ভবতী রজঃ স্বলা। ষোড়শ বৎসরে হৈব জরা॥

বলরাম কবিশেখরের কালিকামঙ্গলে—[১০৪]

যার ধন হব সেই হব কুলবতী। পতিনিন্দা করিবেক যতেক যুবতী॥

* * * * * *

কুলবধূ ছাড়িবে যতেক কুলধর্ম। নারীর বচন পুরুষের হবে ব্রহ্ম॥

নিত্যানন্দ দাসের প্রেমবিলাসে—[১০৫]

"কলি যুগের লোক সব বড় দুরাচার।"

জমিদার কান্দরায় সম্বন্ধে অষ্টাদশ বিলাসে বলা হল—

শক্তি উপাসনা সদা মত্ত মাংস খায়। পরস্ত্রী ঘর দ্বার লুটি লঞ্যা যায়॥

নরহরি দাসের নরোত্তম বিলাসে—১০৬

সবে স্ত্রী লম্পট জাতি বিচার রহিত। মত্ত মাংস বিনা না ভুঞ্জয়ে কদাচিত॥

ঘনারাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গলে—১০৭

না বুঝিয়া তত্ত্ব। পরদারে মত্ত। মজাইবে মাংস মদে।

* * * * * *

ত্যাজি নিজপতি। সতী কুলবতী। যুবতী অসৎ হবে।

মদন আবেশে। পরপতি আসে। পথ আগুলিয়া রবে॥

যতেক অবলা। সে হবে প্রবলা। কথা কবে হাত নেড়ে।

স্বামীর বচন। করিবে লঙ্ঘন। গঞ্জনায় দিবে তেড়ে॥

গঙ্গারামের মহারাষ্ট্র পুরাণে—১০৮

"রাধাকৃষ্ণ নাহি ভজে পাপমতি হইয়া। রাত্রিদিন ক্রীড়া করে পরস্ত্রী লইঞা।

শৃঙ্গার কৌতুকে জিব থাকে সর্বক্ষণ।"

শাক্তনন্দ তরঙ্গিনীর ষোড়শোল্লাস-এ কলিকালের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে—১০৯

কলিকালে মহেশানি পাষণ্ডা.বহবো জনাঃ।

সঙ্গদোষা-মহেশানি তৎক্ষণাৎ হাণিতাং ব্রজেত।

তস্মাৎ প্রযত্নতো দেবি সংসর্গঃ বর্জয়েৎ সুধীঃ।

ভারতে বহবো দোষা কলিকালে সুরার্চ্চিতে।

ব্রাহ্মণাঃ কলিকালে তু শূদ্রগেহে বরাঙ্গনে।

* * * * *

পরস্ত্রী সঙ্গমাচ্চৈব পুত্রমুৎ পাদযন্তি চ।

আত্মানং বৈষ্ণবং সত্বা অধম্ ভারতে কলৌ।

* * * * *

কলিকালে ভারতে চ ব্রাহ্মণী গীততৎপরা।

সদা বাত্মরতা ভূত্বা নৃত্যন্তি ব্রাহ্মণাধমা।

নারীরা এযুগে আর শাস্ত্রের বচন মানছে না। পলাশীর যুদ্ধের পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব থেকেই বাঙালীর চারিত্রিক অবনতি প্রকট হয়ে পড়ে। যে সমাজে পুরুষের নীতি, চরিত্র, মনুষ্যত্বের কোন মূল্য থাকে. না, লোভ-লালসা সমাজের শুভবুদ্ধিকে গ্রাস করে, সেখানে নারীর আলাদা মর্যাদা, জীবনবোধ ও নৈতিক দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়। ভারতচন্দ্রের কাব্য এযুগের দলিল। ভারতচন্দ্রে কেবল মুসলমান শাসনের অন্তিমকালই

ঘোষিত হয়নি, মধ্যযুগীয় সমাজব্যবস্থারও অন্তিমকাল ঘোষিত হল। নারী অন্ধ ধর্মবিশ্বাসের কাঠগড়ায় ভাগ্যকে সাক্ষী করে সব কিছু মেনে নিতে পারেনি। সামাজিক বঞ্চনা, স্বামী নির্যাতন, কৌলিন্য প্রথা, বাল্যবিবাহ, বাল্যবৈধব্য, যৌথ পরিবারের 'বাঘিনী সতিনী', 'রাগিনী শাশুড়ী' ও ননদী-নাগিনী'-র বিষভরা দন্তের কামড়ে জর্জরিত। তাই পুরুষ বলে,—"নারী যার স্বতন্তরা। সেজন জীয়ন্তে মরা। তাহার উচিত বনবাস।"[১১০]

পুরুষের সোহাগের আলাপের উত্তরে নারী বলে—

> "সোহাগে এমন কথা পুরুষেরা কয়॥ নারীর পতির প্রতি বাসনা যেমন।
> পতির নারীর প্রতি মনকি তেমন। পাইতে পতির অঙ্গ নারী সাদ করে॥
> তারি সাক্ষী মৃতপতি সঙ্গে পুড়ে মরে॥ অর্ধঅঙ্গ যদি মোর অঙ্গে মিলাইবে।
> কুচনীর বাড়ী তবে কেমনে যাইবে।"[১১১]

সমাজের সব গরল পান করেছে নারী। মধ্যযুগের সাহিত্যে নারীচরিত্রগুলিকে কেন্দ্র করেই করুণরস নিরতিশয় করুণ হয়ে উঠেছে।

পলাশীর যুদ্ধ রাজনৈতিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলেও সামাজিক ক্ষেত্রে বিশেষ কোন পরিবর্তন আনেনি। নতুন শাসন ব্যবস্থায় যে সব ইংরাজদের দেখবো তারা কিন্তু খুব উচ্চ আদর্শের দ্বারা চালিত হত না। ভারতীয়দের মত তারাও ভোগবিলাসের মধ্যে গা ভাসিয়ে দিত। তাদের কোন কালচার ছিল না। জীবন উপভোগ বলতে তারা স্থূল ব্যাপার বুঝতো "Christianity was looked upon by the natives of Hindoosthan only as another name for irreligion and immorality".[১১২] রাজনারায়ণ বলেছেন—'সেকালের সাহেবরা অর্ধেক হিন্দু ছিল'।[১১৩] তারা কালী-মন্দিরে ভেট পাঠাতো, বাইজীর নাচ দিত, খানাপিনার আয়োজন করতো। লুঠতরাজ রাহাজানি কেবল দেশীয় দুষ্কৃতকারীরাই করতো না। ইংরাজরা মাঝরাতে অন্যের গৃহে প্রবেশ করে ইংরাজ মহিলার উপর অত্যাচার করে তার দাস-দাসী নিয়ে পালিয়ে যেত।[১১৪] আবার অবিবাহিত তরুণ তরুণীরা বল-নৃত্যে খানাপিনার আয়োজন করতো। সবাই মুখোস পরে নাচের নামে যথেচ্ছাচার করতো।[১১৫]

কলকাতায় ইংরাজরা কেবল দাসদাসীর ব্যবসাই করতো না,……"there were Englishmen in Calcutta little more than a hundred years ago who not only bought and sold African slaves, but also for the breeding of them for the slave· market."[১১৬] ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্ব লাভের পর দাস-দাসী ক্রয়-বিক্রয়ের কলাও বাজার তৈরী হয়। ইংরাজরা এ দেশীয় ও আফ্রিকান

নারীদের নিয়ে ভোগ বিলাসে ডুবে থাকতো।[১১৭] তার বহু নিদর্শন সে কালের সংবাদ পত্রে ছড়িয়ে আছে। ইংরাজদের অবৈধ সন্তানরা নানা সমস্যার সৃষ্টি করছিল। তাই ইংরাজ নারীদের এদেশে আমদানি করার জন্য উৎসাহ দেওয়া হতে লাগলো।[১১৮]

লর্ড কর্ণওয়ালিসের আবির্ভাবের পর থেকে ইংরাজদের মধ্যে পরিশীলিত জীবনবোধ, রুচি এবং দর্শনের আবির্ভাব ঘটলো। "Cornwallis brought with him to India all the finest characteristics of a highly-minded English noble man".[১১৯] ১৮২৫-৩০ সালের পর থেকে আরও পরিবর্তন ঘটলো। "Steam has done much to bring about this intellectual revolution. We are no longer isolated savages".[১২০] উনিশ শতকে নারীর প্রতি সম্ভ্রম জাগানোর জন্য জাতীয় নবজাগরণের প্রয়োজন ছিল।

অথচ ইংরাজরা যখন এদেশে এসেছিল তখন য়ুরোপে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন হয়নি। য়ুরোপেও সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে ধনীরা কন্যা ক্রয় করে পুত্রদের বিবাহ দিতেন। স্বল্পবিত্তবানদের ছেলেরা পণ নিত। সম্পন্ন গৃহের মেয়েদের কন্‌ভেণ্ট হাউসে পাঠিয়ে দেওয়া হত। সেখানে তারা সন্ন্যাসিনীর জীবন যাপন করতো; এই কন্‌ভেণ্টগুলো ছিল নরক। যাজকরা পাপাচারে ডুবে গিয়েছিল। কনভেণ্ট গুলোতে "House of correction এবং Mad House ছিল।" "I know but one difference between them ; whilst the houses of correction are inspected by the law, and the mad houses by the police, both stop at the convent doors ; the law is afraid, and the police dares not pass the threshhold".[১২১] বাঙলা দেশের প্রধান শহর কলকাতা, বর্ধমান, কৃষ্ণনগর ও ঢাকা লাম্পট্যের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছে। বাইরে কোঁচার পত্তন, ভিতরে ছুঁচোর কেত্তন চলছে। এই ব্যভিচারের স্রোত গৃহ ও গৃহস্থকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। গৃহবধূ ও ললনারা আত্মরক্ষা করতে পারেনি। অথচ সব কিছু হচ্ছে ধর্মের নামাবলির আড়ালে। "Hinduism in Bengal had these two aspects, the Vaishnava and the Tantrika,—and in both those aspects Hinduism was rotten to the core. A great revolution, a protest was at hand".[১২২] সামাজিক বিপ্লব এবং বলিষ্ঠ প্রতিবাদের জন্য চাই নৈতিক বল ও চারিত্রিক সামর্থ। য়ুরোপে নারী মুক্তি আন্দোলন দানা বেঁধে না ওঠা পর্যন্ত দেশী ও বিদেশীদের নানা প্রয়াস থাকলেও তা কার্যকরী হয়নি। কেননা তখনও ইংরাজী শিক্ষার মাধ্যমে নৈতিক ও দার্শনিক উপলব্ধি ঘটেনি। রামমোহন এবং তাঁর

সহচর, হিন্দু ও হেয়ার স্কুলের ছাত্ররা যে সব সভাসমিতি গঠন করেছিলেন তা মজলিসের আসর নয়। এই সভাসমিতির মধ্য দিয়ে তাঁরা দেশের ও নারীদের প্রকৃত সমস্যা বুঝতে ও জনসাধারণকে বোঝাতে চেয়েছিলেন।

পাদটীকা

১. ঋক্‌বেদ—রমেশচন্দ্র দত্ত, অনুঃ পৃ—৫৪৩
২. সংস্কৃত ও প্রাকৃত কবিগণের রচনাবলী—ডঃ রমা চৌধুরী, পৃঃ—১৭
৩. The History of Indian Literature—A. Weber, P-38, Chowkhamba Series, 1961.
৪. Atharvaveda—William Dwight Whitly (Book vi. 11. 2)
৫. ঐ ঐ Page 77 (41, 384, 401)
৬. Women in the Vedic Age—Sakuntala Rao, Shastri,
৭, সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা—বিমানচন্দ্র ভট্টাচার্য, পৃঃ—৩০-৩১
৮. The Religion and Philosphy of the Atharvaveda—Dr. J. N. Shende, P-118.
৯. Hindu castes and sects—Jogendra Bhattacharyya. 1896, P-7
১০. The Age of Later Samhitas, Vidya Bhavan Series,— V. M. Apte,
১১. ঐ ঐ ঐ
১২. তৈত্তরীয় ব্রাহ্মণ (১-১-২৪)
১৩. Ait. Brahmana vii. 8, P-388.
১৪. ঐ iii, 23, P-180
১৫. মৈত্রেয়ী সংহিতা ৩-৬-৩
১৬. শতপথ ব্রাহ্মণ ১ কা, ৯ অ, ২ ব্রা, ৩—বিধুশেখর ভট্টাচার্য সম্পাদিত
১৭. ঐ ১ কা, ৩ অ, ১ ব্রা. ১২
তৈত্তরীয় ব্রাহ্মণ ৩-৩-৩-২
১৮. শতপথ ব্রাহ্মণ ১-৩-১-১৩

১৯. মৈত্রেয়ী সংহিতা ৩-৬-৩
২০. Sex and Marriage in India—A. K. Sur, P-41
২১. Ait. Brahmana, vii. 13 Page-300.
২২. শতপথ ব্রাহ্মণ ১৩-২-২-৪
২৩. A History of Indian Literature—M. Winternitz, Ph. D. P-173
২৪. Ait. Brahmana—vii. 13, P-300.
২৫. ঐ ঐ
২৬. বৃহদারণ্যক—দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ত তীর্থ, ১-৪-১৭
২৭. তৈত্তরীয়োপনিষদ—দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ত তীর্থ, ২৭-৪ পৃঃ-৭১
২৮. Oxford History of India—V. A. Smith, P-665.
২৯. প্রাচীন ভারতে নারী—ক্ষিতি মোহন সেন, পৃঃ-২৬
৩০. বাল্মীকি রামায়ণ অনুঃ—রাজশেখর বসু, পৃঃ—৩৮১, ৪৩৫,
৩১. মনু-স্মৃতি—শ্যামাকান্ত বিদ্যাভূষণ, ৯-৬৪-৬৫, ৫-১৬২,
৩২. ঐ ঐ ২-১৬
৩৩. ঐ ঐ ২-৬৭
৩৪. মনু-স্মৃতি—শ্যামাকান্ত বিদ্যাভূষণ, ৯.১৮
৩৫. ঐ ঐ ৯-৩
৩৬. Social and Religious life in Grihya Sutras—V. M. Apte, P-22
৩৭. মেধাতিথি ভাষ্য ৮-৩৬০, ৯।২,
৩৮. গৌতম ১২।২৯
৩৯. Origin and growth of caste in India—N. C. Datta, 1931, P-233
৪০. মনু-স্মৃতি—শ্যামাকান্ত বিদ্যাভূষণ, ৯।৭
৪১. মেধাতিথিভাষ্য ৮।৪১৬-১৭
৪২. ঐ ৯।১৮
৪৩. বিষ্ণু ২৬।১১
৪৪. Kamasutra of Vatsayana—S. C. Upadhyaya. Sutra—15-16, P-150

৪৫. কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র—অনুঃ রাধা গোবিন্দ বসাক, পৃঃ-১০৩
৪৬. Studies in the Puranic rites and Records—R. C. Hazra, P-91
৪৭. Ancient Indian Erotics and Erotic Literature—
Dr. S. K. Dey, P-38.
৪৮. কবিতাবলী—ডঃ রমা চৌধুরী, পৃঃ-১৪,
৪৯. Women in Sanskit Dramas—R. D. Dikshit, M. A. Ph. D,
Chap.-III, P-118.
৫০. India through the Ages—Dr. J. N. Sarkar, P-15
৫১. Women in Early Buddhist Literature—I. B. Horner, P-18
৫২. Women in Buddhist Literature—B. C. Law, P-86
৫৩. বাঙালী হিন্দুর বর্ণভেদ—ডঃ নীহার রঞ্জন রায়, পৃঃ-৬২
৫৪. বাঙালী হিন্দু বর্ণভেদ—ডঃ নীহার রঞ্জন রায়,
৫৫. একবল্লবীরচন্দ্র মহাবোধন তন্ত্র। তন্ত্রকথা—চিন্তাহরণ চক্রবর্তী হইতে উদ্ধৃত।
৫৬. Priest, women and Families—J. Michlet, Tr. by C. Cooks,
1846, P-36.
৫৭. তন্ত্রকথা—চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, পৃঃ-২
৫৮. মহানির্বাণতন্ত্র—বসুমতী সং, ভূমিকা।
৫৯. শাক্তানন্দ তরঙ্গিনী—বসুমতী সং, ৪র্থ উল্লাস, পৃঃ-৮৪।
৬০. সাহিত্য—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ-১০০
৬১. প্রাচীনা স্ত্রী কবি—রমনী মোহন মল্লিক, পৃঃ-৫।
৬২. ঐ ঐ পৃঃ-১৪।
৬৩. ঐ ঐ পৃঃ-১৪।
৬৪. বাঙলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত—ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩য় খণ্ড, পৃঃ-৩২
৬৫. ঐ ঐ ঐ পৃঃ-৩৬
৬৬. প্রেমবিলাস—নিত্যানন্দ দাস, পৃঃ-২৩৯
৬৭ ঐ ঐ , পৃঃ-২৪৯
৬৮. প্রেমবিলাস—নিত্যানন্দ দাস, পৃঃ-২৫০
৬৯. শ্রীমদ্ভক্তি রত্নাকর—শ্রীনরহরি দাস চক্রবর্তী, পৃঃ-৭৯২।
৭০. ঐ ঐ , পৃঃ-৮১৬
৭১. নরোত্তমবিলাস—নরহরি দাস (বহরমপুর সং ১৩০০) পৃঃ-২০

৭২. India throngh the Ages—Dr. J. N. Sarkar, P-41
৭৩. Women in Islam—M. M. Siddique, Chap-III
৭৪. Mandelslo, Quoted from' A Social History of Islamic India—M. Yasin, P.-88
৭৫. The Indian Muslims—M Mujeeb, P-233
৭৬. ঐ ঐ P-226
৭৭. A Social History of Islamic India—M. Yasin, P-131
৭৮. ঐ ঐ P-284
৭৯. Roe and Fryer, P450 Quoted from Women under Polygamy—W. Gallichan, 1914, P-119
৮০. Kama Sutra of Vatsayana—S. C. Upadhyaya, Sutra—10-12
৮১. A Social History of Islamic India—M. Yasin, 122
৮২. Quoted from Women under Polygamy—W. Gallichan, P-119
৮৩. Women in Islam—V. H. & L. Bevan Jones, P-76
৮৪. পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাবলী, পৃঃ-৮, ১ম খণ্ড, 'বাঙ্গালীর বিশিষ্টতা'।
৮৫. মনসামঙ্গল কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ—যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, পৃঃ—৮৯.
৮৬. তত্ত্ববোধিনী—সংকলক—বিনয় ঘোষ, পৃঃ-১০২
৮৭. Vindication of the Hindoos from the Aspiration of the Rev. Claudius Bucharam, M. A., P-123
৮৮. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—সংকলক—বিনয় ঘোষ, পৃঃ-১৫৭
৮৯. ঐ ঐ পৃঃ-১৫৮
৯০. সমাজ সংস্কারক রঘুনন্দন—বাণী চক্রবর্তী, পৃঃ ১১৯,
৯১. প্রেমবিলাস—নিত্যানন্দ দাস, পৃঃ-২৫৫ 'দোষ অনুসারে কৈল কুলের সম্মান'।
৯২. বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ, সমাজ, ২য় খণ্ড, সাক্ষরতা প্রকাশনী, পৃঃ-১৮৬
৯৩. পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাবলী, বাঙ্গালীর বিশিষ্টতা পৃঃ-৯
৯৪. উনিশ শতকের সমাজ ও সংস্কৃতি—ডঃ অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, পৃঃ-৩৪
৯৫. বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যের সূচনা ও ভারতের নারী প্রগতি—ডঃ রমেশ মজুমদার, পৃঃ-৮৫
৯৬. Life in Ancient India—Mrs. Spier.
৯৭. The Manners & Customs of Society in india—Mrs. Clemans, P-80

৯৮. নদীয়া কাহিনী—দ্বিতীয় সং, পৃঃ-২৮৪
৯৯. নদীয়া কাহিনী— ঐ ঐ
১০০. Asiatic Journal 1827, Vol.—XXIII, Page-689
১০১. Asiatic Journal 1827, Vol.—XXIII, P-689
১০২. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন—সাহিত্য পরিষৎ সং, পৃঃ-৬৮ (ভারখণ্ড)
১০৩. কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল—যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, পৃঃ-৩৫০-৫১
১০৪. কালিকামঙ্গল—বলরাম কবিশেখর, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সং,
১০৫. প্রেম বিলাস—নিত্যানন্দ দাস, যশোদালাল তালুকদার কর্তৃক প্রকাশিত।
১০৬. নরোত্তম বিলাস—নরহরি দাস, বহরমপুর সং ১৩০০, পৃ-৮৯
১০৭. ধর্মমঙ্গল—ঘনারাম চক্রবর্ত্তী, বঙ্গবাসী, ২য় সং ১৩০৮,
১০৮. মহারাষ্ট্রপুরাণ—গঙ্গারাম, প্রথম কাণ্ড।
১০৯. শাক্তানন্দ তরঙ্গিনী—প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী ভট্টাচার্য অনুদিত, ৩য় সং ১৩১৭
১১০. ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল—বসুমতী সং।
১১১. ঐ
১১২. Calcutta Review 1834, Vol. I, P-293
১১৩. সেকাল ও একাল—রাজনারায়ণ বসু, পৃঃ-৩
১১৪. Calcutta Gazettee 1781, Jan. 15th
১১৫. Hicky's Gazettee, 1780, 15th August.
১১৬. Calcutta Gazettee, 1817, 2nd Jan.
১১৭. Echoes From Old Calcutta-H. E. Busteed. C. I- E. (1908), P-136
১১৮. Slavery Days—H. A. Stark, B. A., P-2
১১৯. Asiatic Journal, Vol-III, 1817, P-103
১২০. Calcutta Review, 1843, Vol. I, P-293
১২১. Calcutta Review, 1843, Vol, I, P-202
১২২. Priests, Women & Families—J. Michelet, Tr, by C. Cooks, 1846, P-64
১২৩. The Bengal Magazine, Aug, 1874—Literature of Bengal by Arcydac, P-71

॥ দ্বিতীয় অধ্যায় ॥

(১৮১৩—১৮৫০)

পলাশীর যুদ্ধের পর যে সব বাঙালী ইংরাজদের কাছাকাছি ছিলেন তাঁরা হলেন মুৎসুদ্দী, মুনশী, বেনিয়ান ও দেওয়ান। তাঁদের একমাত্র আশ্রয় ছিল প্রাচীন সংস্কার ও বিশ্বাস। তারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য যৎসামান্য ইংরাজী শিখেছিলেন। সাগর-পারের সংবাদে তাঁদের কোন কৌতুহল ছিল না। আচার-অনুষ্ঠান অহেতুক আড়ম্বর, বিলাসিতা এবং ইন্দ্রিয় চর্চায় দেশ ছেয়ে ছিল। এমন সময় রামমোহনের আবির্ভাব। পলাশীর যুদ্ধ মধ্যযুগের অবসান। "…বাঙলা দেশে যথার্থ নবযুগ আরম্ভ হইয়াছে রামমোহনের কলিকাতায় আবির্ভাবের পর" (১৮১৩)।[১] রামমোহন দেখলেন চারিদিকে ধর্মের নামে আত্মনিগ্রহ, আচার ও অনুষ্ঠান সর্বস্বতা—বৈধব্য, অন্তর্জলি, নরবলি, গঙ্গাসাগরে সন্তানবিসর্জন, নারী বিক্রয়, পতিতাবৃত্তি, কৌলীন্য প্রথা, বহুবিবাহ, বাল্য-বিবাহ, দাস-দাসী বিক্রয়, সতীদাহ প্রভৃতি সামাজিক ব্যাধি। আত্মিক দিকে রামমোহন সে যুগের অগ্রসর ব্যক্তি। বাঙলার গ্রাম্য পাঠশালায় বাংলা শিখলেন, পাটনায় মৌলভীর কাছে আরবী ও পারসী, বেনারসে সংস্কৃত এবং রংপুরে কালেকটরেটের অধীনে কাজ করার সময় ইংরাজী শিক্ষার আরম্ভ এবং জন ডিগ্‌বীর সংস্পর্শে ইংরাজী শিক্ষা পরিপূর্ণ হল। সাগরপারের নানা আন্দোলনের ঢেউ তাঁর চিত্তে এসে লাগলো। পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে তিনি হয়ে উঠলেন, "The cosmopolite, the Rationalist Thinker, the representative man with a universal outlook on human civilization and its historic march……" রামমোহনের যুক্তিবাদ, মানবহিতবাদ, সমাজ হিতৈষণা প্রভৃতি বেন্থাম, লক, হিউম, ভলটেয়ার, ভলনি ও পেইন দ্বারা প্রভাবিত। তিনি মনে করতেন, ভগবদ্ বিশ্বাস মানবজ্ঞানের অতিরিক্ত হতে পারে, কিন্তু বিরোধী নয়। তাঁর মতে যা মানবমনের বিরোধী, তা পরিত্যাজ্য। মাণ্ডুক্যোপনিষৎ অনুবাদের ভূমিকায় বললেন—"The public will, I hope, be assumed that nothing but the mutual inclination of the ignorant towards the worship of objects resembling their own nature and to the external forms of rites palpable to their grosser senses ; joined to the self-interested motives of their pretended guides, has rendered the generality of the Hindu community (in defiance of their

sacred books) devoted to idol worship,—the source of prejudice and superstition and of the total destruction of moral principles, as countenancy criminal intercourse, suicide, female-murder, and human sacrifice. Should my labour prove in any degree the means of diminishing the extent of these evils, I shall ever deem myself most amply rewarded."

ঈশোপনিষদের ভূমিকায় বললেন, মানুষের সাধারণ জ্ঞান এবং সঠিক যুক্তি দ্বারা বিবেককে চালিত করলেই সত্যে উপনীত হওয়া সম্ভব। রামমোহনের উক্তিটির সঙ্গে বেন্থাম—সম্বন্ধীয় উদ্ধৃতিটির তাৎপর্য মিলে যাবে। "Bentham rejects tradition, religious authority and personal institution of moral truth. The only general rules, he accepts are those of the law, and for these he offers a utilitariantest."

বেন্থাম সমস্ত বিধিনিষেধকে "greatest happiness of the greatest number" মানদণ্ডে বিচার করতেন। বেন্থামেব সব সিদ্ধান্তের মূলে লক্ষ্য করা যাবে "The application of a rigorous commonsense to the fact of society."

লকেব ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা যাবে'…"he was pleading for universal reasonableness instead of blind reliance on authority".

ঈশোপনিষৎ, মাণ্ডুক্যোপনিষৎ ও কঠোপনিষৎ প্রভৃতি অনুবাদের ভূমিকা পড়লেই বোঝা যায় তিনি কত যুক্তি নির্ভর ও বিবেচক। বেকনের মত তিনিও বিশ্বাস করতেন ধর্ম্মই সমাজ জীবনের সবচেয়ে বড় বন্ধন।[৮]

রেণেসাঁস রাজনৈতিক বা ধর্মীয় আন্দোলন নয়। "It was a state of mind."[৯] এতদিনে সমাজে নারীদের সম্বন্ধে যে ধ্যান ধারনা চলে আসছিল, রামমোহন তার উল্টো-পথে চলতে চাইলেন। তিনি প্রথম বলিষ্ঠ কণ্ঠে বললেন—"সর্ব্বশাস্ত্রেতে এবং সর্ব্ব-জাতিতে নিষিদ্ধ যে আত্মঘাত তাহার অন্যথা করিতে পারেন যাঁহাদের শাস্ত্রে শ্রদ্ধা নাই এবং যাঁহারা স্ত্রীলোকদের আত্মঘাতে উৎসাহ করিয়া থাকেন"।[১০] নারীদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও মর্যাদাবোধের মধ্য দিয়ে নারীজাতি সম্বন্ধে একটি তিনি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী হয়েছিলেন।[১১] কোন রমণী তার সামনে উপস্থিত হলে তিনি দাঁড়িয়ে থাকতেন অথবা তাকে আসন গ্রহণে বাধ্য করতেন।[১২] মিস কার্পেণ্টার লিখেছেন—"For surely never was there a man of such modesty and humility! I used to feel quite ashmed of the reverential manner in which he

behaved to me. Had I been our Queen I could not have been approached and taken leave of with more respect".[১৩]

মিস্ এইকিন রামমোহনকে বলেছেন "the friend and champion of woman".[১৪]

রামমোহন তাঁর যুগেকালে নিঃসঙ্গ, প্রায় একক পথচারী। নবযুগের প্রবর্তকরা তাঁদের সমস্ত শক্তিকে সংহত করেছিলেন অক্ষয় স্বর্গলাভের জন্য নয়, মর্ত্যকেই স্বর্গে রূপান্তরের জন্য। সব দেশেই "the Renaissance begins and cities and palaces are flooded with the bright sunlight of an eager intellectual curiosity."[১৫]

সামান্য কয়েকজন বুদ্ধিজীবী ও শিল্পী নবযুগের সূচনা করেন।[১৬]

কেরী ও মিশনারীদের প্রচেষ্টায় গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন আইন করে বন্ধ করে দেওয়া হল। সতীদাহ বন্ধ করার জন্যও তাঁরা রাজ দরবারে প্রয়াস চালাচ্ছিলেন। মুসলমান শাসকদের আমল থেকেই সতীদাহের বিরুদ্ধে বিরূপ ধারণা গড়ে উঠেছিল। হিন্দুর ধর্মমতে আঘাত দিয়ে বৃহত্তর শ্রেণীকে ক্ষিপ্ত করার ঝক্কি কেউ নেয়নি। রামমোহন সতীদাহের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে হিন্দুদের শাস্ত্রাদি ঘেটে অস্ত্রগুলো সংগ্রহ করলেন। কিন্তু ব্যবহার করলেন নিজের নবলব্ধ জ্ঞান ও বিবেক অনুসারে। তিনি 'প্রবর্ত্তক নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ' পুস্তিকায় নারীদের সম্বন্ধে প্রচলিত সংস্কারকে তুলে ধরে যুক্তি দিয়ে ছিন্নভিন্ন করলেন। শাস্ত্র ও দেশাচার দুটিকে আলাদা করে কন্যাবধ, সতীদাহ, স্ত্রীলোকের অস্থিরচিত্ততা, অল্পবুদ্ধি ও দুর্বল চরিত্রের জন্য সহজেই ভ্রষ্টাচারিণী হওয়া, বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি অভিযোগগুলি নস্যাৎ করেন।[১৭] সমাজ বিবেকের কাছে রামমোহনের প্রশ্ন—"আপনারা বিদ্যাশিক্ষা জ্ঞানোপদেশ স্ত্রীলোককে প্রায় দেন নাই, তবে তাহারা বুদ্ধিহীন হয় ইহা কিরূপে নিশ্চয় করেন?"[১৮] ইতিহাস ও শাস্ত্র অন্য কথা বলে। নারী বিশ্বাসঘাতক। রামমোহনের বক্তব্য, "এ দোষ পুরুষে অধিক কি স্ত্রীতে অধিক উভয়ের চরিত্র দৃষ্টি করিলে বিদিত হইবেক।"[১৯] কৌলীন্য প্রথা জর্জরিত সমাজের চিত্র, যৌথ পরিবারে বিবাহিত নারীর প্রকৃত অবস্থা তিনি জানতেন। তাই যৌথ পরিবার ও নারীর দুর্দশাকে একই সঙ্গে আক্রমণ করেছেন। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সংসারের যাবতীয় কর্ম করেও দৈনন্দিন জীবনধারণের জন্য সম্বল সকলের ভুক্তাবশিষ্ট। সামান্য ত্রুটির জন্য তিরস্কার। ধর্ম ভয়ে নারী সহিষ্ণু। এই সহিষ্ণুতার সুযোগ নিয়ে সমাজ নারীকে পশুর পর্যায়ে নামিয়েছে। দরিদ্রের স্ত্রী হলে নির্যাতনের অন্ত নেই। অর্থবানের পত্নী, উপপত্নী, রক্ষিতা প্রভৃতি একাধিক নারী সংসর্গের ফলে

নারী সম্বন্ধে কোন উচ্চ ধ্যান ধারণা থাকা সম্ভব নয়। রামমোহনের মতে "সকলের পত্নী দাস্যবৃত্তি করে।"[২০]

বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, কৌলিন্য ও অধিবেদন প্রথা তিনি আইন করে বন্ধ করে দিতে চেয়েছিলেন।[২১] প্রবর্ত্তক—নিবর্ত্তক সম্বাদের পরিপূরক নিবন্ধ "The modern Encroachments on the Ancient Rights of Females (1822)." তিনি বুঝেছিলেন নারীর এসব নির্যাতনের মূল কারণ অর্থনৈতিক পরবশ্যতা। অর্থনৈতিক অধিকারের মধ্য দিয়েই নারী ফিরে পাবে জননী, স্ত্রী, ভগ্নী ও কন্যার মর্যাদা। সংস্কৃত ভাষা ও শাস্ত্র অধ্যয়নে নারী ও শূদ্রের কোন অধিকার ছিল না। তা বাংলায় অনুবাদ করে তিনি নারী ও শূদ্রের হাতে তুলে দিলেন।

অনেকের ধারণা রামমোহন বিধবাবিবাহ সমর্থন করে পুস্তিকা লিখেছিলেন। বন্ধুদের কাছে বিধবার পুনর্বিবাহ প্রচলনের পক্ষে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। চন্দ্রমুখীর উপাখ্যানে লালবিহারী দে প্যারীর মুখ দিয়ে বলিয়েছেন—"রামমোহন রায় বিলাতে গেলে ঐরূপ জনরব হইয়াছিল।" (১৩ অধ্যায়)। আজ এসব উক্তির সত্যাসত্য বিচার দুরূহ। তবুও এ বিষয়ে প্রচলিত মতামত সংগ্রহ করার চেষ্টা হবে। সম্বাদ কৌমুদিতে তিনি অসহায় বিধবা রমণীদের জন্য ধনভাণ্ডার গড়ে তোলার প্রস্তাব করেছিলেন।[২২] ১৮১৯, ১৮ই মে তারিখের এসিয়াটিক জার্নালে ইণ্ডিয়া গেজেট থেকে আত্মীয় সভার একটি অধিবেশনের উদ্ধৃত বক্তব্যে বাল্‌বিধবাদের বাধ্যতামূলক বৈধব্য, বহুবিবাহ ও সহমরণের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা করে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল।[২৩] ১৮৫৫ সালে ক্যালকাটা রিভ্যুতে একই সংবাদ পরিবেশন করা হল। গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ, সমাজ সংস্কার ব্যাপারে রামমোহনকে সম্পূর্ণ সাহায্য করার (বিশেষ করে সতীদাহ ও বিধবাবিবাহ বিষয়ে) কথা দিয়েই রামমোহনের আশ্রয় পেয়েছিলেন। তৎসম্পাদিত 'সংবাদ ভাস্করে' এ কথা উল্লেখ করেছেন।[২৪] রামমোহন উইলে স্পষ্ট করে *বলে গেছেন তাঁর বংশধরেরা এক পত্নী থাকা কালে পুনরায় বিবাহ করলে তাঁর সম্পত্তি ও বিত্তের ভাগ থেকে বঞ্চিত হবে।* সতীদাহের প্রবল আন্দোলনের মধ্যেই তাঁর জীবনাবসান হল।

তিনি মহানির্বাণ তন্ত্রের শৈব বিবাহের পক্ষে মত দিয়েছিলেন। পতিহীনা বিধবা নারীও এই প্রথানুসারে বিবাহযোগ্যা। এই বিবাহে জাতি-বর্ণ ও বয়সের কোন বাধা নেই। "এমত গৃহীত হইলে বিধবাবিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ, বিভিন্ন জাতিতে বিবাহ এই সকল প্রশ্নের সমাধান হইতে পারিত।"[২৫] এমন একটি বিপ্লবী চরিত্র সহমরণ প্রথা রোধের পর নিষ্ক্রিয় থাকত কি না সন্দেহ আছে।

১৮২৯, ৪ঠা ডিসেম্বর সতীদাহ বন্ধ হল। ১৮৩০, ১১ই মাঘ ব্রাহ্ম সভার প্রতিষ্ঠা হল। ঘটনা দুটি যথেষ্ট উত্তেজনার সৃষ্টি করলে রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে ধর্মসভা স্থাপিত হল। গোপীনাথ দেব, রাধাকান্ত দেব, নীলমণি দে, ভবানীচরণ মিত্র সতীদাহ বন্ধ আইনের বিরুদ্ধে বেন্টিঙ্কের কাছে আবেদন করেন। আবেদনের শাস্ত্রীয় অংশটুকু বিশিষ্ট পণ্ডিতদের সহযোগিতায় রচিত হল। সমাচার চন্দ্রিকা, বঙ্গদূত ও সম্বাদ তিমির নাশক পত্রিকা রাধাকান্তের সমর্থক ছিল। রামমোহন, দ্বারকানাথ, কালীনাথ রায় যেদিন বেন্টিঙ্ককে অভিনন্দন জানালেন, তার পরের দিনই কলকাতার ধনী ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে ধর্মসভা স্থাপিত হল। সভায় এতলোক উপস্থিত হয়েছিল যে তাদের গাড়ীগুলি এক মাইল স্থান অধিকার করেছিল। সভায় ব্রাহ্মদের পুঁটি মাছের মত টিপে মাবার এবং রামমোহনের দলের ব্যক্তিদের সমাজচ্যুত করার শপথ নেওয়া হল।[২৭] উক্ত সভাতেই ১১, ২৬০ টাকা সংগৃহীত হল। তাঁদের পরিচালিত ও সমর্থিত পত্র পত্রিকায় নানা আজগুবি গল্প প্রকাশিত হতে লাগল। সমাচার চন্দ্রিকায়, এক বিধবা রমণী সহমরণে যেতে না পারার জন্য অনাহারে মৃত্যুর মিথ্যা কাহিনী ছাপা হল। সম্বাদ কৌমুদী মিথ্যাটি ফাঁস করে দেয়। মনডে ইভনিং পত্রিকায় চন্দ্রিকাকে বিদ্রূপ করে বলা হল, "It is now some months ago since the Chandrika's uxorious departure contained a glowing description of an oriental Portia, who starved herself after the death of her Brutas"[২৮]

আসলে ভবানীচরণ রাধাকান্ত সম্প্রদায় আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখীর আসন্ন উদ্গীরণ সম্ভাবনাকে অনুধাবন করতে পারেন নি। অথচ সারা ভারতের নারীদের জড়ত্ব বন্ধন ছিন্ন হবার সূচনা হল। ইয়ং বেঙ্গলদের বহু পূর্বেই রামমোহন অনুরাগীরা তুলসী, গঙ্গা প্রভৃতির মাহাত্ম্য অস্বীকার করে, সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহীদল গড়ে তোলেন। এঁদের সভার নাম হল আত্মীয় সভা।[২৯] সারা বাংলাদেশে প্রচণ্ড আলোড়ন দেখা দিল। "অন্তঃপুর মধ্যেও আন্দোলনের স্রোত প্রবাহিত হইতে অবশিষ্ট থাকিল না।"[৩০] অবগুণ্ঠনের অন্তরালবর্তী মুখগুলির ভাবান্তর লক্ষ্য না করা গেলেও—ভাবান্তরের ও চিত্ত আন্দোলনের সংবাদটুকু পাওয়া গেল।

॥ দুই ॥

"অতএব আমরা বঙ্গদেশের সামাজিক ইতিবৃত্তের সন্ধিক্ষণে উপস্থিত হইয়াছি। ১৮২৫ হইতে ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিংশতিবর্ষকে বঙ্গের নবযুগের জন্মকাল বলিয়া গণনা

করা যাইতে পারে। এই কালের মধ্যে কি রাজনীতি, কি সমাজনীতি, কি শিক্ষা কি ভাবে, সকলদিকেই নবযুগের প্রবর্তন হইয়াছিল।”[৩১] উক্তিটি প্রণিধান যোগ্য। ব্যক্তির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবার ও সমাজের রূপান্তরও আসন্ন।

ইংরাজ শাসনে ভারতে যে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন হল তা মধ্যযুগীয় বন্ধ্যা ভূমিতে পললের কাজ করল। এই পললভূমিতেই পরবর্তী সংস্কৃতির জন্ম হল। নবীন শিক্ষার স্বরূপ হল, “It was secular in character, liberal in essence, open to all irrespective of caste or creed unlike the education in the Pre-British period. But above all it was the key which opened the great treasure of rationalist and democratic thought of all modern west to the Indians.”[৩২]

ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রেণীই ধীরে ধীরে সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার সামনে এসে দাঁড়াল। ১৮১৭ থেকে ১৮৫১ সালের মধ্যে বাংলা দেশে সমাজ সংস্কারের উত্তাল তরঙ্গ লক্ষ্য করা যাবে। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা, ডিরোজিওর হিন্দু কলেজে যোগদান ও ছাত্রদের উপর প্রভাব, ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা, সতীদাহ রদ, দাসত্বপ্রথা বিলুপ্তি, বেথুন স্কুলের প্রতিষ্ঠা, বিধবা বিবাহ আইন পাস (১৮৫১) হল। “এই আন্দোলনগুলির ফলে বাংলার জনসমাজের মধ্যে এক নূতন ভাব আন্দোলন দেখা দিল। ধর্মীয় অনুশাসন ও আচার সর্বস্বতার বিরুদ্ধে যুক্তি ও হৃদয় ধর্ম বড় হয়ে দেখা দিল। হিন্দু কলেজের ছাত্ররা ও নব্য শিক্ষিতেরা মুদ্রিত গ্রন্থ পড়ে যে নবজ্ঞান আহরণ করেছিলেন তা এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সমাজের মধ্যে সঞ্চারিত হল। ব্যক্তিগতভাবে নবশিক্ষিতেরা যে নবীন জ্ঞান লাভ করেছিলেন, তা এইভাবে সামাজিক উত্তরাধিকারে পরিণত হল।” সমাজের এক বিশেষ অংশ এইভাবে ঐক্যবদ্ধ হতে থাকে—“Social cohision দেখা দিতে থাকে।”[৩৩] এই তরঙ্গ বাঙলার সীমা ছাড়িয়ে বিহার, উড়িষ্যা, উত্তর ভারত ও দাক্ষিণাত্যের জীবন ও সমাজকে তরঙ্গায়িত করে তুলল। সাহিত্য-সমাজ-ধর্ম-রাজনীতি সর্বক্ষেত্রে এই রূপান্তর প্রকটিত হতে লাগল।

ডিরোজিওর সংস্পর্শে যাঁরাই এসেছিলেন পরবর্তীকালে তাঁরা নারীমুক্তি আন্দোলনের পুরোধার ভূমিকা নিয়েছিলেন। “চুম্বক যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে তেমনি তিনিও অপরাপর শ্রেণীর বালকদিগকে আকৃষ্ট করেন।”[৩৪] রাধানাথ শিকদার, রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, শিবচন্দ্র দেব, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁর প্রত্যক্ষ ছাত্র। তাঁর রুচি ও ব্যক্তিত্ব কৃষ্ণমোহন-রসিককৃষ্ণ-হরচন্দ্র-চন্দ্রশেখর দেব প্রভৃতিকে আকর্ষণ করে ছিল। রাধানাথ তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন—“ইহা নিশ্চিত বলিতে

পারি যে, সত্যসন্ধিৎসা ও পাপের প্রতি ঘৃণা যাহা শিক্ষিতদের মধ্যে এখন অতি অধিক দেখা যায় এবং যাহা ভারতবর্ষের হিতকর না হইয়া যায় না,—সকলের মূলে ছিলেন একমাত্র তিনিই।"[৩৫]

"young lions"[৩৬]-দের প্রথম গর্জন শোনা যায় পার্থেনান[৩৭] নামক মুখপত্রে। হিন্দু কলেজের রক্ষণশীল পরিচালকরা অর্থ ও পরাক্রম দ্বারা তরুণ ছাত্রদের কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা করেছিলেন। 'তথাপি পত্র প্রকাশক যুবক হিন্দুদিগের সত্যানুসন্ধানের প্রবল ইচ্ছা নিবারিত হয় নাই।'[৩৮] বাধা পেয়ে কলেজের বাইরে একাডেমিক এসোসিয়েশন নামক বিতর্ক সভাব সৃষ্টি হল। এখানে রামমোহনের মত ধর্মভিত্তিক সমাজ সংস্কার নয়, দেশপ্রীতিভিত্তিক সমাজ সংস্কারের পত্তন হল। পার্থেনান পত্রিকায় নারী শিক্ষা, ভারতীয় বন্দিনী নারীদের মুক্তির অভিলাষ আরো তীব্র ও কঠিন শপথে পরিণত হয়। হরমোহন চট্টোপাধ্যায়ের বিবরণীতে জানা যায় সর্বসম্মতিক্রমে নারীশিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাবটি গৃহীত হয় এবং "We are assured of the fact that the wife of one of the leaders amongst the subjects, with which she was acquainted, moral philosophy and Mathematics."[৩৯]

তরুণ ছাত্ররা জাতি-ধর্ম-বর্ণভেদকে উপেক্ষা করলেন। নারী শিক্ষা, বিধবাবিবাহ, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, কৌলীন্যপ্রথা নিয়ে প্রবীণ ও নবীনের বিরোধ ক্রমশঃ ঘনীভূত হল। হিন্দু কলেজ থেকে ডিরোজিওকে বিতাড়িত করেও তা বন্ধ হল না।[৪০]

সতীদাহ বন্ধ হলে ডিরোজিও "On the abolition of Suttee" নামক কবিতা লিখেছিলেন। লর্ড বেন্টিঙ্কের অভিনন্দন পত্রটি রচনা নিয়ে হিন্দু কলেজের ছাত্ররা যখন বাক্-বিতণ্ডায় মত্ত, ডিরোজিও তাদের বলেন, "তোমরা মানুষ না এই দেওয়াল? ভয়ানক নারীহত্যাপ্রথা দেশ হইতে উঠিয়া গেল, ইহাতে কোথা তোমরা আনন্দ করিবে, না অভিনন্দন পত্রের ইংরাজী কাহার রচনা এই বৃথা তর্কে তোমরা মত্ত।"[৪১] "The Fakeer of Jungheera" কবিতাটিরও প্রেক্ষাপট সতীদাহ। কবি হৃদয়-শোনিতে কলম ডুবিয়ে নারীর যুগ যন্ত্রণাকে প্রকাশ করেছেন। নলিনী নায়িকা। জ্বলন্ত চিতার সামনে থেকে তাকে উদ্ধার করল দস্যু দলপতি ঝাঙ্গিরার ফকির। উভয়ের মধ্যে গভীর প্রণয় হল। ঝাঙ্গিরার মৃত্যুতে নলিনীর মৃত্যু হল। যে নারী স্বামীর চিতার পাশে দাঁড়িয়ে মৃত্যু ভয়ে কাঁপছিল সেই নারী প্রণয়ীর মৃত্যুতে গভীর বেদনায় মৃত্যুমুখে পতিত হল। প্রেমহীন দাম্পত্যজীবন তাকে মৃত্যুভীত করে তুলেছিল। সার্থক 'প্রেমের মধ্যে মৃত্যুকে বরণ করে সে জীবনের অর্থ খুঁজে পেল। এযুগে পরিবার আছে, দাম্পত্য জীবন আছে—নেই কেবল প্রেম। এযুগের সাহিত্য হল ভবানীচরনের 'দূতিবিলাস', কৃষ্ণ-

মোহন দাসের 'রতিমঞ্জরী' 'পঞ্চাঙ্গ সুন্দরী', পীতাম্বর মুখোপাধ্যায়ের 'রতিক্রিয়া' প্রভৃতি যা রুচির স্থূলতায় ভারতচন্দ্রকে পরাস্ত করেছে। কালীকৃষ্ণ দাসের 'কামিনীকুমার' (১৮৩৬) কাম-সংহিতার আধুনিক সংস্করণ। বাংলা দেশে ইংরাজী ভাষায় রচিত কাব্যে প্রেম সম্বন্ধে নতুন ধ্যান-ধারণার পরিচয় পাওয়া যাবে। তাৎকালিক সাধারণ জীবনে এর সন্ধান মিলবে না। সন্ধান মিলবে ডিরোজিও ও ডিরোজিয়ানদের রচিত কাব্যে। পরবর্তীকালে বাঙলা ভাষাতেই তার বহুল চর্চা হবে। এ কালের তরুণ চিত্তে তাই নারী নূতন ভাবে ও রূপে প্রতিষ্ঠিত হল।

ইয়ং বেঙ্গলরা মানবতাবাদ ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের পূজারী। তারা মনে করতেন জড়সমাজকে জঙ্গম করে তুলতে হলে, বিধি নিষেধের বেড়াজালে বন্ধ মানসিকতাকে নতুন ধ্যান ধারণার মধ্যে মুক্তি দিতে হবে। "A thorough revolution took place in their ideas. As was not unnatural, the mind of youngmen of the Hindu College bounded from one extreme to the other. From implicit faith in the religion of their forefathers they rushed into blank Scepticism. They began to reason, to question, to doubt."[৪২]

জ্ঞানান্বেষণ পত্রিকায় নারী ও শূদ্রের সম্বন্ধে যাবতীয় শাস্ত্রীয় বিধির প্রতিবাদ করা হল। "…বেদপাঠ করিয়া যে স্ত্রী লোকদিগের কিঞ্চিৎ জ্ঞানযোগ হইতে পারে তাহাতে একেবারে নিষেধ করিয়া দিলেন কিন্তু গৃহাদি পরিষ্কার ও পাকশালাতে চক্ষুজ্বালা, হস্তদাহ প্রভৃতি করিয়া রন্ধনাদি করিলে যে পুরুষেরা পরম সুখে ভোজন করিতে পারেন তাহারি বিধান লিখিলেন কি অন্যায় স্ত্রীলোকেরা কী এতই নীচ যে তাঁহারা অন্ধকারে থাকিয়া পুরুষের দাসীবৃত্তি করিবেক আর শূদ্ররাই বা কি পাপ করিয়াছিলেন যে তাঁহারাই শাস্ত্র পড়িতে পারিবেন না কিন্তু কেবল ব্রাহ্মণাদি তিন জাতির দাসত্ব করিবেক।"[৪৩] হিন্দু পাইওনিয়ার পত্রিকায় "on women"—'নিবন্ধে স্পষ্ট করেই বলা হল, নারীর যাবতীয় সমস্যাকে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার প্রয়োজন, পুরুষের ক্রীড়নক না ভেবে যোগ্যতর বিকাশের ক্ষেত্র করে দিতে হবে। উনিশ শতকের মানবতার প্রথম শর্ত হয়ে উঠল নারী মুক্তি। জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভায় মহেশচন্দ্র দেব "A speech on the condition of the Hindoo women" (1839) নিবন্ধে বাঙালী পরিবারে নারীদের একটি বাস্তব চিত্র উপস্থাপিত করেন।[৪৪] চিত্রটি আগেই রামমোহন তুলে ধরেছিলেন। মহেশচন্দ্র দেব অপরিণত বুদ্ধি বালক বালিকার বাল্যবিবাহের বিষময় পরিণতির প্রসঙ্গে বলেন, "Indeed we are married at an age when neither

the graces of the mind nor of the body are sufficiently if at all developed. We have not a single opportunity of judging ourselves with respect to either of these until it is too late."[৪৫]

বিবাহে পাত্র পাত্রীদের মতামতের কোন মূল্যই ছিল না। বহুবিবাহকে তিনি নিন্দা করেছেন, বিধবা বিবাহকে সমর্থন করেছেন এবং বাল্যবিবাহের কুফল, বাল্ বিধবাদের সমস্যার কথা তুলে ধরেছেন। সমাজে ভ্রূণহত্যা এবং বিধবা রমণীদের অন্তঃসত্ত্বার সংখ্যা এত বেড়ে যায় যে সহৃদয় সংস্কারকদের অনেককেই ভাবিয়ে তুললো। এই সব রমণীদের জন্য প্রসূতিসদন এবং নবজাতকদের জন্য আবাস নির্মাণকল্পে মতিলাল শীল ডাঃ ওসাগুনির হাতে সরকারকে দেবার জন্য লক্ষ টাকা দান করেন।[৪৬] জ্ঞানোপার্জিকা সভায় পঠিত প্রবন্ধে বিধবাদের প্রসঙ্গে বলা হল—"Many of them young and beautiful and unable to subdue nature give way to those temptations which beset them on everyside. I would fain draws a veil over this part of my subject. These unfortunate victims of a monostrous system are led to commit every species of crime. Thousands of innocent babies are muggled into the grave from the womb, thousand of widows too commit self-destruction to fly these miseries and crimes. Thus the land is filled with pollution and the most hedious vices."[৪৭]

বিদ্যাসাগরের 'বিধবা বিবাহ চলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব'-এর ভূমিকা ইয়ং বেঙ্গলরাই আরম্ভ করে দিলেন।

ব্রাহ্মধর্মের সামাজিক সংস্কার আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠার আগেই ইয়ং বেঙ্গলরা নারীমুক্তি আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। হিন্দু কলেজের প্রাক্তন ছাত্ররা নতুন সমাজের প্রতিনিধিস্থানীয় নাগরিক। এই আধুনিক মানুষরা সামাজিক প্রশ্নে সুস্পষ্ট মতামত রেখেই ক্ষান্ত হননি। এই সামাজিক ব্যাধি দূর করার জন্য সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণের প্রয়োজন ছিল। কেননা নারীমুক্তির সব উপায়গুলি উদ্ভাবিত হয়ে সাংগঠনিক শক্তি অর্জন করছিল। এ যুগের সভা সমিতি, পত্র পত্রিকায়, তর্কে-বিতর্কে নারীর সব সমস্যা সমাজ স্তম্ভের চূড়ায় স্থান পেয়েছে। ১৮৫১, ১৪ই এপ্রিল সংবাদ পূর্ণোচন্দ্রোদয়ে প্রচলিত ও তিরোধান প্রাপ্ত পত্র পত্রিকার তালিকা ছাপা হয়। তাতে জীবিত পত্র পত্রিকার সংখ্যা ২১, তিরোহিত পত্রিকার সংখ্যা ৫৪।[৪৮] এন্‌কোয়ারার, জ্ঞানান্বেষণ, রিফরমার, ইষ্ট ইণ্ডিয়া প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য পত্রিকাগুলির কোন উল্লেখ নেই। অথচ

এই প্রগতিশীল পত্রিকাগুলিই ছিল সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। এই তালিকা থেকে বুঝতে অসুবিধা নেই যে প্রগতিশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল দুপক্ষেরই বক্তব্য রাখার যথেষ্ট হাতিয়ার পাওয়া গিয়েছিল এবং দুপক্ষই পূর্ণমাত্রায় তা ব্যবহার করেছে। আত্মীয়সভা, ব্রাহ্মসভা হিন্দু সভা, একাডেমিক এসোসিয়েশন, জ্ঞানোপার্জিকা সভা, বঙ্গহিত সভা, ডিবেটিং ক্লাব, তত্ত্ববোধিনী সভা, সর্বশুভকরি সভা এবং বেঙ্গল বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটী প্রভৃতি সংগঠন-গুলির বক্তব্যই পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হত। বিদ্যাসাগর সামাজিক আন্দোলনে অংশ গ্রহণের আগেই বহুবিবাহ, বিধবাবিবাহ, কৌলীন্যপ্রথা, স্ত্রীশিক্ষা প্রভৃতি নিয়ে আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল। রাজবল্লভ এবং রাণীভবানী নিজেদের বিধবা কন্যার বিবাহ দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। কৃষ্ণনগরের মহারাজ শ্রীশচন্দ্র, বারাসাতের কালীকৃষ্ণ মিত্র, পটলডাঙ্গার শ্যামাচরণ দাস প্রভৃতির বিধবাবিবাহ দেবার প্রয়াস স্মরণীয়। রাধাকান্তদেবের বাড়ীতে বিধবাবিবাহ বিষয় নিয়ে শাস্ত্রীয় বিচারে বিধবাবিবাহের স্বপক্ষ দলের জয় হয়। পণ্ডিতরা শাস্ত্রীয় আলোচনা করেছিলেন মাত্র, সমাজে এই প্রথা প্রচলনে তাঁদের বিধান ছিল না। রাধাকান্ত দিনান্তের পুরবীর সুরে আচ্ছন্ন, নবীন প্রভাতের ভৈরবীর সুর হয়তো তাঁকে বিচলিত করেছিল, বিহ্বল করতে পারেনি। সমাজ সংস্কারের এই জাতীয় প্রয়াসে ব্যক্তির চেয়ে সামাজিক সচেতনতা অধিক প্রয়োজন। বেঙ্গল বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটীর সদস্যরা বিধবাবিবাহ সমর্থনে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রামচন্দ্র বিদ্যা-বাগীশের নিকট উপস্থিত হলে তিনি শাস্ত্রীয় ভিত্তিতে একটি উদার ব্যবস্থাপত্র দেন।[৪৯] ব্যবস্থাপত্রটি ধর্মসভার ধর্মসংসৎপতি শ্রীল রাধাকান্তদেব মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করা হলে তিনি পণ্ডিতদের দ্বারা "বিধবাবিবাহ নিষেধ বিষয়ক ব্যবস্থা" (১২৫৩) নামক পুস্তিকা প্রকাশ করেন। বিধবাবিবাহ বিষয়ে পণ্ডিতদের সিদ্ধান্ত— "স্ত্রীলোকের পুনর্বিবাহে পাতিত্য জন্মে, ও দৈবপিতৃকর্মে অধিকার থাকে না, বর্ধাহা হয়, বিবাহ সিদ্ধ হয় না, কুল অধম হয়, কুল বিনাশ পায়, সাধুদিগের আচরণীয় কর্ম করা হয় না, এবং তাহা অনাদি ধর্ম নহে, ও বিদ্বানদিগের অনাদরণীয়, এজন্য তাহা সর্বদেশে সর্বজাতি সর্বকুলেও বিরুদ্ধ ও বেশ্যার ন্যায় ধর্ম সেই হেতুক সাধুরা স্ত্রীদিগের পুনর্বিবাহ যথন পোষকতা করিবেন না এই ব্যবস্থাই অতি সাধু ও সৎসম্মত।'[৪৫ক] বিদ্যাসাগরের 'বিধবা-বিবাহ' (১৮৫৫, সংবৎ ১৯১২) প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব রচনাকালে ধর্মসভার পক্ষ ও বিপক্ষ দলের তথ্য ও মন্তব্যগুলি স্মরণ করেছিলেন এবং তার উত্তর দেবারও চেষ্টা করেছিলেন। তাই শাস্ত্রীয় বচন অপেক্ষা বিধবাদের প্রকৃত অবস্থা বর্ণনায় অধিক মন দিয়েছিলেন। আট বৎসর পর ধর্মান্তরিত পুত্রদের ঘরে ফেরাবার জন্য 'পতিতোদ্ধার বিষয়ক ভূমিকা ও ব্যবস্থা পত্রিকা (১৭৭ শকাব্দ) রচনা করান হয়। বিধবাবিবাহের

বিরুদ্ধবাদী পণ্ডিতরা স্বাক্ষর দিলেন। বাল্-বিধবার বিবাহ হলে 'বেশ্যার ন্যায় ধর্ম' বলে গণ্য হবে আর ধর্মান্তরিত পুত্রকে ঘরে আনার জন্য সিদ্ধান্ত কত সহজ ও সরল। কুলাঙ্গার কুল পাবে আর কুলবালা কুল হারাবে—ধন্য বিচার। ১৮৫৬, ৭ই ডিসেম্বর বিদ্যাসাগর প্রথম বিধবা বিবাহ দেন। এই বিবাহের বহু পূর্বে রাজা দক্ষিণারঞ্জন বিধবা ও অসবর্ণ বর্ধমানের বিধবা রানী বসন্তকুমারীকে বিবাহ করেন! এই বিবাহকে সমর্থন করেছিলেন গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ, ডাঃ দ্বারকানাথ গুপ্ত এবং মতিলাল শীল। ১৮৩৭ সাল থেকেই মতিলাল শীল স্ত্রীশিক্ষা ও বিধবা বিবাহের জন্য একটি সভা স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সে সভা স্থাপিত হয়নি।[৫০] জ্ঞানান্বেষণে এই সভা স্থাপিত না হওয়ার জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছে। জ্ঞানান্বেষণের পত্রলেখক এই আন্দোলন যে দানা বেঁধে উঠছে সে কথা উল্লেখ করে সরকারের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করেন। ১৮৪৩, ১১ই জানুয়ারী আর একজন পত্রলেখক বেঙ্গল স্পেকটেটরের সম্পাদককে জানান, সরকারী আইন পাশ না হলে বিধবা বিবাহ সম্ভব নয়। বিদ্যাসাগরের আগেই সামাজিক সিদ্ধান্ত—বিধবাবিবাহের জন্য আইন চাই। ১৮৪২ সালে বেঙ্গল স্পেকটেটরে পত্র লেখক বিধবা-বিবাহের সপক্ষে শাস্ত্র মীমাংসা সম্পন্ন করে যুবকদের বিধবা বিবাহে অগ্রণী হতে বলেন।[৫০ক]

এই যুগের তরুণ গরুড়দল মহৎ ক্ষুধার আবেশে চঞ্চল। তাঁরা বুঝেছিলেন নারীদের শিক্ষা, সামাজিক মর্যাদা না দিলে এবং সমাজে তাদের প্রভাব বিস্তারের সুযোগ দিতে না পারলে সমাজের দৃষ্টি উদার হবে না। কৃষ্ণমোহন তাঁর' "Reforms civil and social" নিবন্ধে বললেন, "We feel ourselves burdened with a most painful yoke. We see that our hands are fettered by the most galling chains and we have every right to seek for release and freedom. Our domestic happiness is poisoned and national character is lowered."[৫১]

উদ্ধৃতিটি কেবলমাত্র উচ্চতর ভাবনার কথা নয়, দর্শনের প্রভাব নয়, একটি জীবনচর্চার সত্য উপলব্ধির প্রয়াস। এঁরা জীবনে আচরণে কথাগুলি মানতে চেষ্টা করতেন। 'এঁরা যুক্তির মহাপটে জীবনকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন।'[৫২] এঁরা গঙ্গা তুলসী পাতা, শালগ্রাম শিলার মাহাত্ম্য অস্বীকার করলেন, নিষিদ্ধ খাদ্য ভক্ষণ, সুরাপান করতেন। রামগোপাল বৃদ্ধবয়সেও মার কাছে গেলে মাকে জড়িয়ে শিশুর মত কাঁদতেন। অথচ মার অনুরোধে আট-দশ বৎসরের কন্যাকে বিবাহ করতে অস্বীকার করলেন।

ইংলণ্ডের নারীমুক্তি আন্দোলনের নেত্রীদের বক্তব্য ছিল—"We are human first women secondly, we care for the evils affecting women most of

all because they react upon the whole of society, and abstract from the common good Women are not men's rivals, but their helpers."[৫৩]

ইউরোপের হিউম্যানিস্টরা ফেমিনিস্টও বটে। যুগপরিবর্তনের সাথে সাথে নারীর পরিবর্তিত ভূমিকার প্রয়োজন হয়ে পড়ল। বিশ্বজুড়ে সোচ্চার হল—'শাস্ত্রের জন্য মানুষ নয়, মানুষের জন্য শাস্ত্র'। ইয়ং বেঙ্গলদের মধ্যেও এর প্রতিধ্বনি শোনা গেল। বিধবা-বিবাহ সমর্থন করতে যেয়ে তাঁরা বললেন—"পুরুষেরা যদি স্ত্রীর মরণান্তর পুনর্বিবাহ করতে পারে তবে স্ত্রী কেন স্বীয় স্বামীর পরলোক হইলে বিবাহ করণে সমর্থ না হয় এবং উক্ত প্রতিবন্ধকের সরলতায় কেবল পাপ ও ক্লেশের বৃদ্ধি মাত্র।'[৫৪] এ সব কথা বলার সময় শাস্ত্রের কথা ভাবেননি, ভেবেছেন মানবতার কথা। ১৮৩৭, ১৬ই ডিসেম্বর জ্ঞানান্বেষণে প্রকাশিত পত্রের বক্তব্য, "স্ত্রীলোকদিগের সুখের নিমিত্ত শাস্ত্রীয় বচন প্রমাণ দেওনের কোন আবশ্যক নাই। স্ত্রীলোকদিগকে অবশ্য মনুষ্য বলিয়া গণ্য করিতে হইবেক ইহারা সর্বোতভাবে পুরুষের সঙ্গে সমান কিন্তু আমার দিগের ব্যবস্থা ও ব্যবহারের দ্বারা তাহাদের অবস্থা ও প্রকার নীচ করাতে তাহারা যে মনুষ্য নহেন এমত প্রকাশ পাইতেছে না বরং আমাদিগের নিষ্ঠুর ব্যবহারেতে তাহাদিগের মনুষ্য বোধ করি না এমত প্রকাশ হইতেছে।"[৫৫] ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে Asiatic Journal-এ "The woman of India" নিবন্ধে ভারতীয় নারীদের জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনার কথা বলা হল। "At the rate at which intellectual marches, in these days, it is impossible to say how soon the whole structure of native society in India may be revolutionized. One thing, however, seems very clear. It can not last long in its present state, the position which women occupy must be altered, since more enlarged views and a higher degree of informations, on the part of the men, will lead to the total abrogation of many of the absurd-notions, which have so long obtained amongst Asiatics, regarding weaker sex."[৫৬]

বিপ্লব সংঘটিত করার মত তত্ত্ব ও সৈনিক প্রস্তুত হয়েছে। ১৮৩৬-এ Asiatic Journal-এ তাদের প্রস্তুতির কথা শোনা গেল। "The liberals have good of their country at heart and always cherish friendly feelings towards their countrymen. The virtue which they practice are really of an exalted nature. There is nothing in the world which they hate more than falsehood, hyprocrisy and double dealing···The principles

which they have imbibed are all based upon the doctrines of morality."[৫৭]

এই নৈতিক উদ্বোধন এবং বলিষ্ঠ চারিত্রিক সম্পদ ব্যতীত সংস্কার ও শাস্ত্রের শৃঙ্খল ছিন্ন করা সম্ভব ছিল না।

বাল্যবিবাহ নারীশিক্ষার পথে সবচেয়ে বড় অন্তরায়। বাল্যবিবাহের ফলে অপরিণত বয়স ও বুদ্ধির নরনারী পাশবিক প্রবৃত্তির বশে মিলিত হয়। দাম্পত্যজীবনের মহত্তর কোন আদর্শ অনুপস্থিত। কৌলীন্য প্রথা সমাজের সবচেয়ে বড় ব্যাধি। "কুলীন মহাশয়েরা আপন আপন স্ত্রীপুত্রদিগের প্রতিপালন করাকে এমত কুকর্ম জানেন যে তাঁহার দিগের পীড়িতাবস্থাতে ও তাঁহাদের চিকিৎসা বিষয়ে কোন চেষ্টা করেন না এবং এতদ্রূপ চেষ্টাকে আপন আপন কৌলীন্যের হানিকর জানেন।"[৫৮] বিবাহ যেখানে বিড়ম্বনা, সহানুভূতি যেখানে পরিহাস সেখানে নারীদের জীবনে মহত্তর সামাজিক আদর্শ কামনা করব কেমন করে? নারী এই সামাজিক পরিবেশে উন্নত ধ্যানধারণার স্পর্শ পাবে কি করে? পুরুষ নারী উভয়েই পরস্ত্রী ও পরপুরুষ সংসর্গে সমাজকে কলুষিত করছে। নারীদের অবসর মুহূর্তগুলি কাটে—"Sleeping or quarrelling, gaming (some times at cards) or idle conversations on low and degrading topics."[৫৯]

এতদিন নারীকে অন্তঃপুরচারিণী রূপে দেখতেই অভ্যস্ত। শিক্ষার চাহিদা যত বড় হয়ে উঠতে লাগলো, নারীর পোষাক-পরিচ্ছদ নিয়ে নানা ভাবনা-চিন্তার সূত্রপাত হল। নারীদের মুক্তির কথা ভেবে তরুণেরা রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো। এসিয়াটিক জার্নালে একজন হিন্দুর একটি নিবন্ধের কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি। "They are cribbed and cabined in kitchens and pigeon-holes, where they busy themselves in combing their locks with mottle-wax, and admiring their own beauty, having a looking-glass before them. They are not allowed to attend any ball, masquerade, or theatre, whom they might, to see captains, colonels, or knights in arms ; or the factitious gentlemen of the bar quibbling with the haughty civilians, and the thoughtful merchants, reciprocating civilities with each other. They have no opportunities of carrying on the staring and the glancing negotiations of love..."[৬০]

অবগুণ্ঠনবতী নারী এই সামাজিক পরিবেশ ও পরিস্থিতির সঙ্গে পরিচিত নয়। উক্তিটিতে নবীনদের উদ্দামতাই প্রকাশ পেয়েছে।

নদী পার্বত্য পথে কঠিন শিলায় বাধা পেয়ে প্রশস্ত হতে পারে না, তাই সে গভীর খাদের সৃষ্টি করে। চলার পথে প্রশস্ততার জন্য অনুকূল মৃত্তিকা পেলেই নিজেকে বিস্তার করে দেয়। উনিশ শতকের দ্বিতীয় থেকে চতুর্থ দশক পর্যন্ত নবীনেরা সমস্যার গভীরে প্রবেশ করছিল। যখনি সমাজ মনে সমর্থনের পলল ভূমি পেয়েছে, অমনি তাদের আন্দোলনকে ছড়িয়ে দিয়েছে। ইয়ং বেঙ্গলরা সবাই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে যেমন তাদের মোহ ছিল না তেমনি অন্যধর্মের প্রতি তাদের আসক্তিও ছিল না। তাদের একমাত্র তৃষ্ণা জ্ঞান, শুদ্ধবিবেক ও উন্নত সমাজ ব্যবস্থা। "The young Bengal was a completely isolated force in society in the late twenties and early thirties. This isolation created a unique cohesion among them and urged them into social extremism."[৬১]

এই শক্তিই পরবর্তীকালে ব্রাহ্মধর্ম ও নব্যহিন্দুধর্মের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল। তারাচাঁদ রামগোপাল-রাধানাথ-প্যারীচরণদেরও তাই তত্ত্ববোধিনীর সভায় দেখা যেত।

এতদিন নারী মুক্তি আন্দোলনের পীঠস্থান ছিল শহর কলকাতা। এবার মফস্বল শহরে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। নানা পত্রিকা এ ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। ধীরে ধীরে সামাজিক আন্দোলনেরও হাত বদল হচ্ছিল। ১৮৩০-১৮৫৯ সালের মধ্যে কলকাতা, বেহালা, ভবানীপুর, মৈমনসিংহ, ত্রিপুরা, ঢাকা, ফরিদপুর, কৃষ্ণনগর, কুমারখালি প্রভৃতি স্থানে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়[৬২] সামাজিক আন্দোলনের ঢেউ এ সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছিল। এখনও ব্রাহ্মধর্মের সঙ্গে হিন্দুধর্মের মৌল কোন বিরোধ লক্ষ্য করা যাবে না। শিক্ষিত বাঙালী সাধারণভাবেই ব্রাহ্মদের আন্দোলনের প্রতি সহানুভুতিশীল। ব্রাহ্মরাও ঘরে ঘরণীর সঙ্গে হিঁদুয়ানি পুরামাত্রায় বজায় রাখতেন।[৬৩]

॥ তিন ॥

খৃষ্টান মিশনারী ও পাশ্চাত্যের প্রাচ্যবিদেরা এ দেশের নারীদের নানা সমস্যার কথা অষ্টাদশ শতক থেকেই ভাবতে আরম্ভ করেছিলেন। এসিয়াটিক সোসাইটির অন্যতম কর্ণধার কোলব্রুক "On the duties of a faithful Hindoo"[৬৫] (1795) এবং "Enumeration of Indian classes (1798)"[৬৫] নিবন্ধ দুটিতে বৈধব্য, সতীদাহ, কৌলিন্যপ্রথা, জাতিভেদ প্রভৃতি নিয়ে সুদীর্ঘ আলোচনা করেন। ১৮২১ খৃঃ লণ্ডন নিউসপেপারে ওয়ার্ডের (Ward) একটি পত্র ছাপা হয়। তিনি লিভারপুল

তথা যুক্তরাজ্যের নারীদের ভারতীয়নারীদের মধ্যে খৃষ্টধর্ম প্রচারের জন্য সাদর আহ্বান জানান।[৬৬] "Asiatic Journal"-এ প্রকাশিত পত্রপ্রেরক "A Bengalee" কিন্তু বিদেশী। তিনি ওয়ার্ডের থেকে কিছুটা ভিন্নমত পোষণ করতেন। "……the ladies of England can do nothing towards bettering the social and domestic condition of the ladies of Hindoostan."[৬৭] তবে ওয়ার্ড রামমোহনের সমকালে জোর দিয়ে বলেছিলেন—"Schools must be commenced, knowledge must be communicated."[৬৮]

মিশনারীদের বহুপূর্বে কয়েকজন ইংরাজ মহিলা দেশীয় খৃষ্টান ও ইংরাজ বালিকাদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। ১৭৬০ খৃঃ মিসেস হেজ্, ১৭৯২ খৃঃ মিসেস পীট্, ১৭৯৪ খৃঃ মিসেস রাইন এবং ১৮০০ খৃঃ মিসেস লাউসেনের বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বিদ্যালয়গুলিতে লেখাপড়া ব্যতীত আর একটি উদ্দেশ্য ছিল—"Here civil factors and Merchants, Military officers, Indigo planters and Government clerks managed to find sweethearts and wives."[৬৯]

এ সব বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ছিল ইংরাজ বণিক ও কর্মচারীদের দৈহিক ক্ষুধা মেটান। কেরী-মার্শম্যান-ওয়ার্ডের উদ্দেশ্য ছিল নারী শিক্ষার মধ্য দিয়ে খৃষ্টধর্ম প্রসার। ১৮১১ খৃঃ প্রায় চল্লিশটি বালিকা নিয়ে তারা বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করলেন।[৭০] লাঙ্কেস্টার পরিকল্পনানুযায়ী শিক্ষা দেওয়া হত। লুশিংটন তাঁর গ্রন্থে নারীশিক্ষা ক্ষেত্রে শ্রীরামপুর মিশনারীদের অবদানের কথা উল্লেখ করেন নি। শ্রীরামপুরের কার্যকলাপ সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৮২৪ সালে ১৩টি বালিকা বিদ্যালয়ে ২৩০ জন বালিকা গোপাল মল্লিকের বাড়ীতে পরীক্ষার জন্য সমবেত হয়েছিল। ১৮১৯ খৃঃ 'দি ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটী' প্রতিষ্ঠিত হয়। "There had been no girls school before this one was set up."[৭১] অথচ আমরা পূর্বেই বলেছি দেশীয় বালিকাদের শিক্ষার জন্য ১৮১১ খৃঃ শ্রীরামপুরের মিশনারীরা বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। জুভেনাইল সোসাইটী গৌরীবাড়ী, উল্টাডাঙ্গা প্রভৃতি স্থানে বিদ্যালয় স্থাপন করেছিল। ১৮২১-২২ সালে 'ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটী'র বালকদের সঙ্গে এইসব বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা পরীক্ষা দেয়। রাধাকান্ত দেব ও গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার হিন্দুদের মধ্যে নারী শিক্ষাকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। বিদ্যালয়ে খৃষ্ট-ভজনা ও কিছু ছাত্রীর ধর্মান্তরের ফলে মিশনারীদের জনপ্রিয়তা কমে যায়। সমাজ সংস্কারের মঞ্চে অন্য বিষয় নিয়ে মতবিরোধ থাকলেও নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে ধর্মসভার অনেকেই এগিয়ে এলেন। রাধাকান্ত দেবের বাড়ীতেও বালিকাদের পরীক্ষা নেবার ব্যবস্থ

হয়েছিল। বেথুন সাহেবের বিদ্যালয় স্থাপিত হলে রাধাকান্তও নিজের বাড়ীতে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটীর সবচেয়ে বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন হেয়ার সাহেব।

১৮১৭ থেকে ১৮৩০ সালের এই তের বৎসর ধরে হিন্দু কলেজ থেকে বারশত ছাত্র শিক্ষা সমাপ্ত করে দেশের নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে।[৭২] তাঁরা জীবিকার জন্য যে পেশাই গ্রহণ করুন না কেন সমাজ সংস্কার ও নারীশিক্ষার ব্যাপারে সকলেই উৎসাহী ছিলেন।

১৮২৪, ২৫শে মার্চ মিস ম্যারী কুকের পরিচালনায় 'লেডিস সোসাইটী ফর্ নেটিভ ফিমেল এডুকেশন ইন ক্যালকাটা এণ্ড ইটস্ ভিসিনিটি' স্থাপিত হয়। রাজা রাধাকান্ত দেব, রাজা বৈদ্যনাথ রায়, রাজা শিবকৃষ্ণ প্রভৃতি অর্থ ও উৎসাহ দিয়ে মিস্ কুককে যথেষ্ট সাহায্য করেন।

গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার 'স্ত্রী শিক্ষা বিধায়ক' গ্রন্থটি প্রচারের জন্য মিশনারীদের হাতে তুলে দেন। গ্রন্থটির কিছু অংশ পাঠ্য তালিকাভুক্ত হয়। সেণ্ট্রাল স্কুলের সঙ্গে একটি নর্মাল স্কুল খোলা হল। নর্মাল স্কুলের ছাত্রীরা ছিলেন হয় বিধবা নয় স্বামী পরিত্যক্তা। রাজা বৈদ্যনাথের স্ত্রী মাঝে মাঝে বিদ্যালয় পরিদর্শন করে ছাত্রী ও শিক্ষিকাদের উৎসাহ দিতেন। সে যুগের একজন মহিলার নারীশিক্ষা ব্যাপারে এতখানি কৌতূহল আমাদের বিস্মিত করে। কিছু ছাত্রাকে ধর্মান্তরিত করায় বিদ্যালয়টির বহুমুখী প্রয়াস সত্ত্বেও গুরুত্ব কমে গেল। নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে বিদ্যালয়টির চিরস্থায়ী অবদান পরবর্তীকালে বেথুনের বিদ্যালয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। শিক্ষার মাধ্যম বাংলা ভাষা। পাঠ্যক্রমে ভূগোল ও ইতিহাস স্থান পেয়েছিল। এই বিদ্যালয়ে "A new class of monitors or teachers was introduced in the central female school."[৭৩]

কয়েকটি বালিকাকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করায় নারী শিক্ষায় উৎসাহীরা পিছিয়ে না গেলেও মিশনারীদের পাশে দাঁড়াবার মত উৎসাহ আর রইলো না। সরকার কিন্তু এ পর্যায়েও সাহায্যের হাত বাড়ালেন না। মিশনারী বিদ্যালয়গুলির ছাত্রীরা আসতো সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণীর (বাগ্দী, মুচি, নমঃশূদ্র, জেলে) প্রভৃতির মধ্য থেকে।[৭৪] এ কথা ভুললে চলবে না আমাদের দেশে প্রথম যে সব ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত নারীদের আবির্ভাব হল তারা কিন্তু মিশনারীদের স্কুল থেকে এসেছিল। এরা সবাই সমাজের নিম্নশ্রেণীর বালিকা।

উচ্চশ্রেণীর মধ্যে একটি ধারণা ক্রমশঃ বদ্ধমূল হচ্ছিল যে, মিশনারীদের বিদ্যালয়

কেবলমাত্র নিম্নশ্রেণীর জন্য। মিস্ কুক গৃহে গৃহে গিয়ে নারীদের কাছে আবেদন জানান। লুশিংটন তাঁর গ্রন্থে কুকের প্রয়াসের সুন্দর সুন্দর চিত্র তুলে ধরেছেন।[৭৫] বহু গৃহেই গৃহিণী ও কন্যা একত্রে পাঠাভ্যাস করতো। কিছু কিছু বালিকা বিদ্যালয়েও যেতে আরম্ভ করলো।

প্যারীচাঁদ মিত্র যাঁদের "Young Calcutta" এবং "fire brands" বলেছেন তাঁরা সকলেই কিন্তু ইংরাজী শিক্ষার মাধ্যমে নারীদের আধুনিক জীবন জগতের শরিক করে গড়ে তুলতে চেয়েছিল। সমাজের উচ্চ এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণী ধর্মনিরপেক্ষ স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছিল। রাধাকান্তদেব-প্রসন্নকুমার-বৈদ্যনাথ প্রভৃতি প্রতিপত্তি-শালীদের কন্যারা গৃহে ইংরাজ মহিলার কাছে পড়তেন। প্রসন্নকুমার তাঁর পত্রিকায় "liberal system of education"[৭৬] এর কথা বললেন। হিন্দু কলেজের ক্ষেত্রে যে শিক্ষা-পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে নারীদের ক্ষেত্রেও তাকে স্বাগত জানালেন।

এদেশের অধিকাংশ পিতা পুত্রের শিক্ষা সম্বন্ধে যতখানি সচেতন ও উদার, কন্যার শিক্ষার ক্ষেত্রে ঠিক ততখানিই রক্ষণশীল। অধিকাংশ পিতার কথা—"You educate my sons, says a Hindu father and open to them all the sorts of knowledge, but my daughters you must not approach, however benevolent your designs, their ignorance and seclusion are essentially necessary to the honour of my family···They must be married at an age when your plan of education could scarcely commence."[৭৭]

একই কথা বলেছেন আর. ডব্লিউ. টি. এফ দিব্দিন।[৭৮] পত্র পত্রিকা কিন্তু নারী-শিক্ষার দাবীকে ক্রমশই জোরদার করে তুলছিল। এবার কিছু সম্মানিত সামাজিকের নারীশিক্ষার জন্য অগ্রণীর ভূমিকা নেবার প্রয়োজন দেখা দিল। রাধাকান্তদেব, বৈদ্যনাথ রায়, রাজা কালীকৃষ্ণ, রামগোপাল ঘোষ, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, কাশীনাথ রায় চৌধুরী, বৈকুণ্ঠনাথ রায়চৌধুরী, ভবানী প্রসাদ রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, মতিলাল শীল, জয়কৃষ্ণ মুখার্জী, রাজকৃষ্ণ মুখার্জী, হলধর মল্লিক প্রভৃতি ব্যক্তিদের প্রয়াস ও প্রচেষ্টা স্মরণীয়। বেঙ্গল বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটীর সভ্যরা নারীশিক্ষার ব্যাপারে কতকগুলি প্রগতিশীল প্রকল্পের কথা ভাবছিল। উত্তরপাড়ার মুখার্জী ভ্রাতৃদ্বয় ১৮৪৫ খ্রীঃ বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য কাউন্সিলের কাছে আবেদন করেন। চার বৎসর পর কাউন্সিল আর্থিক অনটনের জন্য আবেদনটি বাতিল করে দেন। ১৮৪৭ খ্রীঃ প্যারীচরণ সরকার, ডাঃ নবীনকৃষ্ণ মিত্র এবং কালীকৃষ্ণ মিত্রের প্রচেষ্টায় বারাসাতে মধ্যবিত্ত বালিকাদের জন্য

বেসরকারী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়।[৭৯] বারাসাতের এই বিদ্যালয়ের সঙ্গে বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার ও বেথুন সাহেবের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। বারাসাত বিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রী, প্রধান উদ্যোক্তা নবীনকৃষ্ণ মিত্রের কন্যা। নারী বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য প্যারীচরণ সরকার ও নবীনকৃষ্ণ মিত্র সামাজিক দিক থেকে একঘরে হন।[৮০] উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্মচারী সস্ত্রীক বিদ্যালয় পরিদর্শনে এসে সস্নেহে কোন বালিকার চিবুক স্পর্শ করলে বালিকাটিকে সমাজচ্যুত করা হয় এবং শহরে উত্তেজনা দেখা যায়।[৮১] বিদ্যালয় থেকে ছাত্রীদের তুলে নেওয়া হল। কালীকৃষ্ণ স্বয়ং শিক্ষকতার দায়িত্ব নেওয়ায় বিদ্যালয়ের ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এই বিদ্যালয় বেথুনকে উৎসাহী করে। এবং বাঙলাদেশে বিদ্যালয় স্থাপনে প্রেরণা জুগিয়েছিল। "The council have been informed that similar schools have formed at Neebodhia, Bansbaria and some other villages, but no official communication has been yet made to the council by the managers of them."[৮২]

১৮৪৯, ৭ই মে ক্যালকাটা ফিমেল স্কুলের প্রতিষ্ঠা হল। প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম হলেন ড্রিঙ্ক ওয়াটার বেথুন, রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, মদনমোহন তর্কালঙ্কার ও পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বিদ্যালয়ের একুশজন ছাত্রীর মধ্যে প্রথম ভর্তি হয় মদনমোহনের দুই কন্যা ভুবনমালা ও কুন্দমালা। বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার পর নানারকম বাধাও আসতে লাগলো। ইংলিশম্যান পত্রিকায় লেখা হল—"Our weekly contemporary is probably alarmed at the experience derived, from the Hindoo college······He may infer from their example that dangerous as such an outset may be for the men, it would be fatal to young women and that the result of the first experiment would not be such as to encourage parents to make a seconds trial."[৮৩]

এসব মন্তব্য বেথুনকে বিচলিত করেনি। কারণ তিনি সে সময়ের সামাজিক সংগঠন সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণী পাশে দাঁড়াবে এ বিশ্বাস তাঁর ছিল। কেননা এতদিন পত্র-পত্রিকায় নারী শিক্ষা নিয়ে তারাই আলোচনা করে আসছিল। তিনি কি সরকার কি ইংরাজ নারী পুরুষ কারোর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেননি। আবার রাধাকান্তদেব, আশুতোষ দেব, রাজা কালীকৃষ্ণ এবং প্রসন্নকুমারের মত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বিদ্যালয়ের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানাননি। তিনি বিরোধ বা প্রাধান্যকে এড়িয়ে গেছেন। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের সংগ্রহ করেছিলেন তাঁর ঘনিষ্ট

বন্ধুদের মধ্য থেকে। হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সার অভিভাবক ও ছাত্রীদের নাম দিয়ে একটি তালিকা প্রকাশ করে।[৮৪] হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সারের সম্পাদক কাশীপ্রসাদ ঘোষ 'ইণ্ডিয়ান বার্ড' নারী শিক্ষার ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি বেথুনের বিদ্যালয়ের বিরোধিতা করেন। ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া বিদ্যালয়টির ধর্মনিরপেক্ষতার জন্য ভাল চোখে দেখত না এবং পত্রিকায় লিখল দেশীয় পত্রিকাগুলি বিদ্যালয়টির ঘোর বিরোধী। সম্বাদ সুধাংশুর সম্পাদক কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বক্তব্যের বিরোধিতা করেন। প্রভাকর, ভাস্কর, পূর্ণচন্দ্রোদয়, চন্দ্রিকা, রসরাজ, বেঙ্গল রেকর্ডার সবাই বেথুনের বিদ্যালয়ের পক্ষে ছিল। বিদ্যালয়ের ছাত্রী ও শিক্ষিকাদের কেন্দ্র করে নানা গুজব রটনাই ছিল হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সার ও ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া ও ক্রিশ্চান অবজার্ভারের কাজ। দেশীব পত্র পত্রিকা বিদ্যালয়টিকে কেবল স্বাগত জানায়নি, তীব্র ভাষায় বিবোধীদেব দমন কবেছে। বেথুন বাংলা সংবাদপত্রকে বারবার ধন্যবাদ জানিয়েছেন।[৮৫] বিদ্যালয়েব নতুন ভবনের ভিত্তি স্থাপন করেন লেডী লিটল্। একটি অশোক তরুর চারা বোপন করা হয়। এই সভায় বেথুন বলেন, "The Jonesia Asoca, for that is its botanical name, calls the name of the great Sir William Jones—one of the earliest who extended himself to link together the learning of the East and Western worlds."[৮৬]

তিনি এই অশোক তরুকে নারী শিক্ষার প্রতীক রূপে গণ্য করতে বলেছেন। এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা 'একটি যুগান্তকারী ঘটনা'[৮৭] এর প্রভাব সারা দেশে অচিরেই ছড়িয়ে পড়বে।

বিদ্যাসাগর যেমন বিধবাবিবাহকে তাঁর জীবনের সর্বাপেক্ষা পবিত্র কর্ম বলে মনে করতেন, বেথুনও তেমনি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকে তাঁর জীবনের সবাপেক্ষা মহৎ কর্ম বলে ধরে নিয়ে ছিলেন।[৮৮] মাতৃভক্তি এবং স্ত্রীজাতির প্রতি শ্রদ্ধা তাঁদের চরিত্রের অন্যতম গুণ হলেও কর্মক্ষেত্রে একমাত্র প্রেরণার উৎস নয়। কেননা সে মুহূর্তটিই ছিল বিশ্বজুড়ে নারীমুক্তি আন্দোলনের জোয়ার। "Revolutionize our homes."[৮৯] গৃহের রূপান্তরের জন্য প্রয়োজন নারীর রূপান্তর। নারীই গৃহের প্রাণকেন্দ্র। সব স্নেহ ভালবাসা, উচ্চতর আদর্শ এমনকি জাতীয় জীবনের মৌলিক শক্তিও লুকিয়ে থাকে নারী হৃদয়ের স্বর্ণপেটিকায়।

স্ত্রী-শিক্ষার ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে এল উপযোগবাদ। "Passing of examinations now seemed to be the main criterion for acquiring knowledge."[৯০] সামাজিক দিক থেকে এতদিন যে বাধা আসছিল তার ধার কমে যেতে লাগল।

ইতিপূর্বে সহমরণ, হিন্দুকলেজ, মেডিকেল কলেজ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা নিয়ে সমাজে প্রবল ঝড় উঠেছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে সামাজিক প্রয়োজন বড় হওয়ায় অল্প সময়ের মধ্যে তা স্তব্ধ হয়ে যায়। বালিকা বিদ্যালয় নিয়েও ঝড় উঠল এবং অচিরেই থেমে গেল। ১৮৫১ সালে বেথুন গত হলেন। নারী শিক্ষাকে শিক্ষিত শ্রেণীর হাতে তুলে দিয়ে গেলেন। তাঁর মৃত্যুর পাঁচ বৎসর পর কৃষ্ণদাস পাল বললেন—"A new race has risen on the land, their newly-sprung up class are a glory to the nation······They have discovered that women like them are made of flesh and blood, are governed by similiar motives, influenced by similiar affections, watched over by the same providence, have equal rights, are entitled to similiar treatment."[৯১]

১৮৫০ খ্রীঃ বিদ্যাসাগর বেথুন বিদ্যালয়ের অবৈতনিক সম্পাদক হয়ে বিদ্যালয়ের স্থায়ী অট্টালিকা এবং ছাত্রীদের গৃহ থেকে বিদ্যালয়ে আনার ব্যবস্থা করেন। তিনি নারী শিক্ষাকে গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে দেবার কথা ভাবছিলেন। তত্ত্ববোধিনী সভা ও পত্রিকা তাঁর সবচেয়ে বড় সহায় হল। বেথুনের প্রয়াসেই বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন নারীশিক্ষার উপযোগী পাঠ্যপুস্তক রচনায় ব্রতী হন।

বেথুন নারীর অবগুণ্ঠনের বহর কমিয়ে দিয়ে তাদের জগৎ ও জীবনকে দেখার ও বোঝার, শক্তি ও দৃষ্টি ফিরিয়ে দিলেন। সারা ভারত জুড়ে নবজাগরণের মঙ্গল শঙ্খধ্বনি শোনা গেল। লর্ড ডালহাউসী নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারের "frank and cordial support" জানালেন। সরকার স্পষ্টভাষায় জানাল—····"It promised financial assistance and even direct action, if necessary."[৯২] ১৮৫৪ সালে মাদ্রাজে ২৫০টি বালিকা বিদ্যালয়ে ৮,০০০ ছাত্রী, বোম্বাইতে ৬৫টি বিদ্যালয়ে ৬,৫০০ ছাত্রী এবং বাংলাদেশে ২৮৮টি বিদ্যালয়ে ৬,৮৬৯ জন অধ্যয়ন করে। বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠায় সংবাদ প্রভাকর কেবল স্বাগতই জানায়নি, যাঁরা বাংলাদেশে একটি মাত্র বালিকা বিদ্যালয়ের কথা ভেবে হতাশ হয়েছিলেন তাঁদের আশ্বস্ত করে বলেছিলেন—"অল্প হইতেই ক্রমে ক্রমে অধিক উৎপন্ন হয়, ক্ষুদ্র একটি বীজ ভূমির গর্ভে বপন করিলে তাহাতে বৃক্ষ হইয়া সেই বৃক্ষে এত ফল হয় যে ফল হইতে উৎপাদিত তরুগণ পৃথিবীতে বিস্তৃত হইয়া থাকে··· ।"[৯৩]

বেথুন প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় সমাজের সর্বস্তরকে আন্দোলিত করে তুলেছিল। দেশে প্রকাশ্যে স্ত্রীশিক্ষার প্রসার আরম্ভ হল। নারী শিক্ষা এখন আর দোষের নয়, গুণের আকর হল। "ইহার প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ অনতিকাল মধ্যে আমরা কোন কোন

ভদ্রমহিলাকে পর্দার অন্তরাল ভেদ করিয়া সাহিত্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে দেখি। তাহাদের রচিত কবিতাবলী ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত সম্বাদ প্রভাকর পত্রে সাদরে গৃহীত হইতে থাকে।[১৪]

ইংরাজ সৃষ্ট নগর কলকাতার নাগরিকরা বিত্তের অধিকারী, চিত্তের নয়। এদের প্রমোদ আসরে জমিয়ে বসেছিল কবি, তরজা, আখড়াই, হাফ্-আখড়াই এর দল। নারীরাও এখানে একেবারে অনুপস্থিত নয়। এ যুগের গায়িকারা এসেছিলেন সমাজের নিম্নশ্রেণী থেকে। অধিকাংশ নারী পতিতা। যজ্ঞেশ্বরী এবং দাশরথি রায়ের প্রণয়িনী অকাবাঈ (অক্ষয়া বাইতানি)[১৫] 'নেড়িকবি', গোলকমণি, দয়ামণি ও রত্নামণি এবং কীর্তন গায়িকা রজনী যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছিল। এ যুগ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "তখন নূতন রাজধানীর নূতন সমৃদ্ধশালী কর্মশ্রান্ত বণিক সম্প্রদায় সন্ধ্যাবেলায় বৈঠকে বসিয়া দুইদণ্ড আমোদের উত্তেজনা চাহিত, তাহারা সাহিত্য রস চাহিত না।"[১৬] রুচি বোধটি উহ্য থাকায় শ্লীলতা ও সাহিত্যের ঔচিত্যবোধের কোন বালাই ছিল না। শ্রোতারাই যেখানে বিকৃতরুচির অধিকারী এবং রচয়িতা ও রচয়িত্রীরা যেখানে পেশাদারী সেখানে উন্নত ভাবের গভীর গম্ভীর সুরের গান গাইবার প্রেরণা কোথা থেকে আসবে? এই পরিবেশে ভদ্রঘরের মহিলাদের প্রকাশ্যে কাব্যচর্চার প্রশ্নই ওঠে না।

আধুনিক নারীরা উনিশ শতকীয় নব মূল্যবোধ এবং উদার ভাব ভাবনার শরিক। মহিলাদের সাহিত্য চর্চায় প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করতে না দেখা গেলেও, সামাজিক অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট মতামত ব্যক্ত করতে দেখা যাবে। নারীদের এই ক্ষোভ বিক্ষোভের তরঙ্গগুলিই পরবর্তীকালে সাহিত্যে দানা বাঁধবে।

উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে চতুর্থ দশক পর্যন্ত পত্রিকায় অন্তঃপুরচারিণীদের নানা অভাব অভিযোগ, দাবী ও আবেদন শুনতে পাব। ১৮২৫, ৫ই জানুয়ারী সমাচার দর্পণে চরকাকাটুনির একটি আবেদন ছাপা হয়। বিলাতী সুতা আমদানির ফলে দেশীয় সুতা প্রস্তুত কারকদের উপর বিরূপ অর্থ নৈতিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়; বহু পরিবার সম্বলহীন হয়। এমনি একটি পরিবারের প্রধানা চরকাকাটুনির দরখাস্ত—"আমি নিতান্ত অভাগিনী আমার দুঃখের কথা তাবৎ লিখিতে হইলে অনেক কথা লিখিতে হয় কিন্তু কিছু লিখি আমার যখন সাড়ে পাঁচগণ্ডা বয়স তখন বিধবা হইয়াছি কেবল তিনকন্যা সন্তান হইয়াছিল।"[১৭] তিনি চরকাকেটে কন্যাদের বিবাহ, শ্বশুর-শাশুড়ীর শ্রাদ্ধশান্তির খরচ বহন করেছিলেন। বিলাতী সুতার আমদানিতে তিনি অনাথা, অন্নহীনা। পত্রটিতে নারীদের প্রতিকূল অবস্থায় অর্থ নৈতিক সুযোগ সুবিধার অভাবের কথা যেমন ব্যক্ত হয়েছে তেমনি দুঃসহ বৈধব্য জীবনের বেদনারও প্রকাশ ঘটেছে। ১৮৩১ সালে

সম্বাদ কৌমুদীতে[৯৮] শ্রীমতী অমুকী দেবী নামে পত্রটিতে কৌলীন্যপ্রথার কুফল সম্বন্ধে লেখেন। পত্রে লেখিকা নিজ জীবনের করুণকাহিনী বিবৃত করেন। জন্মের পর কন্যা কোনদিন পিতাকে দেখেনি। কন্যা বড় হওয়ায় পিতা কর্তা সেজে কন্যার মাতা ও কন্যাদের মতের বিরুদ্ধে এক বৃদ্ধের সঙ্গে এক রাতে তিন কন্যার বিবাহ দেন। "সেই অবধি প্রায় পঞ্চাশ বৎসর বয়ঃক্রম হইল পতির সহিত দশন নাই বর্তমানে আছেন কিনা তাহাও জ্ঞাত নহি কেবল মাতুলের ভবনে কখন পাচিকা কখন বা দাসীরূপে কালযাপন করিতেছি···।" কুলীনদের বহু বিবাহ রোধ হলে কুলীন কন্যারা দুঃসহ জীবন থেকে মুক্তি পাবে। লেখিকা বলেছেন—"আমাদের হর্ষের বিষয় এই যে তদ্দারা আমাদের তুল্য দুঃখিনী আর কেহ হইবেক না।"

১৮৩৫ সালে সমাচার দর্পণে 'প্রৌঢ়া পতিহীনা দীনা ক্ষীণা এবং অবিবাহিতা কুলীন ব্রাহ্মণ কন্যাদের,'[৯৯] একটি পত্র প্রকাশিত হয়। রামমোহনের প্রবর্তক নিবর্তক সংবাদ সে যুগে ঘরে ঘরে পঠিত ও আলোচিত হত। হিন্দু কলেজের তরুণ যুবকেরা নারী-মুক্তির বিষয় নিয়ে পত্র পত্রিকা, সভা-সমিতিতে যে সব আলোচনা করতেন তার উত্তাপ অন্দরমহলেও প্রবেশ করেছিল। বিদেশের সামাজিক রাজনীতি সম্বন্ধেও এই যুগের নারীরা অবহিত ছিলেন। "শ্রীযুক্ত ইংরেজ বাহাদুরের রীতিমধ্যস্থ অনেকানেক জাতীয় স্ত্রীলোকের বৈধব্যবস্থা হইলে তাহারদিগের পুনরায় বিবাহ হয়। কেবল আমারদিগের এই বাংলাদেশে বাঙ্গালীর মধ্যে যে কায়স্থ ও ব্রাহ্মণের কন্যা বিধবা হইলে বিবাহ হয় না। যদ্যপি ঐ স্ত্রীলোকেরা উপপতি আশ্রয় করে তবে যে কুলোদ্ভবা সে কুল নষ্ট হয়। কিন্তু ঐ উভয় বিশিষ্ট কুলোদ্ভব মহাশয়েরা অনায়াসে বেশ্যালয়ে গমনপূর্বক উপস্ত্রী লইয়া সম্ভোগ করেন তাহাতে কুল নষ্ট হয় না।" এ কেবলমাত্র আবেদন নিবেদন নয়, যুক্তিপূর্ণ পরিস্থিতি বিশ্লেষণ ও মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। সমাজ-বিবেককে তাঁদের প্রশ্ন—"কেবল স্ত্রীলোকের সুখ সম্ভোগ নিষেধার্থে কি ধর্মশাস্ত্র ও পুরাণতন্ত্র সৃজন হইয়াছিল।" সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, বিধবাবিবাহ, সর্বক্ষেত্রেই শাস্ত্রের শাসন নারীকে ভ্রষ্টচারিণী হবার হাত থেকে রক্ষা করা। অর্থাৎ নারীর অধিকারকে সীমিত করা। এর উত্তর দিলেন "কচিৎ শান্তিপুর নিবাসিনী।"[১০০] "স্ত্রীলোক ব্যভিচারী কেবল পুরুষের দ্বারা যদ্যপি পুরুষ সকল উপস্ত্রী বর্জিত হন তবে স্ত্রীলোক কুলটা হইতে পারেন না।" পুরুষই দুর্বলচরিত্র, নীতিজ্ঞানহীন। নিজের অধঃপতনের কারণ স্বরূপ নারীকে দোষারোপ করে থাকে। সর্বশেষে লেখিকা বিধবা বিবাহের পক্ষে শাস্ত্রীয় বিধি ও প্রাচীন শাস্ত্রীয় উদাহরণ উদ্ধৃত করে বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের জন্য আবেদন করেছেন। এবং মুক্ত মনে নারীদের সমস্যা বিচারের জন্য উৎসাহীদের তৎপর হতে বলেছেন।

চন্দ্রিকা সম্পাদক নারীদের পত্রগুলিকে সাদা চোখে দেখতে পারেননি। সমাচার দর্পণের সম্পাদককে এই জাতীয় পত্র প্রকাশের জন্য তিরস্কার করেছেন। সম্পাদককে সাবধান করে দিয়ে বলেছেন জম্বুদ্বীপ ও ইংলণ্ডের নিয়ম সম্পূর্ণ ভিন্ন। ১৮৩৫ খৃঃ আরও ৩খানি পত্র সমাচার দর্পণে প্রকাশিত হয়। 'চুঁচুড়ানিবাসী স্ত্রীগণস্য'[১০১] তাঁদের পত্রে শান্তিপুর নিবাসিনীদের পত্রের সমর্থনে লেখেন, "তাঁহারা এক্ষণে যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন তাহা অবলম্বন করিতে আমাদেরও বহুকাল যত্ন ছিল। কিন্তু সহকারী না থাকাতে ভয়প্রযুক্ত আমরা অগ্রসর হইতে পারি নাই। এক্ষণে সে ভয় দূর হইল। অতএব আপনাদের সঙ্গে দুঃখ সম্বোদক রোদন করিতে আমরা লিখি।" চারিপাশের নারীরা একই ভাবের জোয়ারে পাল তুলেছেন। পুরুষের প্রতিবাদের কণ্ঠস্বরের পাশাপাশি নারীরাও সরব হয়ে উঠেছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় সমাজ সংস্কারকের ভূমিকা গ্রহণের বহু পূর্বে নারীরা তাদের সমস্যাকে তুলে ধরেছেন। পত্র লেখিকারা 'পিত্রাদি ও ভ্রাতৃবর্গের' কাছে আবেদন করছেন। পারিবারিক মর্যাদা, ব্যক্তি ও অর্থ লোলুপতার বশে শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে পিতা ও ভ্রাতারাই কন্যা ও ভগ্নীদের অত্যাচার করে থাকেন। আপন ঘর সংস্কার না করে সমাজ সংস্কার করা যায় না। চুঁচুড়ার স্ত্রীগণ তাঁদের পত্রে কতকগুলি যুগান্তকারী দাবী পেশ করেন। প্রথম দাবী—বিশ্বের অন্যান্য সভ্যদেশের নারীদের মত তাদেরও বিদ্যা অধ্যয়নের সুযোগ দিতে হবে। দ্বিতীয়—"অন্যান্য দেশীয় স্ত্রীলোকেরা যেমন স্বচ্ছন্দে সকল লোকের সঙ্গে আলাপাদি করে আমারদিগকে তদ্রূপ করিতে কেন না দেন।" তৃতীয় দাবী—এ যুগে নারীরা আর 'বলদ ও অচেতন দ্রব্যাদির ন্যায় হস্তান্তরিত হতে চান না। স্বামী নির্বাচনে সুযোগ দিতে হবে, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, পণপ্রথা বন্ধ করতে হবে। কুলধর্ম ও সম্ভ্রমের দোহাই দিয়ে নারীদের পুরুষের কামনার যূপকাষ্ঠে বলি দেওয়া উচিত হবে না। চতুর্থ দাবী—তারা ক্রীতদাসীর মত জীবনযাপন অস্বীকার করলেন। নারীর অর্থ নৈতিক স্বাধীনতা চাই। স্ত্রীধন, যা শাস্ত্র নির্দিষ্ট, সমাজে তার স্বীকৃতি চাই। বর্তমান সামাজিক ব্যবস্থায় 'স্ত্রী' ক্রীত সম্পত্তির মত গণ্য হয়। পঞ্চম দাবী—"যাঁহাদের অনেক ভার্যা আছে তাঁহাদের সঙ্গে কেন আমাদের বিবাহ দিতেছেন। ভার্যার মৃত্যুর পরে স্বামী পুনর্বিবাহ করিতে পারে তবে কেন স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুর পরে করিতে না পারে। পুরুষের যেমন বিবাহ করিতে ইচ্ছা তেমন কি স্ত্রীর নাই।" জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভা এবং কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিবন্ধগুলি অনেক পরবর্তীকালে রচিত হয়েছিল। কাসাং শান্তিপুর নিবাস্যনেক বিরহিনীনাং'[১০২] পত্রে চন্দ্রিকার সম্পাদকের বিরূপ মন্তব্যের উত্তর দিয়ে লেখেন, "কেবল অজ্ঞসমীপে বিজ্ঞতা যেন দ্বিতীয় কুন্তীর গর্ভজাত

যুধিষ্ঠিব বজায় ধর্মপুত্র যেমন গঙ্গাপুত্র এইক্ষণে ধর্মসভা সম্পাদক কিবা সদ্বিবেচক উত্তরকারক যেমন যুদ্ধে বিরাটপুত্র উত্তর তেমনি উত্তোরত্তর পত্রের উত্তরে বিদ্যা প্রকাশ হইতেছে। সে যাহা হউক ধর্মশাস্ত্রানুযায়ী দেশাধিপতিকে মর্মবেদন অবগত করিয়া আমাদিগের যাতনা নিবারণার্থ ও লম্পটদিগেব লম্পটতা বারণকরণার্থ উদ্যোগী তাহাতে দুর্যোগি ধর্মপুত্র প্রতিবাদী।" চন্দ্রিকা সম্পাদকের বিরুদ্ধে শ্লেষের এমন অব্যর্থ তূণ বোধহয় প্রভাকর সম্পাদকও বেশি ব্যবহার করতে পারেননি। বকধার্মিকদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও শ্লেষ নিক্ষিপ্ত হয়েছে। এ জাতীয় শ্লেষের জন্য যে বোধ বুদ্ধিব প্রয়োজন তা যথেষ্ট পরিমাণে পত্রলেখিকার আছে। নারীদের প্রচলিত মূল্যবোধ ও বিশ্বাসে ফাটল ধবেছে। শাস্ত্রীয় বিধিব চেয়ে বিবেক ও যুক্তির নির্দেশকে মহিলারা অনেক বেশি মূল্য দিয়েছেন। শাস্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যা তাঁদের কাছে অপব্যাখ্যা মাত্র। তাঁরা দেশাধিপতিব কাছে আইনেব জন্য প্রার্থনা কবেছেন। ১৮৪০ 'শ্রীতাবিহক গশজ মগৌ ইত্যাদি' পরিচয়ে 'হিন্দু জমিদার ও কুলবালাদেব একটি পত্র প্রকাশিত হয়। হিন্দুদের দাযভাগ গ্রন্থ কন্যাদের পিতৃধনে বঞ্চিত করেছে। কৌলীন্য প্রথা প্রচলনের ফলে পিতা বা ভ্রাতা যে স্ত্রীধন দেন তা পণরূপে পরিগণিত হয়। কন্যার সে ধনে কোন অধিকাব থাকে না। কুলীন পাত্র সমস্ত অর্থ আত্মসাৎ করে। বহুবিবাহেব ফলে কুলীন স্বামী নামে মাত্র স্বামী। কন্যাদের পিতৃগৃহেই দিন কাটাতে হয়। "পুত্রবধূর তুল্য অলঙ্কারাদি কন্যাকে দেন না তাহার তাৎপর্য পরের ঘরে ধন যাইবে।" লেখিকা মনু, মিতাক্ষরা প্রভৃতির বিধানের উদ্ধৃতি দিয়ে বললেন প্রচলিত নিয়ম শাস্ত্রের বিধানকে উপেক্ষা করেছে। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ব্যতীত আর সব অধিকার পরিহাসের বস্তুতে রূপান্তরিত হয়। রামমোহন এ সত্যটি উপলব্ধি করেছিলেন বলেই সতীদাহ বন্ধ করার পর নারীদের সম্পত্তির অধিকার নিয়ে আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন।

উনিশ শতকের প্রথম থেকেই সামাজিক, অর্থনৈতিক ও বিচারবুদ্ধির বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটছিল। সামাজিক অস্থিরতার মধ্যে একদল মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীব আবির্ভাব ঘটেছে। এই স্বাধীন মুক্ত চিন্তার নাগরিকরা সামাজিক দিক থেকে শাস্ত্রের নামে অহেতুক মিথ্যাচারের বাধা, অর্থনৈতিক দিকে কুলধর্মের বিধিনিষেধ, সামাজিক ও ধর্মীয় চিন্তার পায়ে পরিয়ে দেওয়া কঠিন নিগড় ভাঙ্গাতে চাইল।

ফরাসী বিপ্লবের পর সাহিত্য ও শিল্পে যে রোমান্টিক আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল তার উদ্দেশ্য ছিল নারীর সামাজিক সমতা ও অধিকারের কথা। এই আন্দোলনের অন্যতমা নেত্রী জর্জ স্যাণ্ড ব্যক্তিজীবনে ছিলেন স্বৈরিনী। বিবাহ, দাম্পত্যজীবনের

পবিত্রতা প্রভৃতি শব্দগুলি তাঁদের অভিধানে পরিত্যক্ত ছিল। অবাধ যৌন মিলনকেই বন্ধনমুক্তি ও অধিকার লাভের একমাত্র পথ বলে মনে করতেন। এক অসুস্থ পরিবেশ থেকে মুক্তি পেতে চেয়ে আর এক অসুস্থ পরিবেশের মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন। ইউরোপে নারীমুক্তি আন্দোলনকে সঠিক পথ নির্দেশনা দিলেন মেরী উলস্‌টোনক্রাফট্‌। তাঁর যুগান্তকারী গ্রন্থ "A vindication of the Rights of women" (1792) গ্রন্থে নারীদের বিরুদ্ধে সামাজিক বিধি বিধানের বিরুদ্ধে সোচ্চার হলেন। সম-কালে টমাস পেনের "The rights of man" (1791) গ্রন্থটিও প্রকাশিত হয়। গ্রন্থদুটি অভ্যস্ত জীবনযাত্রায় গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করলো। উলস্‌টেনের গ্রন্থটি নারীমুক্তি কামীদের কাছে বাইবেলের মত মর্যাদা পেত।

আমরা যে পত্রগুলির কথা উল্লেখ করেছি সেগুলি নারীমুক্তি আন্দোলনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। অনেকেই অবশ্য পত্রগুলি সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। আমাদের আলোচনাব ধারাই প্রমাণ করবে এগুলি মৌলিক রচনা। ইতিপূর্বে নারীর মৌলিক রচনা প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। কিন্তু এ কথা মানতেই হবে ১৮২৮-৩৭ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত নারীদের পত্রগুলিতে নারীরা যে বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন, পরবর্তীকালে নারীমুক্তি আন্দোলনের কর্মকর্তাদের কাছে তা ভবিষ্যতের কর্মসূচী হয়ে রইলো। ১৮২৮ সাল আব ১৮৪৯ সাল এক কথা নয়। উনিশ শতকের নারীমুক্তি আন্দোলনের প্রধান ফল পারিবারিক জীবনের গুরুত্ববৃদ্ধি। এতদিনের প্রচলিত পারিবারিক ঐতিহ্যের থেকে ব্যক্তিজীবন পরিবারমুখী হল। সতীদাহ বন্ধ হয়ে গেছে, বহুবিবাহ শিক্ষিত সমাজে প্রায় নিন্দিত, নারীদের শিক্ষার কথা সবাই ভাবছেন, কৌলীন্য প্রথা সমাজে ঘৃণিত, বিধবাবিবাহের সব আয়োজন প্রায় শেষ। সমাজমুখীন পরিবার থেকে পরিবারমুখীন সমাজের জন্ম হল। সমাচার দর্পণের পাতায় নারীরা যে সব সামাজিক প্রথাকে বন্ধ করতে চাইলেন, যে সব নতুন সুযোগ সুবিধার জন্য আবেদন নিবেদন করতে লাগলেন তা বহুপূর্বেই পুরুষদের দ্বারা সূচিত ও আলোচিত হয়েছিল। নারীরা যেন পুরুষদের আন্দোলনের সমর্থনে গণস্বাক্ষর দিলেন।

আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং ফরাসী বিপ্লবের ঢেউ ভারতের জীবনকেও স্পর্শ করেছিল। হিন্দু কলেজের অধ্যাপকদের অনেকেই ফরাসী বিপ্লবের ভাবধারা দ্বারা পুষ্ট ছিলেন। তাঁদের ছাত্র "বঙ্গীয় যুবকগণ' "সর্বপ্রকার কুসংস্কার, উপধর্ম ও প্রাচীন প্রথা ভগ্ন করিবার প্রবৃত্তি তাঁহাদের মধ্যে প্রবল হইয়া উঠিল। ভাঙ্গ-ভাঙ্গ-ভাঙ্গ এই তাহাদের মনের ভাব হইয়া দাঁড়াইল।"[১০৩] এই ভাঙ্গনের কাজ ভেতরে বাইরে চলতে লাগলো। এই ভাঙ্গনের মধ্যে ইউরোপের মত ভারতেও জন্ম নিল, "Domesticity in the

modern sense started to emerge"[১৪০] নারীর কাছে পুরুষের চাওয়ার গুণগত পার্থক্য ঘটে গেল। "এইক্ষণকার লোক ও শিশুগণ বিদ্যাধ্যয়ন করিতেছেন। তাঁহারা অবশ্যই উচ্চ ও উত্তম কার্যে রত হইবেন।······অবস্থার পরিবর্তন হইলে কি মূর্খ স্ত্রীদের সঙ্গে তাঁহাদের সম্প্রীতি হইবেক। দিবসীয় মানসিক ও শারীরিক পরিশ্রমের পর পুরুষের সে সান্ত্বনা ও সাহায্যের আবশ্যকতা তাহা কি তিনি ঐ অজ্ঞান স্ত্রীর নিকটে পাইতে পারিবেন।[১০৫] নারীর উপর এই নির্ভরশীলতা এ যুগের পূর্বে সৃষ্ট হওয়া সম্ভব ছিল না।

ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখতে পাবো নারী পুরুষের উত্থান-পতন একই সঙ্গে ঘটে। উলস্টেনক্রাফট তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন, "The two sexes mutually corrupt and improve each-other."[১০৬] কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায়ের বক্তব্য ছিল—"···a nation could never rise high in the scale of civilization, while illiterate mothers and wives obstructed its growth by perpetuating the moral degradation of the rising and the present generation."[১০৭] বিশ্বজুড়ে নারীরা সহৃদয় সামাজিকের নিকট প্রার্থনা জানালেন, "would men but generously snap our chains and be content with a rational fellowship instead of slavish obedience, they would find us more observant daughters, more affectionate sisters, more faithful wives, more reasonable mothers in a word, better citizen."[১০৮]

বাংলার দুর্বলা কুলবালারা ক্ষোভের সঙ্গে বললেন—"সম্পাদক মহাশয় এক ঔরসে ও এক গর্ভে জন্মিয়া আমরা এক ক্লেশের ভাগি কেন হইলাম রাজা কি আমাদিগের পক্ষে এমত নিদারুণ হইয়াছে।"···[১০৯] বস্তুবাদী জীবনাদর্শন, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের জন্ম দিল। সমাজ ও পরিবারের সংজ্ঞা পরিবর্তিত হচ্ছে। মধ্যযুগের পরিবার ছিল, "The family existed chiefly to maintain the continuity of name and property."[১১০] কিন্তু সমাজবিদ্‌রা আধুনিক পরিবারের বৈশিষ্ট্য এবং পরিবারে নারীর স্থান সম্বন্ধে আলোচনায় ফরাসী বিপ্লব, আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং যান্ত্রিক শিল্পের প্রভাবের কথা বললেন। "The family concentrated itself and turned inward, privacy became important······women acquired a great many new duties and responsibilities."[১১১]

ভারতের নারীদের ক্ষেত্রেও রূপান্তর দেখা দিচ্ছিল। পরিবারের চেহারাও পালটে

যাচ্ছে। বাংলার নারী আর্দ্র কণ্ঠে প্রিয় পিতা ভ্রাতা ও বোদ্ধা সামাজিকদের নিকট আবেদন জানিয়েছেন—'হে প্রিয় পিতঃ ভ্রাতাগণ বিচার করিয়া কহুন দেখি যে আমাদিগকে আপনারা কিরূপ দুঃখিনী ও গোলামের ন্যায় অপমানিতা দেখিতেছেন।'[১১২] নারী জীবনের এই অশেষ বেদনা ও যন্ত্রণার কথা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে থেমে থাকেনি। অনতিকাল পরেই সংবাদ প্রভাকরে লেখিকাদের আবির্ভাব ঘটে। ঠাকুরাণী দাসী, থাকমণি দাসী, কৃষ্ণকামিনী দাসী, কৈলাসকামিনী দেবী প্রভৃতির রচনা প্রকাশিত হতে থাকে।

পাদটীকা

১। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য—ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ—৬৯।

২। A Rammohan Roy Symposium, Hints on the study of Raja Rammohan Roy—B. N. Sil, P-ii

৩। Translation of the Moonduk Opunishad—Rammohan Roy, 1919 intro.

৪। The concise Encyclopaedia of Western philosophy and Philosophers—Ed. J. O. Urmson, P-60.

৫। Encyclopaedia of Britannica, Vol. 3, P-417.

৬। ঐ ঐ ঐ

৭। Dictionary of philosophy—Dagobert D. Runes, Ph. D. P-37.

৮। The outline of knowledge—James A. Richard, p-6.

৯। The story of mankind, The Renaissance—H. W. Vanloon, P-196.

১০। সহমরণ বিষয় প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তক সম্বাদ—রামমোহন রায়, সাহিত্যপরিষৎ সংস্করণ।

১১। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবন চরিত—নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ—১১১।

১২। রাজা রামমোহন রায় ও তাঁহার মহত্ব—গিরিশ চন্দ্র নাগ (শতবার্ষিকী তর্পন), ১৯৩৩ (ঢাকা) 'সংস্কার ও নারীজাতি'।

১৩। The last days in England of the Raja Rammohan Roy—Mary Carpenter P-101-102.

১৪। ঐ ঐ ঐ

১৫। The story of mankind, The Renaissance—H. W. Vanloon, P-197.

১৬। History of Western philosophy—Bertrand Russel, P-52.

১৭। প্রবর্ত্তক নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ—রামমোহন রায়, পরিষৎ সংস্করণ।

১৮। ঐ ঐ ঐ

১৯। ঐ ঐ ঐ

২০। ঐ ঐ ঐ

২১। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত—নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ—১৩৮।

২২। বাংলার নারী জাগরণ—প্রভাত চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, ১ম সংস্করণ ১৩৫২, পৃঃ—২২।

২৩। ঐ ঐ ঐ পৃঃ—১০।

২৪। ঐ ঐ ঐ ঐ

২৫। রাজা রামমোহন রায় ও তাঁহার মহত্ব—গিরিশ চন্দ্র নাগ, ১ম সং, ঢাকা, ১৯৩৩।

২৬। ঐ ঐ ঐ

২৭। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ—শিবনাথ শাস্ত্রী, পৃঃ—১০৪

২৮। The days of John Company—Selection from Calcutta Gazettee, P-597.

২৯। Swearing by Ganga, Feb., 3, 1820—"During the present sitting of the Supreme Court a native, in giving evidence on a case there in pending, refused to take the oath in the usual manner, viz. on the waters of the Gunga. He declared himself to be one of the followers of Rammohan Roy, and in consequence not a believer in the imagined sanctity of this river. He offered to be sworn by the Vedas, as a believer in this writings, analoguous to the

European method as it respects the Christian Scriptures. We understand that this simple affirmation was taken as practised in England by the society of the Quakers. —Asiatic Journal July, 1820, P-92.

৩০। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনী—নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ—৪৩।

৩১। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ—শিবনাথ শাস্ত্রী পৃঃ—৯১।
নিউএজ পাবলিশার্স।

৩২। Social background of India Nationalism—A. R. Desai, Chap. VII.

৩৩। বাংলা কবিতার নবজন্ম—ডঃ সুরেশ চন্দ্র মৈত্র, পৃঃ—৭১।

৩৪। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ—শিবনাথ শাস্ত্রী, পৃঃ—৮৫।

৩৫। মুক্তির সন্ধানে ভারত—যোগেশ চন্দ্র বাগল, পৃঃ—২৭।

৩৬। Recollection of Alexander Duff—Rev. Lall Behari Day, P-28.

৩৭। "আর তৎকালে উক্ত মহাত্মা ব্যক্তির (ডিরোজিও) সাহায্যে পারথিনান নামক ইংরাজী সমাচার পত্র বাঙালীদিগের দ্বারা প্রথমে প্রকাশিত হয়, ঐ পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় স্ত্রীশিক্ষা এবং ইংরাজদিগের স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্বক ভারতবর্ষে বাস এই দুই বিষয়ের সম্বাদ ছিল এবং হিন্দু ও গভর্ণমেণ্টের বিচার স্থানে খরচের বাহুল্য এতদ্দোষের উপর দোষারোপ হইয়াছিল কিন্তু যদিও হিন্দুধর্মবলম্বি মহাশয়েরা তদ্দর্শন মাত্রে বিস্ময়াপন্ন হইয়া স্ব স্ব ধন ও পরাক্রমানুসারে যথাসাধ্য চেষ্টা করতঃ তাহা রহিত করিয়া ছিলেন ও তাহার দ্বিতীয় সংখ্যা যাহা মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছিল তাহাও গ্রাহকদিগের প্রেরিত হইতে দেন নাই।"

The Bengal Spectator, Calcutta, April 1842, No. Vol. I. P-8.

৩৮। —do— —do— —do —do—

৩৯। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ—শিবনাথ শাস্ত্রী, পৃঃ—১০১-১০২।

৪০। The days of John Company—Selection from Cal. Gazette (1824-1832), P-430

৪১। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত—নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ—১৩১।

৪২। Recollection of Alexander Duff, D. D. LL. D.—Rev. Lall Behari Day, P 27.

৪৩। জ্ঞানান্বেষণ, সংবাদপত্রে সেকালের কথা—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২য় খণ্ড, পৃঃ—৯৬।

৪৪। Selection of Discourses delivered at the meeting of the Society for the Acquistion of Geneial Knowledge.—A speech of the condition of the Hindoo women 1839.

৪৫। ঐ Vol. I, 1840, P-84-97.

৪৬। Asiatic Jouinal, May, 1840, Asiatic Intellegence. P-19.

৪৭। Selection of Discourses Delivered at the Meeting of the Society for the Acquisition of General knowledge—A speech of the condition of the Hindoo women-Vol. I, 1840. P-84-97.

৪৮। সম্বাদ প্রভাকর, ১লা বৈশাখ, ১২৬০, পৃঃ—২৪-২৫।

৪৯। বেঙ্গল হরকরা, ১৮৪৫, ১১ই মার্চ।

৪৯। ক) বিধবা বিবাহ নিষেধ বিষয়ক ব্যবস্থা—ধর্মসভার অনুমত্যানুসারে মুদ্রিত, শকাব্দ—১২৫৩, পৃঃ—২৮।

৫০। জ্ঞানান্বেষণ সংবাদ পত্রে সেকালের কথা—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

৫০। ক) The Bengal Spectator, April & June, 1842, P-10.

৫১। Selection of Discourses, Reforms Civil and Social—K. M. Banerjee, P-199.

৫২। হিন্দু কলেজ : ডিরোজিও : আধুনিকতা—ডঃ সুরেশ চন্দ্র মৈত্র, বিদ্যাসাগর স্মারক গ্রন্থ, পৃঃ—৬০৩।

৫৩। Women's work and Women's culture—J. E. Butler, Intioduction, P-Xiii

৫৪। Bengal Spectator, 1843, January, Vol.-II, No-I, P-7.

৫৫। সংবাদ পত্রে সেকালের কথা—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২য় খণ্ড, পৃঃ—২৬৩।

৫৬। Asiatic Journal, 1835 (September-December) Vol-XViii, P-68

৫৭। Do —do— 1836 (December), Hindoo Liberals, P-223-224

৫৮। সংবাদ পত্রে সেকালের কথা—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮৩১, ১৬ই ফেব্রুয়ারি, সমাচার দর্পন, পৃঃ—২৪২।

৫৯। A prize Essay on Native Female Education—K. M. Banerjee, 1841, P-16.

৬০। Asiatic Journal-Domestic manners of the Hindoos—by A young Native Gentleman, P-96-99.

৬১। Nineteenth century Bengal—Pradip Sinha, P-95.

৬২। Brahmo Year-Book 1881, P-144-146

৬৩। বাংলার সামাজিক ইতিহাস—বিনয় ঘোষ, ৫ম খণ্ড, পৃঃ—১৫৪।

৬৪। Asiatic Research, Vol-IV, 1796, P-209-217.

৬৫। Asiatic Research, Vol-V, 1797-98, P-53-67

৬৬। Asiatic Journal, 1821, Feb., P-144.

৬৭। Asiatic Journal, 1821, P-144.

৬৮। ঐ ঐ ঐ

৬৯। Calcutta Review, 1913-Old Calcutta : Its School masters—K. N. Dhar, P-342 Mrs. Rainy. Historical & Topographical sketches quoted from this book.

৭০। Life of William Carey. George Smith in, LLD, 1913, P-111

৭১। Bethune School Centenary Volume, History of the Bethune School & College—J. C. Bagal, P-3.

৭২। বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা—বিনয় ঘোষ, ১৯৬৮, পৃঃ—১৯১।

৭৩। Women's Education in Eastern India—J. C. Bangal, P-36.

৭৪। ঐ ঐ ঐ P-12

৭৫। Benevolent Institutions—C. L. Lushingtion, P-194-95.

৭৬। Reformer, 19th Dec., 1831.

৭৭। History of Native Female Education—J. Thomas. Baptist Mission Press, 1958. P-3.

৭৮। Fenelon of Female Education—T. F. Dibden B. A., F. A. S., 1820, P-13.

৭৯। Life of Peary Churn Sirkar (A Recast)--M. N. Sirkar, 1914.

৮০। ঐ ঐ

৮১। ঐ ঐ

৮২। Report on Public Instruction, Bengal, 1849-50, P-4-5.

৮৩। Englishman, Wednesday, May 22, 1850.

৮৪। Hindu Intelligencer, May, 14, 1849, P-156.

৮৫। Morning Chronicle, Bethune's Address, 8th Nov. 1850, P-1071

৮৬। ঐ ঐ

৮৭। বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা—বিনয় ঘোষ, ৫ম খণ্ড, পৃঃ—২৭৮।

৮৮। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ—শিবনাথ শাস্ত্রী, পৃঃ—১৬৯।

৮৯। Women's work and Women's culture—J. E. Butler, Introduction, P-XXV.

৯০। Women's Education in India—Y. B. Mathur, P-26.

৯১। Quoted from Education & Social Amelioration of Women in pre-Mutiny India—K. K. Dutta.

৯২। Women's Education in India—Y. B. Mathur, P-25.

৯৩। সংবাদ প্রভাকর (১৮৪৯) সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র—বিনয় ঘোষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ—৩০৯।

৯৪। বঙ্গ সাহিত্যে নারী—ব্রজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ—৪।

৯৫। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (৪র্থ খণ্ড)—ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ—৬১৪-৬১৫।

৯৬। লোক সাহিত্য—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ—৭৯।

৯৭। চরকা কাটনির দরখাস্ত, ১২২৮, ৫ই জানুয়ারী, সমাচার দর্পণ। সংবাদপত্রে সেকালের কথা—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে সংকলিত। পৃঃ—১৭৬।

৯৮। সম্বাদ কৌমুদী, ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৩১। সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড, শ্রীঅমুকী দেবীর পত্রটি, পৃঃ—২৪৬।

৯৯। সমাচার দর্পণ, ১৪ই মার্চ ১৮৩৫, সংবাদ পত্রে সেকালের কথা, পৃঃ—২৫৬-২৫৭ হইতে উদ্ধৃত।

১০০। ঐ ঐ পৃঃ—২৫৭-৫৮।
১০১। ঐ ঐ পৃঃ—২৫৮-৬০।
১০২। ঐ ঐ ঐ
১০৩। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ—শিবনাথ শাস্ত্রী, পৃঃ—৯৫-৯৬।
১০৪। Historical problem: Studies & Documents—Ed. Prof. G. R. Elton, Chap.-I.
১০৫। জ্ঞানান্বেষণ, ৩রা মার্চ, ১৮৩৮। সংবাদপত্রে সেকালের কথা (২য় খণ্ড) পৃঃ—৯৯-১০০ হইতে উদ্ধৃত।
১০৬। Mary Wollstonecraft—A sketch-Prof. H. R. James, 1932, P-69.
১০৭। A prize Essay on Native Female Education—Rev. K M. Banerjee, 1841, P.16.
১০৮। Mary Wollstonecraft—Sketch. Prof. H. R. James, 1932, P 60.
১০৯। সমাচার দর্পণ—১লা জানুয়ারী, ১৮৪০। সংবাদপত্রে সেকালের কথা— পৃঃ—২৬০ হইতে উদ্ধৃত।
১১০। Historical Problem : Studies & Documents—Ed. Prof. G. R. Elton, Chap.-I.
১১১। ঐ ঐ ঐ —do—
১১২। সমাচার দর্পণ, ২১শে মার্চ ১৮৩৫। সংবাদ পত্রে সেকালের কথা (২য় খণ্ড) পৃঃ—২৫৮ হইতে উদ্ধৃত।

॥ তৃতীয় অধ্যায় ॥

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরপরিবার ও নারী জাগৃতি ঃ

দ্বারকানাথ ঠাকুরের সময় থেকেই জোড়াসাকোর ঠাকুর পরিবার একটি স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বহন করে আসছিল। মহর্ষি নিজ পরিবার ও ব্রাহ্মসমাজে প্রতিষ্ঠা করলেন চরিত্রই বল (Character is power)। ব্রাহ্ম আন্দোলনের মৌল অনুজ্ঞা মনুষ্যত্ববোধ, মানবিক অধিকার ও কর্তব্য।[১]

মহর্ষি কন্যা ও পুত্রবধূদের শিক্ষা-দীক্ষা, বেশভূষা, সন্তানপালন এবং মানসিকতা ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন কলকাতায় ঠাকুরবাড়ীর ভাষা, বেশভূষা, এলং চলনবলন ছিল সম্পূর্ণ আলাদা।[২] স্বর্ণকুমারী দেবী ঠাকুর পরিবারের অন্তঃপুর শিক্ষার একটি সুন্দর চিত্র দিয়েছেন—"বৈষ্ণবী আসিতেন অন্তঃপুরের চতুঃসীমাবদ্ধা মহিলাগণের জন্য, বালিকা নববধূ, বিবাহিতা বালিকা কন্যাগণ ইহার কাছেই শিক্ষালাভ করিতেন। কিন্তু বাড়ির অবিবাহিত কন্যাগণ বালকদিগের সহিত একত্র গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় গমন করিত। ইহাতে আর কিছু না হউক বালক-বালিকার শিক্ষার ভিত্তি সমভাবেই গঠিত হইত।"[৩] মাতাঠাকুরানী, মাসিমা, নববধূ, বালিকা সবাই সর্বদা লেখা পড়ায় ব্যস্ত থাকতো। মালিনী বই বিক্রি করতে এলে মেয়ে মহলে সোরগোল পড়ে যেত। রামায়ণ, মহাভারত থেকে বটতলার উপন্যাস, আষাঢে-গল্প সবই অন্দরে ঠাঁই পেত।[৪] সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর বাল্যস্মৃতি চারণায় বলেছেন, কাকিমা এবং বাড়ীর অন্যান্য মহিলাদের কাছেই তাঁদের সাহিত্যের প্রথম পাঠ এবং তাঁরাই ঠাকুরবাড়ীর ছেলেমেয়েদের শিক্ষয়িত্রী ছিলেন।[৫] মহর্ষি নারীদের উচ্চশিক্ষা, বাল্যবিবাহ, নারীদের পরিচ্ছদ সংস্কার বিষয়ে মনোযোগী ছিলেন।[৬] মহিলাদের শিক্ষার জন্য মিস্ গোমিস্ প্রভৃতি খৃষ্টান মহিলারা অন্তঃপুরে প্রবেশাধিকার পেয়েছিল।[৭] মহর্ষি আপন জ্যেষ্ঠা কন্যাকে বেথুন বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দিয়েছিলেন।[৮] পরবর্তী কালে ঠাকুর পরিবারের নারী শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন পণ্ডিত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী। পণ্ডিত পাকড়াশী মহাশয়ের চেষ্টায় ঠাকুর পরিবারের মেয়েরা আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা ও পাঠ্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত হয়। অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল, সংস্কৃত ও বিজ্ঞান পাঠ আরম্ভ হল।[৯] মহর্ষির অঙ্কে বসেই স্বর্ণকুমারী দেবী ভূতত্ত্ববিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যার প্রতি অনুরাগিণী হন।[১০] মহর্ষি কন্যাদের লেখাপড়া বিষয়ে ব্যক্তিগত ভাবে খোঁজখবর নিতেন। কন্যাদের প্রতি তাঁর দুর্বলতা একটু বেশিই ছিল। কন্যারা ফুলতুলে তোড়া

বেঁধে পিতৃদেবকে দিতেন।[১১] সত্যেন্দ্রনাথ স্ত্রী স্বাধীনতার ক্ষেত্রে ছিলেন বিপ্লবী এবং এ বিষয়ে মহর্ষির নীরব সমর্থন ছিল। মেয়েদের চুলবাঁধা, সেমিজ-জামা জুতা ব্যবহার এবং গাড়ীতে চড়ে বেড়াতে যাওয়া প্রভৃতি বিষয়ে মহর্ষির সম্মতি ছিল।[১২] সত্যেন্দ্রনাথ জ্ঞানদানন্দিনীকে নিয়ে গভর্ণর জেনারেলের গৃহে বন্ধু সম্মিলনে উপস্থিত হলে প্রসন্ন ঠাকুর লজ্জায় মুখ ঢাকা দিয়ে সম্মিলন স্থান ত্যাগ করেন।[১৩] জ্ঞানদানন্দিনী-গুর্জ্জর মহিলার পরিচ্ছদকে শোভন ও শালীনতায় বাঙালীর করে নিয়েছিলেন। এ বিষয়েও মহর্ষির প্রসন্ন সম্মতি পেয়েছিলেন।[১৪] মহর্ষি বাড়ীর দালানের উপাসনা সভায় মেয়েদের অংশ গ্রহণ অনুমোদন করেছিলেন। বাড়ীর অন্দরমহলে দাসদাসী ব্যতীত অন্য কারোর প্রবেশাধিকার ছিল না। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী এ সব প্রথা তুলে দিলেন। দর্জি, সেকরা অন্দরে প্রবেশাধিকার পেল। এমনকি ফটোগ্রাফারকে ডাকিয়ে এনে শাশুড়ী ও বাড়ীর অন্যান্যদের ছবি তোলালেন।[১৫] হেমেন্দ্রনাথ দেশাচার কুলাচার ভঙ্গ করে পত্নীকে বাড়ীর গায়ক বিষ্ণুর কাছে গান শেখাতেন।[১৬] মহর্ষি কন্যা ও পুত্রবধূদের শিক্ষায় যেমন উৎসাহী ছিলেন তেমনি সঙ্গীত, শিল্প ও সাজসজ্জা সম্বন্ধেও উৎসাহ দিতেন।[১৭] প্রতিভার পিয়ানো বাজানো এবং রবির গান শুনতে তিনি ভালবাসিতেন।[১৮] ঠাকুর পরিবার ছিল ব্রাহ্ম সংস্কৃতির পীঠস্থান। ঠাকুর পরিবারের পারিবারিক আদর্শই বাংলার শিক্ষিত সমাজের পারিবারিক আদর্শ রূপে গণ্য হবে। ঠাকুর পরিবারের মঞ্চে নারী পুরুষের একত্রে অভিনয় প্রভৃতির মধ্য দিয়ে নারীরা বৃহত্তর সংস্কৃতির প্রবাহকে আশ্রয় করতে সক্ষম হয়েছিল।

এর পাশাপাশি তদানীন্তন বাঙলা দেশের হিন্দু পরিবারের গৃহ, গৃহিণী ও নারীদের চিত্র তুলে ধরলে ঠাকুর বাড়ীর নারীদের প্রগতিশীল ভূমিকাটি বোঝা যাবে। ভারতী লেখিকাগোষ্ঠীর অন্যতমা শরৎকুমারী দেবী চৌধুরানীর লেখা থেকে কিয়দংশ উদ্ধৃত করছি—"ভৃত্যের সম্মুখে আমরা বাহির হইতাম না, ভৃত্যেরা বাড়ীর ভিতর প্রায়ই আসিত না, যখন আসিত সাড়া পাইলেই ঘরে লুকাইতাম। ঘোমটা দিয়া শ্বশুর ভাসুর প্রভৃতির সম্মুখে কখনো কখনো যাইয়া জল দিয়া আসিতে হইত, কিন্তু ভৃত্যদের কিছু দিতে হইলে দাসী দ্বারা বা ছোট মেয়ের দ্বারা দিতাম। ভৃত্যেরা একতলার ভিতর বাড়ীতে আনাগোনা করিত দোতলায় কদাচিৎ যাইত। আমরা সকলে আসিয়া একতলার ভাঁড়ারে ঢুকিতাম—রান্না ও ভাঁড়ার ঘর পাশাপাশি সুতরাং আমাদের গণ্ডী রান্না ও ভাঁড়ার ঘরের মধ্যে। তার বাহির হইতে হইলে দাসী হাঁকিত, "সরে যাও বৌ ঠাকরুণ যাচ্ছেন।"...[১৯] ভৃত্যেরা যেমন বাড়ীর মহিলাদের সামনে যেতে পারতো না তেমনি দাসীদেরও বাড়ীর পুরুষদের সামনে

বের হওয়া বা কথা বলা একেবারে নিষিদ্ধ ছিল। প্রতিবেশী দেখলে পাড়া শুদ্ধ ছি ছি পড়ে যেত।[২০] একবার মহর্ষির পিসতুত ভাই কন্যা ও বধূদের খোলা ছাদে বেড়ান নিয়ে অভিযোগ করেন। মহর্ষি তাকে বলেছিলেন—"কালের পরিবর্তন হইয়াছে। নবাবের আমলে যে নিয়ম খটিত এখন আর সে নিয়ম খাটিবে না।"[২১] শরৎকুমারী চৌধুরানী জমিদার গৃহিণী, কবি অক্ষয় চৌধুরীর স্ত্রী। ঠাকুরবাড়ী ও চৌধুরী পরিবারের অন্দরমহলের চিত্র দুটি পাশাপাশি রাখলেই ঠাকুর পরিবারের স্বাতন্ত্র্য ও বাংলাদেশে তার প্রগতিশীল ভূমিকা বোঝা যাবে।

বিদ্যাসাগর ও নারী শিক্ষা

"বিদ্যাসাগর চিন্তা করিলেন, বিদ্যাসাগর উপায় উদ্ভাবন করিলেন, বিদ্যাসাগর কার্য অনুষ্ঠান করিলেন, বিদ্যাসাগর কার্য সম্পন্ন করিলেন।"[২২] উদ্ধৃতিটির মধ্যে সিজারের একটি উক্তির প্রতিধ্বনি শোনা যাবে। নারীমুক্তি আন্দোলনের পটভূমিকায় বিদ্যাসাগরের আবির্ভাবের গুরুত্ব ও তাঁর ব্যক্তিত্ব বোঝাতে উক্তিটি যথার্থ হয়েছে। বিদ্যাসাগর কর্মী। বাক্যের বদ্ধ জলায় তিনি আটকে থাকতে পারতেন না। কর্মের মধ্যে স্বপ্নকে মুক্তি দিতেন। ১৮৫৭-৫৮ মাত্র এক বৎসরে বর্ধমান, হুগলী ও মেদিনীপুরে ৩৫টি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। সিপাহী বিদ্রোহের ধাক্কা ইংরাজকে সচেতন করে তুলেছে। নারীশিক্ষা ও সমাজসংস্কারে ইংরাজের পদক্ষেপ সতর্ক ও ধীর। ১৮৫৫ খৃঃ পূর্ববঙ্গের বিদ্যালয় পরিদর্শক মিঃ উডরো মন্তব্য করলেন—"as the girls for statistical purposes may be omitted in an Education census of Bengal".

অথচ সেই বছরেই মরনিং ক্রনিকেল পত্রিকায় লেখা হল, "...A school for the public instruction of Native Female children of respectable parents, is likely to succeed as much in this country as in England".[২৪] নারীশিক্ষার ব্যাপারে বাংলার শিক্ষিত জনসমাজ যথেষ্ট সচেতন।

বেথুন স্কুল সারা বাংলায় আদর্শ বালিকা বিদ্যালয়ে পরিণত হচ্ছে। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা আসছে—"The 'bhadralok' (the respectable), not the dhanilok (the rich), send their children to the Bethune School."[২৫]

এই ভদ্রলোকেরা নিজ নিজ গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপনকে গর্ব ও মর্যাদার বিষয় বলে মনে করতেন। এর জন্য যথেষ্ট বিত্ত ব্যয় করতেন। এদের সহযোগিতায় বিদ্যাসাগর

হুগলীতেই ৪০টি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ছাত্রী সংখ্যা ১৩৭০। বিদ্যাসাগরের এ প্রয়াস সরকারী সমর্থন পায়নি। তিনি শিক্ষা বিভাগের রিপোর্টে লিখেছেন— "I am confident that I would have been able to establish similar schools in almost every village in the District under me, except perhaps the District of Nuddea. Thus a change may be said to have come over the spirit of the times, and this may be reckoned as a new era in the history of Education in Bengal".[২৬]

সরকার বিদ্যালয়গুলির সাহায্য মঞ্জুর না করায় বিদ্যাসাগরকে যথেষ্ট বিপদে পড়তে হয়েছিল। বেথুন বিদ্যালয়ের সমসাময়িক দুটি উল্লেখযোগ্য বিদ্যালয়ের নাম পাওয়া যায়। একটি ছিল ঢাকার বাংলা বাজারে অপরটি ছিল নদীয়ার কুমারখালিতে। কুমারখালির মথুরানাথ কুণ্ডু নিজ কন্যা ও পরিবারের কন্যাদের বিদ্যালয়ে পাঠাতেন। তাঁর চেষ্টায় বহু ছাত্রী বিবাহের পরও বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করতো।[২৭]

১৮৬৩-৬৫ সালের ডি. পি. আই রিপোর্টে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ কন্যাদের শিক্ষায় উৎসাহের কথা জানা যায়। ১৮৬৩-৬৪ সালে ১৭৪ জন ছাত্রী বৃত্তি পায়। এদের মধ্যে ব্রাহ্মণ ৯১, কায়স্থ ৫০, নবশাক ২৪ এবং বৈদ্য ৯, খৃষ্টান ও মুসলমান কন্যাদের কোন উল্লেখ নেই।[২৮] উত্তরপাড়ার হিতকারী সভা নারীশিক্ষায় উৎসাহ দেবার জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করেছিল। হিতকারী সভার মুখপত্রে একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে ডি. পি. আই রিপোর্টে মন্তব্য করা হল, "It is very remarkable that young Brahmani has received from parents the name of Miss Rose Devi. Such a case never before came to my notice".[২৯]

অর্থাৎ ইংরাজীয়ানা এবং ইংরাজী আচার আচরণ মেয়েদের জীবনে কামনা করা হচ্ছে। বালিকাদের জন্য রচিত পাঠ্য পুস্তক সুশীলার উপাখ্যান-এর চাহিদা ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইংরাজী শিক্ষিত যুবকরা গৃহে বধূ, ভগ্নী ও কন্যাদের শিক্ষা দিচ্ছেন।[৩০] নারী শিক্ষার প্রসারের প্রধান অন্তরায় শিক্ষয়িত্রীর অভাব। বিদ্যালয় পরিদর্শকরা বেথুন বিদ্যালয় স্থাপনের পর থেকেই বারবার তাঁদের রিপোর্টে বিষয়টি উল্লেখ করছেন। হাওড়ার ডেপুটী ইন্‌স্পেকটর মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত প্রস্তাব করলেন জেনানা শিক্ষার প্রসার ঘটলে বিধবারা উৎসাহী হলে শিক্ষয়িত্রীর অভাব দূর হবে।..."the educated relations may be regarded teaching as honourable profession as cooking."[৩১]

পরগৃহে দাসীবৃত্তির চাইতে শিক্ষার কর্মকে সকলেই সম্মানের বৃত্তি বলে মনে করবে।

সব দেশেই নারীরা প্রথমে শিক্ষিকা রূপে স্বাধীন জীবিকায় প্রবেশ করেছিল। "Teaching is the first profession to admit women……women rapidly into a profession, highly praised poorly paid."[৩২]

ঢাকায় নর্মাল স্কুল খোলা হল। ১৮৬৩ ৬৪ সালে ঢাকা নর্মাল স্কুলে ছাত্রী সংখ্যা ১৬। তার মধ্যে ১১ জনই জাত-বৈরাগিনী। জাত বৈরাগিণীদের নৈতিক মান খুব উন্নত ছিল না। উচ্চবর্ণের রমণীরা নর্মাল স্কুলে না আসায় খৃষ্টান মহিলারা ভীড় করতে লাগলো। ১৮৬৭-৬৮ সালে পূর্ববঙ্গের ছয়টি নারী শিক্ষাকেন্দ্রে নর্মাল স্কুলের ছয়জন শিক্ষয়িত্রীকে নিযুক্ত হতে দেখা যায়। এদের বেতন দশ থেকে পঁচিশ পর্যন্ত ছিল। তখন একজন পণ্ডিতের বেতন ছিল দশ। [৩৩]

নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে বামাবন্ধু সভা (১৮৫২), বামাবোধিনী সভা (১৮৬৩-৬৪), বামাবোধিনী পত্রিকা, বরিশাল মহিলা উন্নয়ন সমিতি (১৮৭১) প্রভৃতির অবদান উল্লেখ-যোগ্য। এতদিন গৃহসংস্কার ও সন্তানের শিক্ষা ও পালনের জন্য নারী শিক্ষার প্রয়োজন বোধ হচ্ছিল। এবার নারী শিক্ষাকে ভবিষ্যতের মঙ্গল ও জাতীয় কল্যাণের সঙ্গে যুক্ত করা হল। "On her education depends our happiness at homes, the good of our children, and the future welfare and glory of our country."[৩৪]

বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, কৌলীন্য ও বৈধব্য সমাজ জীবনকে যে কতখানি ক্লেদাক্ত করে তুলেছিল তার করুণ চিত্র সে সময়কার সাময়িক পত্রের পাতায় ছড়িয়ে আছে। এ সব চিত্র পুরুষ কথিত নয়, নারীর নিজ জীবনের সমাজ অভিজ্ঞতার প্রকাশ। ষোড়শ বর্ষীয়া কুলীন কন্যা তার বহু বাঞ্ছিত স্বামীকে প্রথম দেখে মন্তব্য করে—" কোন দিবস অপরাহ্নে পঞ্চাশৎবর্ষ বয়স্ক একজন মনুষ্য আমাদিগের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন এবং পরিচয় গ্রহণ দ্বারা জানা গেল মাত্র অন্তঃকরণ কম্পিত হইল। লজ্জা, ঘৃণা, ক্ষোভ, ক্রোধ, সংশয় প্রভৃতি ভাবের এ প্রকার আন্দোলন হইয়াছিল যে, আমি আর লোক সমাজে মিশ্রিত হইবার অভিলাষ একেবারে ত্যাগ করিয়াছিলাম তাহার কুৎসিত আকৃতি, গলিত অঙ্গ এবং পক্বকেশাদি দর্শন করিয়া আমি হতবুদ্ধি হইয়াছিলাম। আমি জ্ঞানতঃ তাহাকে. বরণ করি নাই, কদাপি তাঁহার সহিত জ্ঞানাবস্থায় সাক্ষাৎ নাই, তাহার সহিত আমার মনের ঐক্য বা প্রণয়ের সঞ্চার হয় নাই। অথচ, তিনি আমার পতি আমার সুখের মূলাধার, কি আশ্চর্য্য, তাঁহার মূর্তি যেমন কুৎসিত রজনীতে তাঁহার ব্যবহারও তদ্রূপ প্রত্যক্ষ হইল।" অবশেষে এই কুলীন কন্যা ব্যভিচারের পিচ্ছিল পথে নেমে এসে 'মেছোবাজার বাসিনী' হয়েছেন। [৩৫] সম্বাদ-ভাস্করে এক পত্রে বিদ্যাদেবী নাম্নী বাল-

বিধবা যে যন্ত্রনার চিত্র দিয়ে, যে বাসনা প্রকাশ করেছেন তা কি বিধবাবিবাহের পক্ষে মত পোষণ নয়?[৩৬] অন্তঃসত্ত্বা বাল্ বিধবার বিষ খেয়ে আত্মহত্যার বহু খবর ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া ও মরণিং ক্রনিকেলেও ছাপা হত।[৩৭]

১৮৫৩ সালে হিন্দু প্যাট্রিয়েটে মন্তব্য করা হল, আমাদের দেশের নারীদের শিক্ষায় অধিকতর সুযোগ দেওয়া হলে তাবা বিধবাবিবাহ প্রভৃতি সমাজ সংস্কার বিষয়ে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারবে। দুবৎসর পরে ১৮৫৫ সালে মরণিং ক্রনিকেল পত্রিকায় রসরাজের একটি সংবাদ উদ্ধৃত করা হয়—

Meeting of the Hindoo widows :—

"The Rasoraja publishes a letter from the female Secretary of the Hindoo widow Association, from the persual of which we learn that about fourteen or fifteen of the widows and married ladies of the respectable Hindu families such as Ghoses, Boses, Mitras, Duttas, Chatterjees, Mookherjee, held a meeting on the mornig of the last solar eclipse day in an empty house rented for the purpose, the subject discussed was, whether the propositi'n of Iswar Chandra Bidyasagar is justly based on the tenets of the Shastras, and whether the introduction of the marriage is calculated to remove one of the crying evils of India—abortion, and all of them were unanimous in favour of the marriage. The female secretary invites candidates to address her, stating their age, caste and respectability through the medium of the Rasoraj".[৩৮]

এই সভা হয়েছিল ২৮শে মে, ১৮৫৫। ৩১ শে আগষ্ট মরণিং ক্রনিকেল-এ এই সভার বিস্তৃত বিবরণ ছাপা হয়।

Meeting of the Hindoo widows :—

On Friday last, the 24th instant, a meetiug of Hindoo widows who held at the residence of Debi Bimolah Money Dassee. Several respectable women were present on the occassion. Lokhimoni Dossee informed the assembly of the business of the night, after making some preliminary observation. She said, 'every ore preents is fully aware of the importance of restituting the custom

of widow marriage, the absence of which has entailed endless misery on the fair portion of the natives. Corruption has spread far and wide, and the honour of women is lost".[৩৯]

ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়ার[৪০] সম্পাদক ঘটনাটিকে অতর্কিতে বোমা ফাটান এবং দেশীয় পত্রিকা থেকে সংগৃহীত বলে মন্তব্য করলেন। এই মন্তব্যের প্রতিবাদ করে মর্ণিং ক্রনিকেলে লেখা হল—"we deny it, as we had the report direct from one of our numerous correspondents who manged to steal into a corner of the house in which the meeting was held quite unknown to the assembly We have not the least doubt as to the fact of the meeting of the respectable class of the Hindoo females are now quite eager for the legislation of an act for the marriage of Hindoo widows and are daily offering their benedictions to Iswar Chandra Bidyasagar for taking the lead on their behalf".[৪১]

দেশীয় পত্রিকা রসরাজ থেকে সংবাদটি উদ্ধৃত হয়েছে বলেই হয়তো ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার আপত্তি। শিবনাথ শাস্ত্রী বলেছেন বিধবা বিষয়ক প্রস্তাব দেশে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল। শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন বিধবা বিবাহ করায় সারা দেশে অভূতপূর্ব উত্তেজনা দেখা দিয়েছিল। ঘটনাটি ১৮৫৬ সালের। 'পথে ঘাটে, হাটে বাজারে মহিলাগোষ্ঠীতে এই কথা চলিল।'[৪২] উত্তেজনা পুরুষ অপেক্ষা রমণী সমাজে অধিক হওয়াই স্বাভাবিক। ১৮২৯-এ সতীদাহ বন্ধ হওয়ার ২৭ বৎসর পর ১৮৫৬তে বিধবা বিবাহ আইন পাশ হয়। প্রথম আইনটি পাশ হবার সময় রমণী সমাজের প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি। দ্বিতীয় আইনটি পাশ করানোর জন্য নারীরাও পুরুষের পাশে এসে দাঁড়াতে কুণ্ঠা বোধ করেনি।

"১৮৬০ সাল হইতে ১৮৭০ সালের মধ্যে তাহা আরও ঘনীভূত আকারে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছিল।"[৪২] ১৮৬১-তে কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে যোগ দেন। কেশব চন্দ্রের প্রচার নারীমুক্তি আন্দোলনেও গতি সঞ্চার করেছিল। মহর্ষি আপন কন্যাকে ব্রাহ্মমতে বিবাহ দেন। ব্রাহ্মদের ঘরে অন্তঃপুর শিক্ষার আয়োজন হয়। বামাবোধিনী সভা ও বামাবোধিনী পত্রিকা নারী কল্যাণমূলক নানা কাজে সহায়তা করে। ব্রাহ্মিকা সমাজের প্রতিষ্ঠা (১৮৬৪), অসবর্ণ বিবাহ, স্ত্রীদের সজ্জিত হয়ে প্রকাশ্য স্থানে চলাফেরা প্রভৃতি বিষয়ে নারীরা যথেষ্ট উৎসাহ বোধ করেছিল। ১৮৬৬-তে সোমপ্রকাশের

আবির্ভাব ১৮৭১ সালে ব্রাহ্ম বিবাহ বিধি প্রণয়নের প্রস্তুতির মধ্য দিয়ে নারীমুক্তি আন্দোলনের গতিবেগ বৃদ্ধি পায়। এর পরের দশ বৎসর হিন্দু ধর্মের পুনরুভ্যুত্থানের কাল।

কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্ম আন্দোলনকে সারা ভারতে ছড়িয়ে দিলেন। নারীমুক্তি আন্দোলনও সারা ভাবতে ছড়িয়ে পড়লো। তরুণ ব্রাহ্মদের সামনে দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন—"Duty, sacred and solemn duty, is ours. Firmness of purpose, steadiness of resolution, consistency of Character,—these constitute a genuine Brahmo. ··How to convert beliefs into practices—word into actions, is uppermost in its thoughts".[৪৩]

ব্রাহ্মসমাজ একদল চরিত্রবান, আদর্শবাদী ও কর্মনিষ্ঠ যোদ্ধাকে পেয়েছিল। ঢাকার নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়, সারদাকান্ত হালদার প্রভৃতি যুবকেরা বিধবাবিবাহ, কুলীন কন্যাদের উদ্ধার করে পুনরায় বিবাহ দেওয়া প্রভৃতি কাজ করতে যেয়ে বহুবার জীবন হানির সম্ভাবনাকেও তুচ্ছ করেছেন। বরিশালের দুর্গামোহন দাস নিজ বাল্-বিধবা বিমাতাকে বিবাহ দিয়ে সামাজিক নির্যাতন ভোগ করেছেন। ১৮৬২-তে কেশব সেন 'সঙ্গত সভা' স্থাপন করেন। এক বৎসর পব ভাগলপুরে ব্রাহ্ম মহিলাবা ব্রাহ্মিকা সমাজের প্রতিষ্ঠা করেন।[৪৪] ঢাকার পার্বতীচবণ দাশগুপ্ত অসবর্ণা ও বিধবা বৈষ্ণব কন্যা কামিনীকে বিবাহ করেন। ১৮৬৬-তে প্রসন্নকুমার সেন শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী মৈত্র নাম্নী কন্যাকে ব্রাহ্ম মতে বিবাহ করেন। রক্ষণশীল ব্রাহ্মবা এ বিবাহ সিদ্ধ কিনা জানার জন্য এ্যাডভোকেট জেনারেলের মতামত প্রার্থনা করেন। এ্যাডভোকেট জেনারেল এ বিবাহ সিদ্ধ বলে মত জানালেন। কেশব চন্দ্র অসবর্ণ বিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন। আন্দোলনের ফলে 'বিশেষ বিবাহ বিল' অর্থাৎ ব্রাহ্ম বিবাহ আইন পাশ হল। মেয়েদের বিবাহে· বয়স স্থির হল ১৪ বৎসর এবং পুরুষের বিবাহের বয়স ১৮ বৎসর। এই বিলে বিবাহ বিচ্ছেদেরও ব্যবস্থা রইলো।

কেশব চন্দ্র বিলাত যাত্রা করলে 'অবলাবান্ধব' সম্পাদক দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও বরাহনগরের শশীপদ বন্দোপাধ্যায় ব্রাহ্মদের নেতা রূপে গণ্য হতেন। শশীপদর কর্ম-জীবন বহুমুখী। তিনি চল্লিশটি বিধবার বিবাহ দেন। এর জন্য জীবনে নানা প্রকার নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছিল। যে সব বিধবারা দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে চাইতো না তাঁদের জন্য বিধবাশ্রম গড়ে তুলেছিলেন।

সমাজের সবচেয়ে বড় ব্যাধি কুলীন কন্যা ও বাল্-বিধবা। এরা পতিতালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করে চলেছিল। ১৮৫৩ খ্রীঃ কলকাতার চিপ্ ম্যাজিষ্ট্রেটের বিবরণীতে জানা যায়

কলকাতার মোট জনসংখ্যা ৪১৬,০০০। তার মধ্যে ১২,৪১৯ জন মহিলা সমাজে কুখ্যাত। এদের মধ্যে ১০,০০০ হিন্দু কুলীন কন্যা। ১৮৬৭ সালে কলকাতার পৌরসভার স্বাস্থ্য অধিকর্তা ১৬ই সেপ্টেম্বর এক রিপোর্টে লেখেন—"··there are upwards of thirty thousand women in the town of Calcutta, who for the maintenance and support, are entrirely dependent on prostitution. He divides these women into Seven Classes, the first category being composed of Hindu women of High Caste who live a retired life, and who are kept or supported by rich natives, or who receive a select number of visitors".[৩৫]

জঠরাগ্নি ও যৌবনজ্বালায় সমাজের নারীদের একটা বৃহৎ অংশ পুড়ে ছারখার হয়েছে। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না থাকলে, পারিবারিক জীবন সুস্থ না হলে, অনাবিল ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্ভব নয়। আধুনিক সভ্যতা বিত্ত সম্পদ কেন্দ্রিক। জন ষ্টুয়ার্ট মিল তাঁর 'সাবজেকশন অব ওমেন' গ্রন্থে এ কথাই বোঝাতে চাইলেন।

আমাদের দেশের ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রেণীর মদ্যমান ও পতিতালয়ে গমন রেওয়াজও মর্যাদার ব্যাপার হয়ে পড়েছিল। কলকাতার চারপাশ ছেয়েছিল বাগান-বাড়ী। রাতের অন্ধকারের বুকে কেঁপে উঠতো বাইজীদের গান ও নাচে এবং মাতালের মাতলামিতে। শ্রীমধুসূদনের 'একেই বলে সভ্যতা' প্রহসনে কলকাতার এই যথার্থ চিত্রটি তুলে ধরা হয়েছে। ব্রাহ্ম ও কিছু আদর্শবাদী পুরুষের চেষ্টায় কুলীনকন্যাদের পুনঃবিবাহ এবং বাল্য বিবাহ রোধ এবং মধ্যপানের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে উঠলো। সারদাকান্ত এবং বরদাকান্ত হালদার নবকান্ত ও শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়, পার্বতীচরণ দাসগুপ্ত, গুরুচরণ দাস, গুরুচরণ মহলানবিশ, নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি পূর্ববঙ্গের তরুণেরা দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের পাশে এসে দাঁড়াল। নারীমুক্তি আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে এবং এদের প্রভাবাধীনে চলে আসে। পরিবারে নারীর গুরুত্ব না বাড়লে এসব পাপ দূর হবে না। "Woman's presence will impart to social conversation a tone of purity and liveliness which will drive away ennui more effectually than the brandy-bottle and add to the moral, economical and Hygenic sanctions against drunkenness the far more powerfull sanction of watchful bright eyes".[৩৬]

মন মন বস্তাপচা বুলি ও পুস্তিকা দিয়ে এ জাতীয় সামাজিক সংকটের মোকাবিলা করা যায় না। সুতরাং এ সব বিষয় নিয়ে যে সব সাহিত্য রচিত হচ্ছিল তার

কোন সামাজিক গুরুত্ব ছিল না। নারী শিক্ষার প্রসারই এই সংকট সমাধানের একমাত্র পথ।

উনিশ শতকের বুদ্ধিবৃত্তি, উদ্ভাবন শক্তি এবং আধ্যাত্মিক কার্যকলাপ পরিচালিত হচ্ছে সমাজ রূপান্তরের কাজে। শিক্ষিতশ্রেণী উপলব্ধি করছে সামাজিক, এবং পারিজীবনে তারা একটা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে চলেছে। এই রূপান্তরের গতিতে, তাদেরও নৈতিক দায়িত্ববোধ যাচ্ছে পাল্টে। ক্রমশ বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, কৌলীন্য প্রথা, পণপ্রথা, মদ্যপান, পতিতালয়ে গমন প্রভৃতি অসামাজিক ক্রিয়া বলে গণ্য হচ্ছে।

১৮৫৯ খৃঃ লালবিহারী দে 'চন্দ্রমুখীর উপাখ্যানে' লিখলেন, "বড়ই আহ্লাদের বিষয় যে এইক্ষণে গ্রামে পল্লীতে পল্লীতে কোন কোন কন্যা স্বদেশীয় ভাষায় পুস্তকাদি পাঠ করিতে পারেন।"[৪৭] এখন নারীরা শুধু পড়তেই পারে না, সাময়িক পত্রে এবং পুস্তক আকারে তাদের রচনা আত্মপ্রকাশ করছে। বেথুনের ভিকটোরিয়া বাঙ্গালা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পূর্বেই ১২৫৬ সালের ১০ই বৈশাখ গুপ্তকবির সংবাদ প্রভাকরে নবমবর্ষীয়া হিন্দু বালিকার 'দৈবশক্তি' নামক কবিতাটি প্রকাশিত হয়। কবিতাটির কাব্য মূল্যের কথা এখানে তুলছিনা, বালিকার রমণীয় অভীপ্সার কথাই উদ্ধৃত করছি—

লেখাপড়া শেখে যেই প্রফুল্ল হৃদয়।
না শিখিলে লেখাপড়া অন্ধ হয়ে রয়॥
বিদ্যা না শিখিলে বামা পশুর সমান।
অবলা বলিয়া লোক নাহি রাখে মান॥
মেয়ে বিনে পুরুষেতো না হয় কথন্।
তবে কেন মেয়েদের না করে যতন॥
মেয়ে বলে পুরুষেতে করয়ে হেলন্।
ভিতরে গুণ তার না করে গ্রহণ॥

এ সব অভিযোগ পূর্বেই পত্রাকারে সমাচার চন্দ্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এবার পয়ারের কাব্যিক পোষাক পরে বক্রোক্তি শ্লেষকে আশ্রয় করে আত্মপ্রকাশ করলো। গুপ্তকবি নারীশিক্ষা সমর্থন করেই ক্ষান্ত হলেন না, সোচ্চারে বললেন, "হে শুভাদৃষ্টি, তুমি শীঘ্র আগমন কর, শীঘ্র আগমন কর, হে কুসংস্কার, তুমি আর এ দেশে অবস্থান করিও না, ত্বরায় প্রস্থান করো, দেশীয় পুরুষ সকল স্ত্রীজাতির দুরবস্থা দূর করিতে যত্নবান হউন"।[৪৮] ১৮৫৬ সালে কৃষ্ণকামিনী দাসীর 'চিত্ত বিলাসিনী' প্রকাশিত হওয়ায় সংবাদ প্রভাকরে গুপ্তকবি বহু প্রত্যাশিত ফললাভের অকপট আনন্দের কথা জানালেন। "অঙ্গনাগণের

বিদ্যানুশীলন বিষয়ে যে সুপ্রণালী এ দেশে প্রচলিত হইতেছে, তাহার স্বরূপ-এ গ্রন্থ'' ।[৪৯]

সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক কেবলমাত্র নবীন কবি ও লেখকদেরই তাঁর পত্রিকায় রচনা প্রকাশের সুযোগ করে দেননি, তাঁর পত্রিকায় অঙ্গনাদের সাহিত্য চর্চারও সুযোগ করে দিয়েছিলেন। "আমরা প্রথমোক্ত পুরুষ পুঞ্জের প্রবন্ধ সকল যে প্রকার প্রযত্নপূর্বক গ্রহণ করিয়া সানন্দে প্রকটন করি, শেষোক্ত স্ত্রীজাতি প্রণীত গদ্যপদ্যময়ী রচনাগুলীন তদপেক্ষা অধিক উৎসাহে গ্রহণ করিয়া বরং অধিক আনন্দের সহিত পত্রস্থ করিয়া থাকি। স্ত্রীলোকের একখানি রচনা পাইলে অন্তঃকরণে যেরূপ আহ্লাদের উদয় হয়, লেখনীর দ্বারা বর্ণযোগে প্রকাশ করিতে অক্ষম হইলাম'' ।[৫০] সে যুগে গুপ্ত কবির প্রশংসা যথেষ্ট মূল্য ছিল।

নারীর রচনা সম্বন্ধে সমকালে নানা পত্র-পত্রিকায় সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে। নারী রচনা সম্বন্ধে সন্দেহ ও সংশয়ের বিরুদ্ধে ঈশ্বরগুপ্ত কলম ধরলেন—"এ স্থলে পরিতাপের বিষয় এই যে, অঙ্গনা কর্তৃক কোন উত্তম প্রবন্ধ প্রচারিত হইয়া প্রকাশিত হইলে অনেক পুরুষ তাহাতে বিশ্বাস করেন না? বলিতে পারি না, রমণী হইতে রমণীয় রচনা কি সম্ভবপর নহে? দৈবশক্তি দেবী অথবা সরস্বতীর কৃপায় কি তাহারা কবিত্ব ও রচনাশক্তি প্রাপ্ত হইতে পারেন না? বাক্যবাদিনী শক্তিদেবী কি কেবল পুরুষের হৃদয়ে, পুরুষের কণ্ঠে এবং পুরুষেই বিহার করেন? ওহে, ও পুরুষ সকল। তোমরা কি নিশ্চয় রূপেই এমত স্থির করিয়াছ, যে স্ত্রীরূপ ক্ষেত্রে পরম কারুণিক পরমেশ্বর এতদ্রূপ করুণবীজ বপন করেন নাই? তিনি স্ত্রীজাতিতে স্বতন্ত্ররূপে যে কয়েকটি গুণ প্রদান করিয়াছেন, পুরুষে সেরূপ সঙ্ঘটন অতি দুর্লভ। ও পুমান। তোমরা এরূপ সংশয় কখনোই কোবোনা, কোরোনা—কোরোনা—এরূপ দ্বেষভাব কখনোই ধোরোনা ধোরোনা ধোরোনা, অভিমানে তাহাদিগের অপরিচিত অজ্ঞনির্গুণ হেরোনা হেরোনা হেরোনা।''[৫১] ভারতীয় নারী জাগরণের উষাকালে ঈশ্বরগুপ্তই নারী লেখিকাদের কাকলি শুনতে পেয়েছিলেন। 'সংবাদ 'প্রভাকরেই লেখিকাদের পাঠারম্ভ। মেট্রোপলিটন কলেজের শিক্ষক শ্রীনন্দলাল দাস মহাশয়ের পরিচিতি নিয়ে ঠাকুরাণী দাসী ও তাঁর ভগ্নী থাকমনি দাসীর আবির্ভাব। দুই ভগ্নীই বাল্ বিধবা। লঘু ত্রিপদীতে ঈশ্বর গুপ্তীয় ঢং-এ তাঁরা ঈশ্বর বর্ণনা করেছেন। গুপ্তকবির তিরোধানে ঠাকুরানী দাসী শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে 'জ্ঞানগুরু কল্পতরু'-কে প্রণতি জানিয়ে বলেছেন—

'কে আর কবিয়া সত্য, সাক্ষিরূপে রাখি সত্য,
সাধারণে করাবে বিশ্বাস।

কে আর বিশ্বাস করি, স্থান দিবে পত্রোপরি,
অভাগীর রচনাবলী।[৫২]

নাবীব রচনা সম্বন্ধে সে যুগে পুরুষেব ছিল সন্দেহ এবং নারীর ছিল সংকোচ। কোন দেশেই নারীদেব বিদ্যাচর্চা ও মৌলিক রচনা প্রকাশের পথ সুগম ছিল না। ফবাসীদেশ বিপ্লবের মধ্য দিয়ে বিশ্বকে কালান্তরের বাণী শুনিয়েছিল এবং নারীমুক্তির সূচনা কবেছিল। সেই ফরাসী দেশেও উনিশ শতকে নারীর রচনা প্রকাশের পথ সুগম ছিল না।[৫৩]

১৯৬৫-৬৬ সালে বিদ্যালয় পরিদর্শক উডরো সাহেবের রিপোর্টে বাবু হবমোহন ভট্টাচার্য ও বাবু রাধিকাপ্রসন্ন মুখার্জ্জির সহযোগিতায় বঙ্গসাহিত্যে সাতজন মহিলা লেখিকাব প্রকাশিত গ্রন্থেব একটি তালিকা প্রকাশিত হয়। সাতজন লেখিকা ও তাঁদের রচিত গ্রন্থের নাম 'নারীচরিত' বচয়িত্রী মার্থা সৌদামিনী সিংহ, 'হিন্দুর মহিলাগণেব হীনাবস্থা' রচয়িত্রী কৈলাসবাসিনী দেবী এবং এই লেখিকাব অপ গ্রন্থ 'হিন্দু অবলাকুলের বিদ্যাভ্যাস ও তাহাব সমুন্নতি।' শিবপুরের দ্বিজতনয়া ওরফে কামিনীসুন্দরী দাসীর 'উর্বশী নাটক' বসন্তকুমারী দাসীর রচিত 'কবিতামঞ্জরী', রাখালমণি গুপ্তর 'কবিতাবলী' এবং বামাসুন্দরী দেবী রচিত 'কি কি কুসংস্কার তিরোহিত হইলে এ দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে।'[৫৪]

উড্রো সাহেব ১৮৬৬-৬৭ সালের রিপোর্টে আটজন লেখিকার সংবাদ দিলেন। তাদের মধ্যে একজন খৃস্টান এবং সাতজন হিন্দু। সাতজন হিন্দুর মধ্যে তিনজন ব্রাহ্মণ, দু'জন বৈদ্য এবং দু'জন কায়স্থ।[৫৫] উচ্চবর্ণের মহিলারাই অগ্রণীর ভূমিকা নিয়েছে।

বামাবোধিনী পত্রিকা এবং এডুকেশন গেজেটে প্রায়ই নামধামহীন মহিলাদের রচনা প্রকাশিত হত। বিষয় ছিল, '…the affections and religious element in man."[৫৬] বিদ্যালয় পরিদর্শক তাঁর বিবরণে লিখেছেন, কামিনী সুন্দরীর 'উর্বশী নাটক'-এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। তিনি বহু চেষ্টা করেও রাখালমণি গুপ্তর 'কবিতামালা, 'হরকুমারী দেবীর 'বিদ্যাদরিদ্রদলনী' এবং কৃষ্ণকুমারী দাসীর 'চিত্ত-বিলাসিনী'-র একটিও কপি পাননি।[৫৭] এর থেকেই বোঝা যায় মহিলা লেখিকারা সমাজে যথেষ্ট মনোযোগের কারণ হয়েছেন। তবুও সম-সাময়িক কালের পত্র-পত্রিকায় সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে। বিদ্যালয় পরিদর্শক কৈলাসবাসিনী দেবীর রচনা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।[৫৮] 'বামারচনাবলী ১ম ভাগ' সম্পাদক সব রচনার মৌলিকত্ব

সম্বন্ধে সন্দেহাতীত নন।[৫৯] ক্যালকাটা রিভ্যু-তেও একই কথা বলা হল এবং নবীনকালী দেবীর 'কামিনীকলঙ্ক'-র ; তীব্র সমালোচনা করা হল।[৬০]

প্রথম মহিলা লেখিকাবা কোন প্রকার বাতাবরণকেই অস্বীকার করেছেন। জীবনের কঠিন বাস্তব সত্যই তাঁদের সাহিত্যের বিষয় বস্তু হয়েছে। বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, বৈধব্য, পণপ্রথা, কৌলীন্য প্রথা, বিধবাবিবাহ ও নাবীশিক্ষাই তাদের পর্যবেক্ষনেব ক্ষেত্র এবং সীমা। কৃষ্ণকামিনী দাসীব 'চিন্তাবিলাসিনী'-তে নারীব বেদনা ও নির্যাতনেব কথাই বলেছেন। "রাড়ের বিয়ে যদি আগে অব্দি থাকতো তবে আব এসব কম্ম কেউ করতো না, দেক্ দিকি বোন কত লোক লজ্জার ভয়ে, পেট ফেলে, পেটেব ছেলে যে প্রাণেব চেয়েও বড়, তাও নষ্ট করচে। তাকি পোড়ার মুকো ড্যাকবারা চোকে দেকে না" ?[৬১] এ ক্ষোভ মায়েব, এ তিবস্কাবও জননীব। এ চিত্র কি সাবা বাংলার কৌলীন্য প্রথা ও বাল্ বিধবা নিপীড়িত পরিবাবের চিত্র ? 'নবঙ্গিকা ও মদয়ন্তিকা'-য় নাটকীয় ভাবে কুলীনকন্যার বিরহ ও মদনজ্বালার চিত্র তুলে ধরেছেন। দৃশ্যকাব্য রচনায় লেখিকা সিদ্ধহস্ত।

কৃষ্ণকামিনী দাসী গ্রন্থ সূচনায় পয়ার ছন্দে মঙ্গলকাব্যের ঢঙে 'ব্রহ্ম বন্দনা' করে আত্মপরিচয় দিয়েছেন। হুগলী জেলার সুখরিয়া গ্রামে শ্রীশান্তিভূষণ মুস্তাফীর তিনি স্ত্রী।[৬২] লেখিকা ইংরাজ শাসনের গুণকীর্তন করেছেন। ইংরাজরা এদেশে স্টীমার, টেলিগ্র'ফ, বাষ্পীয় শকট চালু করায় নারী জীবনে আনন্দের সঞ্চার করেছে। ইতিপূর্বে দুর প্রবাসের স্বামীর পথ চেয়ে দিন গুনতো কামিনী। কিন্তু এখন —

এখন দুবেলা পাব, মন সাধ পুরাইব,
হবেনা বিচ্ছেদ জ্বালা আর।[৬৩]

এ আনন্দ সংবাদ যেমন কুলনারীর নিম্নোদ্ধৃত অংশটিও কুলবধূর।

যেমন পিঞ্জরের পাখি শুন শুন ওলো সখী,
চির দুঃখ দুঃখী-চিরদিন ॥
দারুন লম্পট পতি, পর মহিলায় রতি
পরবাসে বঞ্চেন যামিনী ॥
আমি হায় বিরহিনী গৃহে থাকি একাকিনী,
বালিসে আলিঙ্গ রেখে মরি।
করে সদা হায় হায়, শয্যা কণ্টকের প্রায়,
জাগরণে কাটাই শর্বরী ॥ (পৃ—২০)

এযুগের তরুণ শিক্ষিত সমাজ নারীর মধ্যে অমৃতের সন্ধান পেয়েছে।

অন্তগত গুণ যত তব প্রাণাধিকে।
সে বিষয়ে মুগ্ধ করেছে আমাকে॥
বিচারে পণ্ডিতা তুমি বুদ্ধে বিচক্ষণা।
সতত বিশুদ্ধ চিত্তপরায়ণা॥ (পৃ—২৮)

এ কেবল সুস্থ সামাজিক পরিবেশের কথাই নয়, নব যুগের নারীর অর্জিত মর্যাদার কথাও। লেখিকা নারীদের সুস্থ জীবনবোধে জাগ্রত হতে বলেছেন। নারী কেবল দেহকামনার বদ্ধজলায় আটকে থাকবে না, জ্ঞানের প্রভাত সূর্য্যকে জীবনে বন্দনা করবে। কুলীন কন্যাদের নিকটে লেখিকার আবেদন—

কুলের কামিনী হয়ে, কুলে জলাঞ্জলি দিয়ে,
কুলটা কুৎসিত নাম ধরোনা লো ধরোনা।
পরপতি প্রীতিকূপে, দেখ যেন কোনরূপে,
ভ্রমান্ধ হইয়ে ডুব দিও না লো দিও না।
পতিসঙ্গ পরিহরি, উপপতি সঙ্গ করি,
কলঙ্কের ভার শিরে নিও না নিও না। (পৃ—৫৮)

বাল বিধবা মনোরমা বাঁচার পথ খুজে নিয়েছে—

কদাপি কখন মন হলে উচাটন।
পুস্তক করিয়া হস্তে করি নিবারণ॥ (পৃঃ—৪৬)

বাল্ বিধবা মাতঙ্গিনী ও সৌদামিনীর বিধবাবিবাহ বিষয়ে কথোপকথন অংশটির নাটকীয়তা লক্ষ্য করবার মত।—

সৌদা—সিকি বোন ইকি কতা? আমরা হতভাগী, আমাদের কি আবার এমন ভাগ্যি হবে।

মাত—আর কথা কি, আইন হয়ে গিয়েচে তার আবার কতা কি।

সৌদা—হেঁলো, তোকে এ খবর কে দিলে?

মাত—কেন তুই কি এর কিছু জানিস্‌নে? আজ দুবচ্ছোর ধরে হলো ঐ ঘোঁট হচ্ছে, কেবল কতকগুলো পোড়ার মুকো বাদে লেগে এদ্দিন হতে দিইনি, তা তাদের মুক এবার পুড়িয়ে দিয়েচে।

সৌদা—হেঁলো, এমন গুণমনি গুণের সাগর কে আছে যে আমাদের দুঃখের দুখী হয়ে একাণ্ড কল্লে।

মাত—বিদ্যেসাগর।

সৌদা—তবে হবে না কেন বল, তাতো আমি আগেই বলিচি, সে যার হোক, একটা কিছুর সাগর হবে, সাগর না হলে পুকুরে ঢেউ খেলেনা, যা হোক কিন্তু ভাল নামটা রেকে গেলো। হেঁলো, আমরা তো এর বাপ্পও জানিনে, তুই এসব কথা কোত্ থেকে শুন্‌লি, আবার কোতা কিনা আইন হয়েছে, এ কথায় বা তোকে কে বল্লে, তুই যে দেকৃচি কোনের ভেতোর থেকে বিলেতের খবর রাখিস্।

মাত—এই আর বচ্ছোর অঘ্রান মাসে ওদের রাজীর ভাতার এসেছিল, তার মুকে শুনেছিলুম, যে রাঁড়ের বিয়ে হবে বলে কলকাতায় বড় ঘোঁট হচ্ছে, বিদ্দেসাগর নাকি বিয়ে দেবার জন্য বড্ড্ চেষ্টা পাচ্চেন, কেবল কতকগুলো হতভাগা ড্যাকরা জুটে হতে দিচ্চে না, তা ত বোন আমি বড় বিশ্বেস করিনি, হেঁসেই উড়িয়ে দিয়েছিলুম, কিন্তু গ্যাক দিকি একটা নতুন কি কোন আশ্চার্য্য বিষয় হলে, সাঁজ নেই, সকাল নেই, পতে ঘাটে যকন যেখানে দশজন লোক জড় হয়, সেখানে তারি কথা নিয়ে ঘোঁট করে। আমিও ঐ তক্কে ফিরতুম, যখন দেকিচি দশজন লোক এক জায়গায় জড় হয়েচে, অমনি আড়ালে ডাঁড়িয়ে কান খাড়া করে শুনিচি, বলি কে কি বলে, তা ওই রাতের সময় মুকুজ্জেদের শ্যামের বাপ এয়েছিল, এই তার মুকেই শুনলাম যে রাঁড়ের বিয়ে হবার আইন হয়েচে।

সৌদা—হেঁলো, এমন লোকও তো আছে যে এতেও আবার বাদে লেগেচেন।

মাত—হেঁ তাতে পোড়ার মুকোরা খুব দড়, (ভাল করতে পারবো না মন্দ করবো কি দিবি তা বল) আ মর, আঁটকুড়োদের কি একটু লজ্জা করে না, ইকি-তারা জানেনা, যে ময়ুরের কাছে ছাতারের নেত্তো খাটে না।

উদ্ধৃতিটি দীর্ঘ করলে নাটকীয় রস আরও জমতে পারতো, দুই নারীর কথা বলার মধ্যে তাদের কণ্ঠস্বর, দেহভঙ্গিমা এমন কি নারীজনোচিত শ্লেষ বিদ্রুপও বাদ যায়নি। ইতিপূর্বে রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্বস্ব' (১৮৫৪) প্রকাশিত হয়েছে। উমেশ-চন্দ্রের 'বিধবাবিবাহ নাটক' এবং কৃষ্ণকামিনী দাসীর 'চিত্তবলাসিনী, (১৮৫৬) একই বৎসর প্রকাশিত হয়। ১৮৫৬ তেই আবার বিধাবিবাহ আইনও পাশ হয়। রামনারায়ণ তাঁর নাটকে সংলাপ রচনায় বিশেষ করে নারীর সংলাপে এতখনি কৃতিত্ব দেখাতে পারেননি। 'চিত্তবিলাসিনী' (১৮৫৫) গ্রন্থখানি নারীদের ক্ষোভ, বেদনা, অভিযোগ এবং আশা আকাঙ্ক্ষার প্রথম বাণীরূপ।

শ্রীমতী কৈলাসবাসিনী দেবী রচিত' 'হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা' (১৮৬৩) গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন, "কতদিন এই বঙ্গদেশে জ্ঞানসূর্য্য উদয় হইয়া অজ্ঞান অন্ধকার নষ্ট করিবে ? হে বঙ্গবাসিনী ভগিনীগণ। কতদিনে তোমরা সর্বগুণাকৃতা হইয়া এই বঙ্গ

মাতাকে শোভিতা করিবে" ?[৬৪] এখনও কন্যারা পুত্রদের মত শিক্ষায় সমান সুযোগ পাচ্ছে না। বেথুনের স্কুলের বয়স হয়ে গেল পনেরো। কন্যাদের সম্বন্ধে সামাজিদের দৃষ্টিভঙ্গী পাল্‌টায়নি। "উহাদিগের বিদ্যাশিক্ষার কি আবশ্যক ? উহারা কি চাকরী করিয়া টাকা আনিবে" ;[৬৫] নারী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই ইংরাজী শিক্ষা ছিল অর্থোপার্জনের নিশ্চিত হাতিয়ার। "The study of the English is styled by the natives, Arthakari—bidya, or money making study".[৬৬]

কৌলীন্য প্রথা পুরুষের ক্ষেত্রে ছিল উপজীবিকা, তাই নারীকে ঠেলে দিল রূপ-জীবিকার পথে। কৈলাবাসিনী কৌলীন্য প্রথা সম্বন্ধে সমাজের জেগে ঘুমোনোর ভাবটিকে তীব্র ভাষায় সমালোচনা করলেন। "কি অজ্ঞানতার বিষয় ইহাদিগের পত্নীগণ ব্যাভি-চারিণী হইলেও অপমান হয় না, পুত্রগণ জারজ হইলেও মানের হানি হয় না, কেবল শশুরালয়ে গিয়া পূজা না পাইলেই অতিশয় মানের লাঘব হইয়া থাকে"।[৬৭] সামাজিক কল্যাণ চাই, নারীমুক্তি চাই, বিধবা বিবাহ হওয়া উচিত, বহুবিবাহ বন্ধ হওয়া বাঞ্ছনীয় প্রভৃতি দাবীগুলি নিয়ে আন্দোলন হচ্ছে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে আমরা দেখি সামগ্রিক প্রয়াস অপেক্ষা আংশিক প্রয়াস প্রাধান্য পেয়েছে। কৈলাসবাসিনী নারীদের প্রশ্নগুলিকে সোজাসুজি সামনে তুলে এনে সমাধান চাইলেন। "এই বঙ্গদেশে নানা প্রকার অনিয়মে পরিপূর্ণ রহিয়াছে, পরিবর্ত্তন করিতে হইলে তাহার সমুদায় পরিবর্ত্তন করিতে হয়, নতুবা একের উপর টান পড়িলে অন্য আসিয়া উপস্থিত হয়, যেমন বিধবা বিবাহ প্রচলিত হইয়াছে, কিন্তু বাল্যবিবাহ উঠিল না, এবং বহুবিবাহের আইন প্রচলিত হইবে, কিন্তু কৌলীন্য মর্যাদাটি থাকিবে। বিধবা ও বহুবিবাহ ফলস্বরূপ, কিন্তু কৌলীন্য মর্যাদা ও বাল্যবিবাহ ফলস্বরূপ হইয়াছে। যেমন বৃক্ষ সত্তে কখনই ফল একেবারে নষ্ট হয় না, তেমনি কৌলীন্য মর্যাদা ও বাল্যবিবাহ সত্তে কখনই বৈধব্য যন্ত্রনা ও বহুবিবাহ নিবারণ করিতে পারিবেন না, যেহেতু কারণ থাকিলে সে কার্য কখনই একেবারে নিবারিত হয়না।" এতো যুক্তির কথা ভাবাবেগের কথা নয়। কেবলমাত্র পরিস্থিতি, পরিবেশ ও সমস্যার কথা নয়, সমাধানের জন্য বলিষ্ঠ পদক্ষেপেরও কথা। লেখিকা স্পষ্ট ভাষায় বললেন কৌলীন্য যেমন নারীর ব্যভিচারিণী হবার পথ, বাল্যবিবাহও তেমনি বাল বৈধব্যের অন্যতম কারণ। বামা বলে বুদ্ধি বাম নয়, এরা বামপন্থার পথিক। কৈলাস-বাসিনীর জোরাল ভাষা ও যুক্তি দেখে সাময়িক পত্রে তাঁর রচনা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করা হল। এ সন্দেহের নিরশন ঘটালেন পণ্ডিত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয়, লেখিকার দ্বিতীয় গ্রন্থ 'হিন্দু অবলাকুলের বিদ্যাভ্যাস ও তাহার সমুন্নতি' (১৮৬৫) গ্রন্থের ভূমিকায় বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের পত্রটি

সংযোজিত হওয়ায় সব সন্দেহ দূর হল। লেখিকার অপর গ্রন্থ 'বিশ্বশোভা' (১৮৬৭), কাব্যগ্রন্থ।

পাবনার বামাসুন্দরী দেবীর 'কি কি কুসংস্কার তিরোহিত হইলে এ দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে' (১৮৬১) গ্রন্থে নারীজাতির উন্নতির পথের অন্তরায়গুলির কথা আলোচনা করেছেন। নারীশিক্ষা ও সমাজসেবা নিয়ে তিনি জীবন কাটিয়েছেন। নানা প্রকার সামাজিক বিরোধীতা ও নির্যাতন সহ্য করেছেন।[৬৯] বামাসুন্দরী সে যুগের নারীদের পথপ্রদর্শিকা। নারীরা বুঝতে পেরেছেন মুক্তি আরোপ করা যায় না, অর্জন করতে হয়।

বামাসুন্দরীর সমকালেই হরকুমারী দেবীর 'বিদ্যাদারিদ্রদলনী' (১৮৬১) রাখালমণি গুপ্তর 'কবিতামঞ্জরী' (১৮৬৫) এবং দয়াময়ী দেবীর 'পতিব্রতা ধর্ম' (১৮৬৮) প্রকাশিত হয়। দয়াময়ী পতি দেবতা শাস্ত্রীয় বাক্যটি নিরূপণে সব শক্তি ক্ষয় করেছেন। তিনি ধর্মসভার রক্ষণশীল মনোভাবেকেই সমর্থন কবেছেন।

মার্থা সৌদামিনী সিংহের 'নারীচরিত' (১৮৬৫) ছাত্রীদের পাঠযোগ্য করে রচিত। ভাষা সহজ ও সরল। গ্রন্থটিতে পাশ্চাত্য ভূ-খণ্ডের কৃতী মহিলাদের জীবনীর সংকলন। সম্ভবতঃ গ্রন্থটি রচনার মূল প্রেরণা ছিল টমাস টিম্‌সনের 'British Female Biography' এবং রেভারেণ্ড স্যামুয়েল বার্ডারের 'Memoirs of Eminently Pious Women' গ্রন্থদ্বয়। এইটিই প্রথম বাঙালী মহিলা রচিত বাঙলা পাঠ্য পুস্তক। গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয়েছে জেমস লং-কে।

হেমাঙ্গিনী দেবীর 'মনোরমা'-র(১৮৬৬) প্রথম সামাজিক উপন্যাসের মর্যাদা পাওয়া উচিত। নারীরা সামাজিক আন্দোলনে উৎসাহিত হয়ে সাংসারিক কর্তব্য পালনের পরও কত কৃচ্ছ্র সাধনে জীবনের মূল্যবোধকে বুঝতে চেয়েছিলেন, জগতকে জানতে চেয়েছিলেন, সমাজ পরিবারকে সুন্দর করে তুলতে চেয়েছিলেন তার পরিচয় তাদের রচনায় নিবদ্ধ হয়ে আছে। হেমাঙ্গিনী দেবীর 'মনোরমা (আখ্যায়িকা)' এবং 'প্রণয় প্রতিমা (কল্পনামূলক উপন্যাস)' উপন্যাসদ্বয়ে কাহিনী, চরিত্র, মানসিক দ্বন্দ্ব, সংলাপ ও লেখিকার জীবনচেতনা যথেষ্ট দুর্বল হলেও নারীর পারিবারিক জীবনের গঠনশীল আদর্শবোধের কথায় অত্যন্ত সচেতন। এতদিন ধর্ম ও কুসংস্কারের ভিত্তির উপর দাঁড়িয়েছিল সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের কাঠামো। সমাজ সংস্কারকরা প্রথমে তার উপরে আঘাত হানলেন। পুরানো অর্থাৎ প্রচলিত ধর্মীয় বিধিনিষেধের ডোর ছিন্ন হল অথচ নতুন সমাজবন্ধনের এবং সময়োচিত ধর্মবোধের জন্ম হল না। নতুন মূল্যবোধগুলি পারিবারিক জীবনে জাগিয়ে তোলার জন্ত এ যুগের মহিলা লেখিকাদের অবদান

অপরিসীম। "They have steadily worked in opposition to Hindu family beliefs, but have proposed no new group of ideas to take their place. In many Hindu families the difficulty is seriously felt to-day··· The daughter-in-law, having got a little education, believes she has rights of freedom and refuses to obey her mother-in-law. That is the new spirit uncontrolled by religion. The wine of liberty needs new bottles to contain it".[৭০]

তখনও অক্ষয় সরকার, শশধর তর্কচূড়ামণি, বঙ্কিমচন্দ্র বা আর্য সমাজের নেতৃবৃন্দের আবির্ভাব হয়নি। ঠিক এমনি একটি শূন্যতার মধ্যে হিন্দুধর্মের পারিবারিক বোধ ও চেতনার পুনর্গঠনের কাজে রত ছিলেন ঘরে ঘরে নবশিক্ষিতা মহিলারা। তারা বুঝতে পেরেছিলেন সংসার জীবনই নারীর আত্মবিকাশের শ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র। লেখিকা গ্রন্থ শীর্ষে লিখলেন, "মনোরমা দরিদ্র ব্রাহ্মণের কন্যা, সম্পত্তির মধ্যে এক সরল, কোমল ও উদার মন। আর সচ্চরিত্র স্বামীর সহবাসকে যদি 'উচ্চশিক্ষা' বলেন তবে' মনোরমা সে শিক্ষা লাভ করিয়াছে।" মনোরমা ভাগ্যবতী। সে সচ্চরিত্র স্বামী পেয়েছে, সতীনের ঘর করতে হয়নি। বিবাহের সময় মনোরমার বয়স সাত বৎসর। "মেঘমালার মধ্যগতা বিদ্যুৎলতার ন্যায় সঙ্গীগণের মধ্যে মনোরমা শোভা পাইতেছে।" (পৃ-৬)। বিবাহের পরেই বিদ্যুৎলতাকে আট বৎসর বয়সেই সমাজ সংসারে স্থির আলোর অধিকারিণী হয়ে প্রকাশ পেতে হল। স্বামী সাহচর্যে মনোরমার বিদ্যাচর্চা আরম্ভ হল। "তিনি বাঙলা লিখিতে পড়িতে শিখিলেন। তাহা দেখিয়া মনোরঞ্জন তাহাকে ব্যাকরণ শিক্ষা দিতে লাগিলেন, অনন্তর কিছু কিছু সংস্কৃত পড়াইতে লাগিলেন।" সংস্কৃত চর্চার মধ্য দিয়ে দেশীয় সংস্কৃতি ও শিক্ষা ব্যবস্থাকেই অবলম্বন করতে চাইছে। এ কালের রমণীরা সহ-ধর্মিণী হবার সাধনা করছে।

যোগেন্দ্রবাবু ব্রাহ্ম। তাঁর পরিবারের শিক্ষা-দীক্ষা, রুচি-আচরণ, সামাজিকতা গ্রামের আর দশটি পরিবার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তাঁর স্ত্রী বিবির কাছে পাঠাভ্যাস করেন, বিলাতী পোশাক পরিধান এবং "ইংলণ্ডের অঙ্গনাদের ন্যায় লজ্জা ত্যাগ করিয়া ঘোমটাতে জলাঞ্জলি দিয়া চেয়ারের উপর বসিয়া দাস-দাসী ও অপরাপর লোকের সহিত এমন ভাবে কথা কহেন যে দেখিলে বোধহয় ইনি খৃষ্টানী, নতুবা মুসলমানী, হিন্দু রমণী বলিয়া কিছু মনে হয় না।" ব্রাহ্ম পরিবারের মিল না থাকলেও হিন্দুয়ানিও তার পুরানো মূল্যবোধগুলি নিয়ে থাকতে পারছে না। তাই

তর্কবাগীশের প্রাচীনা স্ত্রী মনোরমাদেব দেখে স্বামীকে অভিযোগ করেন—"সারাজীবন তোমাব দাসী বৃত্তিই করিতেছি"। (পৃঃ—৫০)।

উপন্যাসটিতে নারী-শিক্ষা, নতুন পবিবার গঠনের কথা, ব্রাহ্মধর্মের নতুন পরিবেশ, স্বামী-স্ত্রীর আদর্শ, নীতিভ্রষ্ট জমিদাব, দাম্পত্য জীবনের সামাজিক ও ধর্মীয় লক্ষ্য বিবৃত হয়েছে। দুর্নিবার ইমোশন কাহিনী ও চবিত্রের পিনদ্ধতা নষ্ট করেছে। তবুও গ্রন্থটিতে গঠনশীল মধ্যবিত্ত জীবনের চেহারা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

হেমাঙ্গিনীর দ্বিতীয় উপন্যাস 'প্রণয়-প্রতিমা' (১৮৭৭) কল্পনামূলক উপন্যাস। বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ জনিত সমস্যাই প্রাধান্য পেয়েছে। অন্নদা-হেমাঙ্গিনী এবং মোহিনী মোহন ও সুবালার বিবাহপূর্ব প্রণয় চিত্রে লেখিকা যথেষ্ট সাহসিকা। অবশ্য ১৮৭২ থেকেই বঙ্গদর্শনে 'বিষবৃক্ষের' অবৈধ প্রণয় চিত্র প্রকাশিত হচ্ছিল।

প্রণয় পাপ নয় বা সমাজ বিরুদ্ধও নয়। কিন্তু প্রণয় বিকাশের জন্য উপযুক্ত সামাজিক পরিবেশ, শিক্ষা ও কচিব প্রয়োজন। হেমাঙ্গিনী দেবী এই প্রণয় সম্বন্ধে বলেছেন—"একটী যুবকের সহিত একটী স্ত্রীলোকের প্রণয় জন্মিল, কিন্তু যুবার পিতা মাতা যুবার বিবাহ অন্য যুবতীর সহিত দিলেন, সেই শোকে উপরোক্ত স্ত্রীলোকটি আত্মহত্যা করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিল,—এদিকে যুবক পূর্ব প্রণয়িণীর আশা জলাঞ্জলি দিয়া নির্বাসিত হইয়া গেল।" (পৃ-২০)। এখনও সমাজে স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসাই বৈধ প্রণয়। বিবাহের পূর্বে ভালবাসা বিদ্যা-সুন্দর কাব্যের মত সুড়ঙ্গের চোরাপথে চালান হলেও প্রকাশ্যে তার কোন অভিব্যক্তি ছিল না। রাধা-কৃষ্ণ তত্ত্বের উচ্চমার্গে তা আবদ্ধ ছিল। অবশ্য পূর্বেই সংবাদ প্রভাকরে দ্বারকানাথ অধিকারীর 'সতীত্বের আক্ষেপোক্তি'-শোনা গেছে।

নবীন যুবকগণে স্বদেশী যুবতীসনে
বিবাহের পূর্বে চাহে ভাব।

এতো ১৮৫৩ সালের কথা। নারী জীবনে এ প্রেম কাম্য হলেও, প্রকাশের পথ প্রশস্ত হয়নি। সত্তর দশকে নারী লেখিকারা তা প্রকাশে কোন প্রকার সঙ্কোচ বোধ করেননি। হেমাঙ্গিনী দেবী, সুরাঙ্গিনা দেবী, কামিনী সুন্দরী দেবী, কৃষ্ণকামিনী প্রভৃতি লেখিকারা অবৈধ এবং বিবাহপূর্ব প্রণয় চিত্র প্রকাশে সঙ্কোচ বোধ করেননি। পুরাতন পারিবারিক ব্যবস্থার মধ্যে থেকেও নবীনের প্রতি গভীর অনুরক্তি প্রকাশ করেছেন। জীবনের বহুমুখীন উদ্দেশ্যকে তারা অনুধাবন করতে না পারলেও জীবনের বিচিত্র সম্ভাবনাকে উপলব্ধি করেছেন। জীবনের চারপাশে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে অসীম কৌতুহল। অধিকাংশ লেখিকা চলার পথ নির্দেশ করতেই ব্যস্ত। তাদের সিদ্ধান্ত অব্যর্থ বা তর্কাতীত নয়। কিন্তু তাদের প্রয়াস সৎ। কৈলাসবাসিনী দেবী বামাসুন্দরীকে

অনুসরণ করেই সাহিত্যে পদার্পণ করেন। তাঁর নিজেরই স্বীকারোক্তি—"বামাসুন্দরী আমাদিগের পথপ্রদর্শিকারূপে এই বঙ্গভূমিতে অবতীর্ণা হইয়া আমার মনকে উত্তেজনা করিলেন।...তাঁহার অনুকম্পা প্রাপ্ত না হইলে আমার এই হাঁড়িবেড়ি ধরা হাত কখনই লেখনীধারণ করিতে ইচ্ছুক হইত না।" এখানে দুটি সংবাদের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। মহিলাদের পথ প্রদর্শনে পথ প্রদর্শিকার আবির্ভাব। দ্বিতীয় হাঁড়ি-বেড়ি ধরা হাতে লেখনী ধারণ। রমণীর মন 'উত্তেজিত' হবার মত অবকাশ ও শিক্ষা অর্জন করেছে।

কামিনী সুন্দরী দাসীর 'উর্বশী' (১৮৬৬) হেমাঙ্গিনী দেবীর 'মনোরমা' উপন্যাসের সমসাময়িক। নাটকে লেখিকার নাম ছিল না। পরবর্তীকালে 'উষা নাটক' (১৮৭১) এবং 'রামের বনবাস নাটক'-এ (১৮৭৭) লেখিকা নিজ নাম সংযোজন করেছেন। নাটকের বিজ্ঞাপনে জানি, "আমি অশিক্ষিতা এই আমার প্রথম রচনা।" কাহিনীটি গৃহীত হয়েছে জৈমিনীসংহিতার দণ্ডীপর্ব থেকে। "আমার গ্রন্থে অপবিত্র প্রণয় ব্যাখ্যা আছে, কিন্তু কেবল তাহা বলিয়াই সূক্ষ্মদর্শী পাঠকমণ্ডলী আমার গ্রন্থকে অনাদর করিবেন না।"

নাটকের ঘটনা নির্বাচনে লেখিকার একটি বিশেষ মানসিকতার প্রকাশ ঘটেছে। বিষয়বস্তু পৌরাণিক হলেও তা কিন্তু লেখিকার সমকালের ইতিবৃত্ত হয়ে পড়েছে। দেব চরিত্রগুলি গাজনের শিবের মত। পরিচিতের অঙ্গে দেবত্বের আরোপ। চলনবলন, ক্রিয়া-কলাপে গাজনের শিব যেমন নিজস্ব ভঙ্গীটির মধ্যে আবদ্ধ থাকে এই নাটকের রাজা, দেবতা, রানী, দেবী প্রভৃতিও তেমন। নাটকটি দীর্ঘদিন দ্বিতীয় সংস্করণের অপেক্ষায় ছিল।

নাটকে চারটি অঙ্ক, চৌত্রিশটি দৃশ্য সংযোজিত হয়েছে। তার মধ্যে ষোলটি অন্তঃপুরের দৃশ্যে, কেবলমাত্র নারীচরিত্রের অবস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। সমকালের নারীদের পারিবারিক জীবনের অন্তরঙ্গ পরিচয় পাওয়া যায়। দেবতারা তদানীন্তন গৃহস্বামীর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। চরিত্রগুলির চাল-চলন, কথাবার্তা এবং জীবনযাপনে যুগের রুচিবিকৃতি বিদ্যমান। উর্বশী বিহনে ইন্দ্রের চিত্ত বৈকল্য, উর্বশীর প্রতি কৃষ্ণের আসক্তি প্রভৃতি অন্তঃপুরে স্ত্রীদের মনোবেদনার কারণ হয়েছে। কালিন্দী যখন বলে, "অবাক! এঁর যে আর কিছুতেই কিছু হয় না। এই আমরা এতগুলো, আর বালক কালের কথা শুনি যে গোপের মেয়ে কত ছিল। ছি মা ছি। এ কি লজ্জার কথা। এখন আর এত বয়সে ও সকল ভাল দেখায় না। ছেলে পিলে সব শুনে কি মনে করবে?" (পৃ-১৯)। ইন্দ্রের অন্তঃপুরে উঁকি দিলে শচীর মনোবেদনার কথা জানা যাবে। দণ্ডীরাজ ঘোটকী-রূপী উর্বশীর মোহে স্ত্রীদের প্রতি অনাসক্তি, রাত্রে গৃহে প্রত্যাবর্তন না

করা, দিবাভাগে বৈঠকখানায় নিদ্রা যাওয়া প্রভৃতি ঘটনাগুলি বাঙলাদেশের নবগঠিত বাবু সভ্যতার বাস্তব চিত্র। কলকাতার বাবুদের বাগানবাড়ীর রক্ষিতারা দিনের বেলায় ঘোটকী রাতের নেশায় রূপসী উর্বশী হত। দণ্ডীরাজ ও কৃষ্ণের পরিবার মূলতঃ কৌলীন্য, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ পরিবৃত সংসার। দ্বিতীয় অঙ্কে কৃষ্ণের অন্তঃপুরের চিত্র। উর্বশীর কথা শুনে কৃষ্ণের রমণী-মণ্ডলীর মাথায় হাত। সব বিবাদ ভুলে আসন্ন বিপদের ভয়ে সবাই এক হয়েছে। সত্যভামা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বলে—

এক সতীনের জ্বালা সদাপ্রাণ ঝালাপালা
হইল দায়ের পর দায়। (পৃ-১৯)।

পুরাণের সিদ্ধ রসের চরিত্রগুলি লেখিকার হাতে কালের পুতুলে পবিণত হয়েছে। হস্তিনা রাজঅন্তঃপুরেব কিছুটা অংশ উদ্ধৃত করলেই লেখিকার সংলাপ রচনাব দক্ষতা এবং পৌরাণিক পাত্রে উনিশশতকের গার্হস্থ্য রস পরিবেশনের দক্ষতা উপলব্ধি করা যাবে।

ভানুমতী—হেলা, সুভদ্রা, তুই কেমন মেয়ে লা? তোর একটু লজ্জা নেই? তুই বৌ মানুষ, কোথাকার একটা অপরিচিত পুরুষ, সে আবার তোরই ভেয়ের শত্রু, তাকে কেমন করে ডেকে ঘরে আনলি লা?

সুভদ্রা—(সক্রোধে) তুমি চুপ কর। যে যেমন বোঝে সে তেমন করে। তোমাদের কি গা?

ভানু—আমাদের কি নয় কেন? এই যে রণস্থলে সকলে গেল। এখন কার কপালে কি আছে তাও বলা যায় না? এত মানুষেব সঙ্গে নয়, দেবতার সঙ্গে।

সুভদ্রা—হোক না দেবতা, তার ভয় কি আছে? ধর্মের জয় হবেই হবে।

শশিমুখী—ওলো সুভদ্রা, তুই ধর্ম ধর্ম করিসনে লো। কেবল তোরাই কি ধর্ম করতে জানিস, আর আমরাই কি অধর্ম করি?

সুভদ্রা—তা তোরা মনে বুঝে দেখ্।

শশি—ওলো তুই মনে বুঝে দেখ। ভাসুরের সঙ্গে চুপে চুপে পরামর্শ করে করে, এই অনর্থ ঘটালি। এতে যে কত জীবের হত্যে তা জানিস? ছি মা ছি। আমরা হলে লজ্জায় মরে যেতাম। এতদিন ঘর করাচ, তা কেউ কখন বলুক দেখি যে ভাসুরের সাক্ষাতে বেরিইচি?

সুভদ্রা—তা তোদের ভাতারেরা যে একশত ভাই স্বতন্তর, আর আমাদের পাঁচটীতে যে' একটী।

দুঃশীলা—হেলা সুভদ্রা, তবে তুই ও কি দ্রোপদীর মতন হয়েছিস নাকি?

সুভদ্রা—তা যা হই, তোর যদি ইচ্ছে হয়ে থাকে, না হয় তুইও তাই হ।

দুঃশীলা—আ পোড়া কপাল আর কি? আমরা তেমন মেয়ে নই, যে ভেয়ের সঙ্গে বেরিয়ে যাব।

লেখিকা কলকাতার নিকটবর্তী শিবপুরের অধিবাসিনী। কলকাতার ধর্মবুদ্ধি তখন প্রমোদবুদ্ধি। তখনও কলকাতার আশেপাশে ধনীর নাটমন্দিরে উমাচরণ ত্রিবেদীর 'মদনমাধুরী' (১৮৫৩); বনমালী ঘোষালের 'পদ্মগন্ধ উপাখ্যান' (১৮৬৪) এবং বিশ্বম্ভর দাসের 'রজনীকান্ত' (১৮৭০) এবং কবিওয়ালাদের ভারতচন্দ্রীয় অনুবর্তনের চেষ্টা, বিকৃত রুচির যুপকাষ্ঠে ঝুলছে। এই নাটকে এমন দৃশ্যের অভাব নেই। কৃষ্ণকমল গোস্বামীর যাত্রা পালার প্রভাব খুব বেশি। নাটকে অঙ্ক বিভাগ থাকলেও দৃশ্য বিভাগ খুব স্পষ্ট নয়। ঘন ঘন স্থান পরিবর্তনে নাটক জমতে পারেনি। মধুসূদনের প্রহসন 'একেই কি বলে সভ্যতা'র গার্হস্থ চিত্রে এমনি রসিকতার পরিচয় পাওয়া যাবে।

লেখিকা যেখানেই একটি নারী মণ্ডলী পেয়েছেন সেখানেই নারী সুলভ ভাবগুলি ফুটিয়ে তুলতে তৎপর হয়েছেন। স্বর্গে-মর্তে নারীদের নিয়ে ভোগের আবিলতার চিত্রটিই বড় হয়ে উঠেছে। বিশ্বামিত্রের ধ্যান ভঙ্গের প্রসঙ্গে রম্ভা ব্যঙ্গ করে বলে, 'কামিনীতে কেও বঞ্চিত নন্।' (১ম অঙ্ক) কথাটি অক্ষরে অক্ষরে সত্য। দেব-দ্বিজ-রাজা-প্রজা কারোর নারীর ভোগের কোন ক্লান্তি বা নৈতিক বোধ নেই। উর্বশী স্বর্গে যাবার পূর্বে দণ্ডীরাজার সঙ্গে কথোপকথন দৃশ্যটির (পৃ-৭০—৭৬) শেষে আদিরসের উথালি-পাতালি বড়ই পীড়াদায়ক। যুদ্ধের পর দুর্যোধন রাজ অন্তঃপুরে রানী ভানুমতীকে বলছেন—"তোমার কোমলাঙ্গ স্পর্শ করে শীতল হতে এলাম।' ইন্দ্রের প্রবেশে শচীর মধ্যে কামনারাগ জেগে ওঠে। উর্বশী ও রম্ভা রসালাপ করতে করতে বিদায় নেয়। উর্বশী যখন ইন্দ্রের সভায় যাবেই স্থির করেছে, দণ্ডীরাজ কোন ভাবেই বন্ধ করতে পারছেন না তখন তার উর্বশীর কাছে শেষ প্রার্থনা—'হে কোমলাঙ্গী, তোমার শীতল অঙ্গ একবার স্পর্শ করি এস।'

উর্বশী—(বিরক্তা) আঃ। কি কর কোথা হাত দাও? (পৃঃ-৭৬)।

উদ্ধৃতিগুলি কাম-কলুষিত পুরুষ চরিত্রের। নাটকে সব পুরুষ চরিত্রই কাম-জর্জর। লেখিকা দেব-মানবের মধ্যে আদর্শ পুরুষ চরিত্র দেখতে পাননি। 'A man's courage is often a mere animal quality and its most elevated form a point of honour".[৭১]

নারীদের আচার-আচরণ, কথাবলার ভঙ্গী, ও তাদের বিশেষ শব্দকোষটিও যথাযথ ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। উপরের উদ্ধৃতিগুলিই তার সাক্ষ্য দেবে। পাতিব্রত্যই যে

যুগে নারীর ধর্ম সে যুগে দেবী-মানবী মিলে দাম্পত্য জীবনের বেদনার কথা ও পুরুষ-চরিত্রের ভ্রষ্টাচারকে তুলে ধরা কম সাহসের পরিচয় নয়।

নবীনকালী দেবীর প্রথম রচনা 'কামিনীকলঙ্ক' (১৮৭০) উপন্যাস। ডঃ সুকুমার সেন মহাশয় 'কিরণমালা' (১৮৭৮) নামে আর একটি উপন্যাসের উল্লেখ করেছেন। নবীনকালীর অপর দুটি কাব্যগ্রন্থ শ্রীবরদাকান্ত বিদ্যাবত্ন মহাশয় কর্তৃক মুদ্রিত 'মন্দোদরীর রণসজ্জা' (১২৮৭) 'শ্মশানভ্রমণ' (১২৮৬)। কাব্যগ্রন্থ দুটি রানী স্বর্ণময়ীর অর্থানুকূল্যে মুদ্রিত। প্রথম কাব্যগ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয়েছে বামাবোধিনী সম্পাদক উমেশচন্দ্র দত্তকে এবং দ্বিতীয় গ্রন্থটি প্রকাশে সহায়তা করেছেন লুক্রেশিয়া প্রণেতা শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায়। ইনি' ষটচক্রভেদ' (১৮৮৬) এবং 'ভগবদগীতা' নামক গ্রন্থও রচনা করেছিলেন।

কামিনী কলঙ্ক প্রকাশিত হলে পাঠক সমাজে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। ডঃ সুকুমার সেন মহাশয় মন্তব্য করেছেন—'গদ্যে পদ্যে লেখা নবীনকালী দেবীব 'কামিনী-কলঙ্কে'-এর (১২৭৭) কাহিনীতে বচয়িত্রীর আত্মকথার ছায়া আছে বলিয়া মনে হয় এবং সেইজন্য ইহা বাঙ্গালায় প্রথম বাস্তব উপন্যাসের প্রচেষ্টা বলিয়া দাবী কবিতে পারি।'[৭২] ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থটিকে উপন্যাস বলেই বিবেচনা করেছেন।[৭৩] ১৮৭০ সালে গ্রন্থটির সমালোচনা প্রকাশিত হল—

"We simply mention the book in order to bring it to the notices of the Rev. Mr. Robinson of whoever may be the censor of Indian morals in literature. Any thing more silly or more filthy could scarcely be conceived. There is sufficient internal evidence to show that it can not have been written by any Hindu woman, the prurient Scribbler (and we wish the Commissioner of Police could catch him) has simply put a lady's name on the title page in order to attract attention and possibly rapid and extensive sale."[৭৪]

কামিনী সুন্দরী দেবীর দ্বিতীয় নাটক 'উষা নাটক' (১৮৭১) প্রকাশিত হলে ঠিক একই কথা বলা হল—'We suspect it is a mere hoax. We are inclined to believe that the authoress is of the masculine and not of the feminine gender'".[৭৫]

কামিনীসুন্দরী দেবী বা নবীনকালী দেবী এই তিক্ত এবং তীব্র সমালোচনার কাছে আত্মসমর্পন করেন নি। তার প্রমাণ নবীনকালী দেবীর একাধিক গ্রন্থ। অথচ

সমকালে দয়াময়ী দেবীর 'পতিব্রতাধর্ম (১৮৬৮) কৈলাসবাসিনী দেবীর তৃতীয় গ্রন্থ 'বিশ্বশোভা (১৮৬৮), নামহীন লেখিকার 'কুসুম ও মালিকা' (১৮৭১) এবং সুরাঙ্গিনা দেবীর 'তাবা চরিত' (১৮৭৪) যথেষ্ট প্রশংসা অর্জন করেছিল। এমন কি কৈলাসবাসিনী দেবীর 'বিশ্বশোভা' কাব্যগ্রন্থের সমালোচনায় বলা হল পদ্য অপেক্ষা গদ্যেই তাঁর হাত খোলে ভাল। "Why does she not try her hand at a novel ?"[৭৬] মহিলা লেখিকারা ক্রমশই যোগ্যতর ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করছেন এবং সাহিত্যের সর্বশাখার অনুশীলনে তৎপব হয়েছেন।

নবীনকালী দেবীর 'মন্দোদরীর রণসজ্জা' (অভিনব কাব্য ১৮৮০) নানাদিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য। কবি প্রথমে বীণাপাণির বন্দনা করেছেন। কাব্যের ললাটে রামায়ণ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন—

রণস্থলে পড়িল লঙ্কাব অধিকারী,
অন্তঃপুরে বার্তা পায রানী মন্দোদরী ॥

ইংবাজী শিক্ষার ফলে বাঙালী পরিবাবে যে বৈপ্লবিক রূপান্তর চলছিল তার বাণীরূপ প্রমীলা। পারিবারিক জীবনে অতুলনীয়া। মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ' কাব্যের দ্বারা লেখিকা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত। সমগ্র বাংলা কাব্য জগতে হয়তো কাব্যটির বিশেষ কোন মূল্য নাও থাকতে পারে। নারীরচিত সাহিত্যে এর কিছু মূল্য আছে।

রঙ্গলালের হাতে বাঙলা সাহিত্যে গাথা কাব্যের সূত্রপাত। বাংলা সাহিত্যে দীর্ঘদিন ধরে গাথা কাব্যের রচনা চলবে। রঙ্গলালের হাতে নারী দেহসর্বস্বতা থেকে মুক্তি পেল। নারী কেবল কামকেলিব সহচরী বা ভোগের অঙ্কশায়িনী নয়। মধুসূদনের প্রমীলার যুদ্ধের সাজ বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত। রণসাজ পরিযেও মধুসূদন তাতে অলঙ্কারের তাৎপর্য আরোপ করেছিলেন। মন্দোদরী যুদ্ধ যাত্রায় সব বাহুল্য বর্জন করেছেন। "কোথা সে লাবণ্য কোথা অলঙ্কার, কোথা মনোহর কবরী বন্ধন।" (পৃ—৫)। পতিপুত্র শোকে কাতরা মন্দোদরীর যুদ্ধের অস্ত্র—

ভাসাব কিষ্কিন্দা নয়ন সলিলে,
পোড়াব অযোধ্যা   স্বামী শোকানলে,
ডুবাইব লঙ্কা   সাগরের জলে,
প্রলয় করিব আজি এ রণে। (পৃ—৫)

তার যুদ্ধের প্রধান অস্ত্র 'নয়ন সলিল' আর স্বামী শোকানল। ক্রোধের নিশ্চয়ই জাত বিচার নেই। কিন্তু শোকের আছে। মধুসূদনের প্রমীলা স্বামীর চিতায় বসে

সখিদের বলে—'পতি বিনা অবলার কি গতি জগতে ?' (৯ম সর্গ) মধুসূদনের প্রমীলা ভাগ্যবতী, চিতায় স্বামী সঙ্গী হয়েছিল। মন্দোদরীর আক্ষেপ—

বিধবারে বল কেবা করে সমাদর,
আপনি বিধাতা বাম যাহার উপর,
পতিহীনা যেই জন ভূষণে কি প্রয়োজন,
নিবারণ হয়েছে যার জীবন আলোক
জ্বলিছে হৃদয় মাঝে পতিপুত্র শোক। (পৃ—২৭)

বৈধব্য যন্ত্রণা মন্দোদরীকে কাতর করেছে। এটাই সে যুগের নারীর করুণ পরিণতি। নারী ব্যতীত এ বেদনার কথা আর কারুর জানার কথা নয়।

মেঘনাদবধ কাব্যের যেখানে শেষ 'মন্দোদরীর রণসজ্জা'-র সেখান থেকেই আরম্ভ। মধুসূদনের প্রমীলার যুদ্ধ যাত্রায় সঙ্গী ছিল একশত চেড়ী ('চড়িলা ঘোড়া একশত চেড়ী'—৩য় সর্গ)। ১৮৬১-তে মেঘনাদবধের আত্মপ্রকাশ। উনিশ বৎসর পর মন্দোদরীর রণসজ্জার (১৮৮০) আত্মপ্রকাশ। ইতিমধ্যে নারীরাও পুরুষের পাশে অনেকখানি জায়গা করে নিয়েছে। সমাজ প্রগতির তারাও অংশীদার। আজকের সমাজে শতচেড়িকে আহ্বান করলে চলবে না। কেননা ঘরে ঘরে নারী জাগরণের পালা চলছে। তাই মন্দোদরী যুদ্ধযাত্রায় আবহ্বান করেছেন সমস্ত নারীসমাজকে।

সাজি সংগ্রামের সাজ, ত্যজি সবে ভয় লাজ,
দাঁড়াল নারী সমাজ,
কিবা শোভা তায় রে। (পৃ—১৬)।

প্রমীলা শত্রু ব্যূহ ভেদ করতে চেয়েছিলেন পতি পদ পাবার জন্য ('পতিপদ পূজিতে যুবতী'—৩য় সর্গ)। কিন্তু মন্দোদরী রাজার অভাবে রাজ্যের ভার নিতে চেয়েছেন—

ধরেছি বীরের বেশ, রাখিতে আপন দেশ,
সহিবারে রণক্লেশ,
নহি আমি কাতরা।
দমন করিতে অরি, নিজে যদি প্রাণে মরি,
বীর পতি পদে স্মরি,
হব স্বর্গে অমরা। (পৃ—১৭)

মধুসূদনের প্রতিভার সঙ্গে নবীনকালীর প্রতিভার কোন তুলনাই চলতে পারে না। আমরা নারীর সামাজিক অবস্থান ও তার ভাবনার বিবর্তন দেখাবার প্রয়াস পেয়েছি মাত্র। ১২৮৬ সালে নবীনকালীর 'শ্মশান-ভ্রমণ' রূপক রচনাটি প্রকাশিত হয়।

দ্বাদশ শতাব্দীর জয়চন্দ্র, পৃথ্বিরাজ, জয়মল, রায়মল এবং জয়চন্দ্রের কন্যাকে নিয়ে বাঙলা সাহিত্যে বেশ কয়েকটি উপন্যাস রচিত হয়। সম্ভবতঃ এই পটভূমিকায় রচিত প্রথম উপন্যাস সুরাঙ্গিনা দেবীর 'তারা চরিত' (১৮৭৪) এবং দুই বৎসর পর স্বর্ণকুমারীর 'দীপনির্বাণ' (১৮৭৬) এবং ১৮৯৮তে বৈষ্ণবচরণ বসাকের 'কামিনীকলঙ্ক ও শ্মশানলতা' প্রকাশিত হয়, সুরাঙ্গিনা দেবীর কাহিনী প্রচলিত ইতিহাসকে আশ্রয় করে সহজ সরল ভাবে ও ভাষায় নারীজনোচিত আবেগের প্রকাশ ঘটেছে। টোডতঙ্কের প্রধান রাও সুরতানের বীর্যবতী রূপগুণ সম্পন্না তারা, উপন্যাসের নায়িকা। পিতার পাশে পাশে মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধেই কেবল অবস্থান করেননি যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে সৈন্য পরিচালনা করেছেন। রাও সুরতান মুসলমানদের হাতে পরাজিত হয়ে রাজ্যহারা হলেন। পিতা ও কন্যা আত্মগোপন করে বেড়াতে লাগলেন। মেওয়ারাধিপতি রায়মলের পুত্র জয়মল তারার রূপে মুগ্ধ হয়ে রাও সুরতানের কাছে তারাকে বিবাহের ইচ্ছা প্রকাশ করে প্রস্তাব পাঠান। তারা বিবাহে সম্মতি জানালে জয়মল মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রাও সুরতানকে সাহায্য করেন। জয়মল মুসলমানদের হাতে পরাজিত হন। তারাকে পাবার জন্য এবার তিনি হীন চক্রান্তে লিপ্ত হন। রাও সুরতান তাঁর কন্যার অমর্যাদার প্রতিশোধ নেবার জন্য একদিন অকস্মাৎ জয়মলের শিবিরে প্রবেশ করে জয়মলকে হত্যা করেন। রায়মল পুত্রের অপকর্মের কথা শুনে মর্মাহত হন এবং জ্যেষ্ঠ পুত্র পৃথ্বিরাজকে রাও সুরতানকে সাহায্য করার জন্য পাঠান। তারা ও পৃথ্বিরাজের প্রণয় এবং বিবাহ সম্পন্ন হয়। সুখেই তাদের দিন কাটছিল। ভগ্নীর পত্রে জানলেন তাঁর স্বামী শিরোহী পতি তাঁকে অত্যাচার করছে। তাকে রক্ষা করতে যেয়ে ভগ্নীপতি প্রদত্ত বিষে প্রাণ ত্যাগ করলেন। তারা স্বামীর চিতায় সহমরণে গেলেন। মেওয়ারাধিপতি পুত্র এবং পুত্রবধূর শোকে প্রাণত্যাগ করলেন।

উপন্যাসটিতে ইতিহাসের দুর্জয় ঘনঘটা, যুদ্ধের দামামা, ক্ষমতার চক্রান্ত এবং অনিশ্চিত ভবিষ্যতের গাঢ় ছায়াপাত ঘটলেও—সবই আভাষিত। জয়মলের কামনার প্রদাহ, তারার পৃথ্বিরাজের প্রতি প্রণয়াসক্তি এবং তাদের দাম্পত্য জীবনের চিত্রাঙ্কনে লেখিকা হৃদয়ের সব আবেগ ও কল্পনা নিঃশেষ করেছেন। তারার বীরাঙ্গনা রূপ যতখানি ফুটেছে তারচেয়ে অনেক বেশি মমতা দিয়ে ফুটিয়েছেন তারার প্রণয়িনী ও বধূরূপ। উপন্যাসটিতে কোমল, পেলব নারী হৃদয়ের ছাপ সর্বত্র। পরবর্তীকালে এই ঐতিহাসিক পটভুমিকায় স্বর্ণকুমারীর 'দীপনির্বাণ' (১৮৭৬) উপন্যাসটি রচিত হবে। ১৮৭৪ সালেই রমেশচন্দ্র দত্তের প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস 'বঙ্গবিজেতা' প্রকাশিত হতে থাকে। রমেশচন্দ্রের চারখানি উপন্যাসেরই কাল মোগল যুগ। ১৮৯১ তে বৈষ্ণব চরণ

বর্ণাকের 'কামিনীকলঙ্ক ও শ্মশানলতার' প্রকাশ। বৈষ্ণবচরণ, সুরাঙ্গিনা দেবী ও স্বর্ণকুমারী দেবী ঐতিহাসিক স্থান কাল ও ঘটনাকে আশ্রয় করে গদ্যে বিদ্যাসুন্দর রচনা করলেন। সমকালের ছাপ প্রকট হয়ে উঠলো। রমেশচন্দ্র ও বৈষ্ণবচরণের পাশে সুরাঙ্গিনা ও স্বর্ণকুমারীর উপন্যাস দুটি স্থাপন করলে নারী ও পুরুষের রচনার পার্থক্য বোঝা যায়। প্লট গ্রন্থনে, চরিত্র সৃষ্টির নৈপুণ্যে ঐতিহাসিক ঔচিত্যবোধে স্বর্ণকুমারীর কৃতিত্ব উপেক্ষণীয় নয়। "It may be that the fire which burns in their hearts, hath neither sufficient heat nor lustre to attack a crowd, but the flame is real, and a mere reflection"[৭৭]

লেডি ব্রাউনিং সম্বন্ধে বলা হলেও আমাদের আলোচ্য অধ্যায়ের লেখিকাদের ক্ষেত্রেও সত্য।

এ কালের সবচেয়ে বড় দলিল হতে পারতো রাসসুন্দরী দাসীর 'আমার জীবন'। জীবনীটির অঙ্গে অঙ্গে ধর্মতত্ত্ব বা ধর্মীয় স্তোত্র। ফলে ঐতিহাসিক দিকটি সম্পূর্ণ অবহেলিত। দ্বাদশ বৎসরের একটি বালিকার পতিগৃহে যাওয়ার করুণ বর্ণনা, সাংসারিক শতকাজের মাঝে বিদ্যাচর্চা, আটাশ বৎসরের বিবাহিত জীবনে দ্বাদশপুত্রের জননী হওয়া, পারিবারিক জীবনের খণ্ড খণ্ড চিত্র, সমসাময়িক নারী সমাজের ধ্যান ধারণার পরিচয় পাওয়া যায়। স্বামী পুত্র ও পরিজনের কথা তিনি যতখানি যত্ন ও একাগ্রতার সঙ্গে বলেছেন নিজের ব্যক্তিগত ভাব-ভাবনার কথায় তিনি ঠিক ততখানি নীরব। এই নীরবতাই একালের নারীর বড় গুণ।

"They are the loveliest and most unaggressive of helpmates and they want to remain in that role ; they do not insist on their own rights—quite the contrary. They are easy to handle in every way if one only loves them".[৭৮]

দাম্পত্য জীবনের, পারিবারিক জীবনের জটিল পথ পরিক্রমার ইতিহাস, সতীত্ব ও স্বামীর প্রতি অবিচল ভালবাসা এবং পুত্র কন্যাদের প্রতি গভীর স্নেহ—মমতায় হারিয়ে গেছে।

ম্যালেন্স ও 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ'

বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস-এ ক্যাথারিন্ ম্যালেন্স-এর 'ফুলমণি ও করুণার' বিবরণ (১৮৫২) গ্রন্থটি, উপন্যাসের প্রাথমিক রূপ বলে স্বীকৃতি পেয়ে আসছিল। ১৩৭০

বঙ্গাব্দে সবিতা দাস' 'দেশ' পত্রিকায় 'দি ওরিয়েন্টাল ব্যাপটিষ্ট' পত্রিকা থেকে গ্রন্থটির সমালোচনার কিছু অংশ উদ্ধৃত করে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন, ক্যাথারিনের গ্রন্থটি ইংরাজী গ্রন্থের অনুবাদ।[৭৯] ১৯৭৫ সনে ভক্তিমাধব চট্টোপাধ্যায় 'অমৃত' পত্রিকায় 'বিতর্কিত উপন্যাস ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' প্রবন্ধে, ব্রিটিশ মিউজিয়াম থেকে 'দি লাস্ট ডেইজ অব্ দি উইক্' নামক ইংরাজী গ্রন্থের মাইক্রোফিলিম সংগ্রহ করে, 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ'-এর সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন—"—মোটেই একটি মৌলিক রচনা নয়। এব সর্বাঙ্গে সর্বৈব অনুবাদ। বাক্যে বাক্যে শব্দে শব্দে অনুবাদ। চরিত্রে অনুবাদ, ঘটনায় অনুবাদ।"[৮০]

অষ্টাদশ-উনিশ শতকের বিপুল খ্রীষ্টীয় বাংলা গদ্য সাহিত্যে 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' কাহিনী বা গল্প রচনার সূত্রপাত করে। তাঁর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব, তিনি বিদেশী গল্পটিকে এ দেশের উপেক্ষিত একটি সমাজ জীবনের উপব স্থাপন করে স্থান ও কালগত বৈশিষ্ট্য আরোপে সক্ষম হয়েছিলেন। গ্রন্থটির ভূমিকায় লেখিকা তাঁর ব্যাপক অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেছেন। বাংলা দেশে খৃষ্টীয় ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ হল অশিক্ষিত কৃষক সম্প্রদায়। এরা দরিদ্র, অশিক্ষিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন এবং কলহপ্রিয়। ক্যালকাটা ক্রিশ্চিয়ান অব্জারভার মন্তব্য করেছে—""The bulk of the native Christian population is agricultural and uneducated. Many of them have been brought up amidst heathen customs and ideas. They have never been accustomed to reasoning".[৮১]

চণ্ডীমঙ্গলের কালকেতু-ফুল্লরা কাহিনীব পর অন্ত্যজ শ্রেণী সাহিত্যে আবার নায়ক-নায়িকার ভূমিকা গ্রহণ করলো। ফুলমণি ও করুণা, কাহিনীটির মুখ্য চরিত্র। গ্রন্থটিতে নারী চরিত্রের প্রাধান্য ঘটায়, পারিবারিক জীবন গুরুত্ব পেয়েছে। ম্যালেন্সের উদ্দেশ্যই ছিল খৃষ্ট ধর্মের পারিবারিক জীবনাদর্শের অনুরূপ পরিবার গঠন। লেখিকা খুব সতর্কতার সঙ্গে খৃষ্টানদের জাতিভেদ প্রথার উল্লেখ করেছেন। কোথাও কোন রকম অহেতুক মন্তব্য নেই। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে এসিয়াটিক জার্নালে 'caste amongst Native Christians'[৮২] নিবন্ধে জাতিভেদ প্রথার কথা বলা হল। এই জাতিভেদ প্রথা হিন্দু-মুসলমান ও খৃষ্টান সব সম্প্রদায়ের মধ্যেই লক্ষ্য করা যাবে। জ্ঞানেন্দ্র মোহন ঠাকুর নিজেকে 'I am Brahmin Christian'.[৮৩] বলে গর্ব অনুভব করতেন। রেঃ লাল বিহারী দে নিজেকে বৈদ্য জাতীয় বলে অহঙ্কার করতেন।[৮৪] ভারতীয় খৃষ্টানদের মধ্যে সাহেব খৃষ্টান, দেশীয় শিক্ষিত খৃষ্টান ও অশিক্ষিত দরিদ্র খৃষ্টান, এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। দক্ষিণ ভারতে পারিয়ারা সাহেব খৃষ্টানদের সঙ্গে

প্রার্থনায় যোগ দিতে পারত না। ম্যালেন্স "এ দেশের অশিক্ষিত শ্রেণীর কতকগুলি খ্রীষ্ট ধর্মান্তরিত হিন্দু বাঙালী পরিবারকে"[৮৫] তাঁর কাহিনীর বিষয়বস্তু রূপে গ্রহণ করেছেন। লেখিকার কৃতিত্ব—"We are translated at once into the heart of a Bengali Christian village. Bengali women and children walked life-like in flesh and blood before us. The children run about ; the women gossip, and wrangle and lie-or are honest, truthful and industrious : but they are neither too bad nor too good for Bengali female nature, as modified by Christianity. We are initiated into the mysteries of Bengali house-keeping and began to have becoming ideas of the value of a single piece [৮৬]

ধর্মের মাপকাঠিতে বিচার করলে করুণার চরিত্র অনেকখানি ম্লান হয়ে যাবে। মানবিক দৃষ্টি ভঙ্গী দিয়ে বিচার করলে, গ্রাম বাংলার অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণীর রমণী হিসাবে একান্তই জীবন্ত ও বাস্তব। করুণার স্বামী মাতাল, দায়িত্বজ্ঞানহীন এবং উচ্ছৃঙ্খল। তার এক ছেলে চোর আর এক ছেলে কুপথগামী। লেখিকার সহানুভূতি, পুত্রের মৃত্যু, করুণার জীবনে ভারসাম্য এনে দিয়েছে। জীবনের নানা বিপর্যয়ের মধ্যে সে অনুভব করে, স্বামী পুত্র তার জীবনধারণের সহায়ক নয়। কবিরাজের সুযোগ বুঝে চব্বিশ টাকা দাবী-করা, মধুর বৃদ্ধা জননীর মধুর সঙ্গে সুন্দরীর বিবাহের প্রস্তাব, সুন্দরীর কলকাতা যাওয়া নিয়ে গ্রামের মানুষের জটলা, মধুর মার সুযোগ বুঝে প্রচার করে দেওয়া 'সুন্দরীর গর্ভ হইয়াছে, তাহা গোপনে নষ্ট করিবার কারণ ফুলমণি তাহাকে কলকাতায় পাঠাইতেছে,' করুণার স্বামীর মাতলামি, বেশ্যালয়ে গমন ও করুণাকে প্রহার করা, করুণা মেমের কাছে কাপড় কেনার টাকা নিয়ে তামাক কিনে খাওয়া এবং তার উক্তি 'আমরা তামাক না খাইলে মারা পরি' বংশীর সন্‌গরসন খেলা প্রভৃতির মধ্যে যে চরিত্রগুলি ভেসে উঠছে তার নজির পরবর্তীকালে একমাত্র দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকে ভদ্রেতর চরিত্রে পাওয়া যাবে। কুসংস্কারাচ্ছন্ন অশিক্ষিত নিম্ন শ্রেণীর মানুষের তন্ত্র-মন্ত্র-ঝাড়-ফোক প্রভৃতির প্রতি বিশ্বাস তো এ কালেও যায়নি। পরের ঘরে চুরি করতে যেয়ে বংশী জলে ডুবে মারা গেল। গ্রামের সাধারণ ঘটনার মধ্য দিয়ে ট্রাজেডীর করুণ রস উৎসারিত করেছেন। ক্যালকাটা রিভ্যু-তে আলালের সমালোচনায় বলা হল—"The world of to-day is a matter of fact world. We prefer the real to the unreal—the probable to extravagant. We like the world of living beingsmen of real, flesh and blood-men possessing like passions with ourselves".[৮৭]

উদ্ধৃতাংশটি কিন্তু বহুলাংশে 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। পরবর্তীকালে বিদ্যাসাগরের অনুবাদ গ্রন্থগুলি মৌলিক রচনার মর্যাদা পেয়েছে।[৮৮] ম্যালেন্সের রচনায় বাঙলার প্রত্যন্ত প্রদেশের অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষ তার প্রকৃতি, স্বভাব, দোষ-ত্রুটি নিয়ে সশরীরে উপস্থিত হয়েছে। ক্যালকাটা ক্রিশ্চয়ান অবজারভার ম্যালেন্সের অনুবাদ সম্বন্ধে বলেছে—"But as soon as she felt her strength of wing, she struck out into new fields of incident, conversation, character and description altogether original and altogether Hindu."

দি ওরিয়েণ্টাল ব্যাপটিস্ট পত্রিকাও এ কথা স্বীকার করেছে।[৮৯]

ম্যালেন্সের সমসাময়িক কালে য়ুরোপে 'good-will to man'[৯০]-এই আদর্শ সামনে রেখে কবি, শিল্পী এবং সাহিত্যিকেরা সমাজের সবস্তরের কল্যাণের জন্য অভিযান আরম্ভ করেছিলেন। "The poet, the painter and the artist, now seek out and embellish the common and gentler humanities of life, and, under the allurements of fiction, breath a humanizing and subduing influence, favourable to the development of the great principles of christian brotherhood.

The hand of benevolence is every where stretched out, searching into abuses, righting wrongs, alleviating distresses, and bringing to the knowledge and sympathies of the world the lowly, the oppressed and the forgotten."[৯১]

এই আন্দোলন এবং কর্মপ্রয়াসের ঢেউ ভারত ভূমিকেও স্পর্শ করেছিল। ধীরে ধীরে খৃষ্টধর্ম প্রচারের চেয়েও বড় হয়ে উঠেছে মানবতাবাদ। ম্যালেন্সের কাহিনীতে য়ুরোপীয় এই আন্দোলনের প্রভাব লক্ষ্য করা যাবে। এদেশের খৃষ্টান মিশনারীরা উপলব্ধি করছিলেন, '—some slight thread of story or narrative is indispensible'. ম্যালেন্স সে চাহিদা পূরণ করেছিলেন।[৯২]

উনিশ শতকে ধর্মের বেড়া ডিঙিয়ে সামাজিক জীবনে প্রবেশের কৃতিত্ব নিশ্চিত আলালের। ক্যালকাটা ক্রিশ্চয়ান অবজারভার ম্যালেন্সের সঙ্গে ডিফোর তুলনা করেছে। ম্যালেন্সের গ্রন্থখানির পর প্যারীচাঁদের আলালের ঘরের দুলাল (১৮৫৫), মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের 'সুশীলার উপাখ্যান' (১৮৫৬), লালবিহারী দে,-র 'চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান' (১৮৫৯), 'গোবিন্দ সামন্ত' (১৮৭৪), রমেশচন্দ্র দত্তর-র 'সংসার' (১৮৮৬) এবং 'সমাজ' (১৮৯৩) ও তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা' (১৮৭৪) প্রভৃতি গ্রাম্য

জীবন নিয়ে রচিত হলেও 'গোবিন্দ সামন্ত' ব্যতীত সব গ্রন্থই মধ্যবিত্ত জীবনের কথা। ফুলমণি ও করুণার বিবরণ, সুশীলার উপাখ্যান, চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান—তিনখানি গ্রন্থই খৃষ্টান পাদবির বচনা। ফুলমণি এবং চন্দ্রমুখী অপেক্ষা সুশীলার উপাখ্যানের প্রচাণ বেশি হওয়ার অন্যতম কারণ ভার্ণাকুলার লিটাবেচার সোসাইটির উদ্যোগ এবং পৃষ্ঠপোষকতা। তিনজনের উদ্দেশ্যই এক। খৃষ্টীয় আদর্শে নতুন পরিবার গড়ে তোলা। ম্যালেন্স অন্ত্যজ শ্রেণীকে গ্রহণ করায় তাঁর গ্রন্থ খৃষ্টান সমাজের বাইবে প্রচারিত হয়নি। কিন্তু তাঁর রচনাদর্শের প্রভাব মধুসূদন এবং লালবিহারীব উপর পড়েছিল।

ঈশ্বরচন্দ্র ও অক্ষয়কুমারের সমকালে আবির্ভূত হয়ে লেখিকা সাবলীল গদ্য লিখেছেন। আলালী বা হুতোমী ভাষার মত হোঁচট খেতে হয় না। কাহিনী আটপৌরে ঘরোয়া ভাষায় বিবৃত কবেছেন।

বাক্য গঠনে তিনি চলিত ভাষার কাছাকাছি আশ্রয় নিয়েছেন। তাই তাঁর সাধু ভাষা চলিতের পঙ্‌ক্তি ভোজে আসন পায়। সংলাপ রচনায় তিনি তাঁর পূর্বসূরী কেরি সাহেবের কৃতিত্বকেও ম্লান করে দিয়েছেন। কেরির রচনা নানা সম্প্রদায়ের সংলাপের নমুনা মাত্র। ম্যালেন্স কাহিনীর মধ্যে স্থান কাল পাত্রের মুখে সেই সংলাপ বসিয়েছেন। 'লাস্ট ডে অব্ দি উইক্'-এর লেখিকা ইংরাজী সাহিত্যে কতখানি গুরুত্ব পেয়েছেন, তা আমাদের জানা নেই। তবে ম্যালেন্স বাঙলা সাহিত্যে নানা কারণে পরবর্তীকালেও গুরুত্ব পেয়ে যাবেন।

পাদটীকা

১। নবযুগের বাংলা—বিপিনচন্দ্র পাল, ২য় সং, পৃ—৩১

২। প্রবাসী, মাঘ, ১৩৩৮, পৃ—৫১০

৩। স্বর্ণকুমারী দেবীর গ্রন্থাবলী, 'সেকেলে কথা', বসুমতী সংস্করণ, পৃ—২০৬

৪। ঐ ঐ ঐ

৫। পিতৃদেব সম্বন্ধে আমার জীবনস্মৃতি—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রবাসী, মাঘ, ১৩৬৮, পৃ—৩৮৯

৬। ঐ ঐ ঐ

৭। ঐ ঐ ঐ

৮। পিতৃস্মৃতি—স্মৃতিকথা—সৌদামিনী দেবী—পৃ—৫

৯। সেকেলে কথা—স্বর্ণকুমারী দেবী, বসুমতী গ্রন্থাবলী সং পৃ—২০৮
১০। পৃথিবী—স্বর্ণকুমারী দেবী, ভূমিকা।
১১। পিতৃস্মৃতি—সৌদামিনী দেবী, স্মৃতিকথা, বৈতাণিক প্রকাশনী, পৃ—৬
১২। ঐ ঐ ঐ পৃ—৮
১৩। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ—শিবনাথ শাস্ত্রী, ২য় সং, পৃ—২৪৯
১৪। আমাদের কথা। প্রফুল্লময়ী দেবী, স্মৃতিকথা, বৈতাণিক প্রকাশনী, পৃ—৩০
১৫। ঐ ঐ ঐ পৃ—৩০
১৬। সেকেলে কথা—স্বর্ণকুমারী দেবী, বসুমতী গ্রন্থাবলী সংস্করণ, পৃ—২০৯-১০
১৭। পিতৃস্মৃতি—সৌদামিনী দেবী, স্মৃতিকথা, বৈতাণিক প্রকাশনী, পৃ—৫-৬
১৮। ঐ ঐ ঐ
১৯। দিদিমা—শরৎকুমারী চৌধুরানী, ভারতী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৬, পৃ—৬০
২০। দিদিমার বিরক্তি—শরৎকুমারী চৌধুরানী, ভারতী, ভাদ্র, ১৩১৬, পৃ—২৪১
২১। পিতৃস্মৃতি—সৌদামিনী দেবী, স্মৃতিকথা, বৈতাণিক প্রকাশনী, পৃ—২
২২। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—রমেশচন্দ্র দত্ত, রমেশ রচনাবলী, পৃ—২৩২, ইউনাইটেড পাবলিশার্স।
২৩। বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ—৪৭-৫১
২৪। Morning chronicles, Thursday, Nov. 15, 1855
২৫। D. P. I. Report 1863-64, P-58
২৬। -do- Report, Report of Ishuar Chunda Surma, 1857-58, P—179,
২৭। -do- -do- -do- 1864-65
২৮। -do- -do- -do- 1865-66
২৯। ঐ ঐ
৩০। D. P. I. Report, 1861-62
৫০০ কপি সুশীলার উপাখ্যান দক্ষিণ বাঙলায় বিক্রয় হয়। পৃ—৭৫
৩১। D. P. I. Report, 1861-62, P—72
৩২। Encyclopaedia Britannica, Vol. 23, Women Education, P-704

৩৩। D. P. I. Report, 1867-68

Name	School to which sent	Salary
1. Phulamani	1. Dacca Zenana	Rs. 17
2. Basakha	2. Rajshahi Girls	25
3. Haripriya	3. Commilla „	20
4. Isvari	4. Dacca Zenna	17
5. Radhamani Devi	5. Dacca Normal	10
6. Bhagavati	6. Faridpur Girls	20

৩৪। The Calcutta University Magazine, Vol-II, July, 1865 No-1, P—15.

৩৫। বিদ্যাদর্শন, কার্তিক' ১৭৬৪ শক, সাময়িক পত্রে বাঙলার সামাজচিত্র—বিণয় ঘোষ, ৩য় খণ্ড, পৃ—৪৮৩

৩৬। সম্বাদভাস্কর ২-৮-১৮৫৬ ঐ ঐ

৩৭। Morning chronicles, 1850, 9th oct, Friend of India, 1849, Englishman 1855,

৩৮। Morning chronicle, 1855.

৩৯। ঐ 31st Aug., 1855.

৪০। Friend of India, 1855.

৪১। Morning Chronicle, 8th Sept., 1855

৪২। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ—শিবনাথ শাস্ত্রী, পৃ—২১৩

৪৩। Proceeding of a special Meeting of the Brahma Somaj held on Thursday, 1862

৪৪। Brahma year Book, 1882, P—82

৪৫। Calcutta Review, 1868, Vol-47, P—142

৪৬। The Position of women in Bengali Society. A lecture— Ashutosh Mukherjee, P—22

৪৭। চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান—লালবিহারী দে, ১ম সংস্করণ, ১৮৫৯, পৃ—৭—৮

৪৮। সম্বাদ প্রভাকর—সংখ্যা—৩৭৯০, ৭ই আগষ্ট, ১৮৫০

৪৯ সম্বাদ প্রভাকর—সংখ্যা—২৮. ১১. ১৯৫৬

৫০ ঐ ১লা বৈশাখ, ১২৬৫, পৃ—২০

৫১ ঐ ঐ পৃ—২০

৫২ ঐ সংখ্যা ৮১৫৯, ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৫৯ পৃ—৩—৪

৫৩ Women in France during the Eighteenth century, Julia Kavanagh, P—13

"The prejudice against female authorship, in persons of high rank, was still so strong, that the amiable and accomplished Marchioness of Lambert would never allow her productions to be published. It was only by manuscript copies, obtained from her friends, that the booksellers could succeed in printing them, and on the occassion she bought back the whole edition".

৫৪। D. P. I. Report 1965-66.

৫৫। —do— 1866-67 P—81

৫৬। ঐ ঐ P—81

৫৭। ঐ ঐ P—82

৫৮। ঐ 1865-66

৫৯। Calcutta Review, 1872, Vol. 54, P-L vii

৬০। —do— —do— 1870

৬১। চিত্তবিলাসিনী—কৃষ্ণকামিনী দাসী, ১ম সংস্করণ, পৃ—৫

৬২। চিত্তবিলাসিনী—কৃষ্ণকামিনী দাসী, ঐ পৃ—৯

৬৩। হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা—কৈলাসবাসিনী দেবী, ১ম সংস্করণ, পৃ—১

৬৪। ঐ ঐ ঐ পৃ—২

হিন্দুকলেজের ছাত্র শ্রীদ্বারকানাথ রায় 'স্ত্রী শিক্ষা-বিধান' নামক গ্রন্থে নারীদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার কথা বলেছেন। ১২৬৪, আশ্বিন, পৃ—১১ উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ পাঠাগারে প্রাপ্ত।

৬৫। Calcutta Review, 1849, Miscellaneous notices P—XXVii

৬৬। হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা—কৈলাসবাসিনী দেবী পৃ—২২

৬৭। ঐ ঐ পৃ—৩৬

৬৮। "In a country like Bengal, noble conduct like hers met with opposition, and her family had to endure various kinds of social persecution"—D. P. I. Reports, 1865-66, P—111

৬৯। The crown of Hinduism—J. N. Farquhar, M. A,, P—117

৭০। Characteristics of women—Mrs. Jameson, 1870, P—40

৭১। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস—ডঃ সুকুমার সেন, ২য় খণ্ড, ৫ম সংস্করণ, পৃঃ—৩৪

৭২। বঙ্গসাহিত্যে নারী—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ—৮

৭৩। Calcutta Review, 1870, Vol. 58···

৭৪। Calcutta Review, 1872, Vol. 54, Critical Notices, P-V

৭৫। Calcutta Review, 1869, Vol. 49, P—237

৭৬। Calcutta Revew, 1854, Vol.-23, P—255, Poems by Elizabeth Barreett Browning.

৭৭। The Psychology of women—Helen Deutsch, M. D., 1946, P—151

৭৮। দেশ, ৩৬ সং, ১৩৭০

৭৯। অমৃত, ১৯৭৫

৮০। Calcutta christian observer, Aug. 1852, P—372-383

৮১। Asiatic Journal, 1836, Vol-XVI, P—248

৮২। রেভারেণ্ড লালবিহারী দে ও চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান—ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য, পৃ—৩

৮৩। ঐ ঐ পৃ—৪

৮৪। ফুলমণি ও করুণার বিবরণ—সম্পাঃ চিত্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখিত 'পরিচিতি' দ্রষ্টব্য।

৮৫। Calcutta christian observer, Aug. 1852, P—372-33

৮৬। Calcutta Review, (July-Dec) 1858, Vol-31, P—Lxi

৮৭। বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগর—ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ—১৭

৮৮। The Oriental Baptist, Aug, 1852, P—239-40

৪৫। Ca.. utta christian observer. Aug. 1852, P—372-83

৪৬। The..e Tom's Cabin—H. B. Stowe, Author's preface.

..tta Christian observer, Aug., 1852, P—272-83

৪৭। চন্দ্রমুখী

৪৮। সম্বাদ ও

চতুর্থ অধ্যায়

রোমান্টিক আন্দোলন কেবল মানুষের বস্তুজীবনের ভৌগলিক সীমাকেই প্রসারিত করেনি, আর এক ভিন্নতব ভূগোলের সীমানা বাড়াল। সমাজ ও পরিবারের সঙ্গে আবদ্ধ যে মানুষ তার ব্যক্তি স্বরূপটি বহুক্ষেত্রে অনাবিষ্কৃত থেকে যায়। রোমান্টিক লেখকরা সর্বপ্রথম নারীকে কেবল স্তুতিই করলেন না, তার নারী সত্তার জাগরণ ঘটালেন। এর পিছনে অবশ্য যুগের প্রভাবই ছিল সমধিক। নারী একদিকে বিশ্বগত আর একদিকে ব্যক্তিগত। যখন সে বিশ্বগত তখন সে সকলের সঙ্গী, যখন ব্যক্তিগত তখন নিঃসঙ্গ। ভালবাসার পরিণত অর্থ স্বামী-স্ত্রী, নাবী পুরুষের মিলিত জীবন। নারীর জীবন থেকে ধর্মীয় শৃঙ্খলগুলো আলগা করে দেওয়া হল। না হলে অবাধ প্রেমেব অবকাশ কোথায়। রেনেসাঁস বহির্ধর্মের আন্দোলন, আব রোমান্টিক আন্দোলন মূলতঃ হৃদয় ধর্মের আন্দোলন।

মহর্ষি এবং কেশবচন্দ্রের প্রচেষ্টায় ব্রাহ্মধর্মের মধ্যে 'Revival of Feeling' চলছিল। সাহিত্যে নারীরা পুরুষের পাশে সম গুরুত্ব পাচ্ছে, কিন্তু সমাজ-পরিবারে নয়। প্রমীলা, সূর্যমুখী, কুন্দনন্দিনী ও রোহিণী সাহিত্যে এল, জীবনে কোথায়? তবে নারীর ব্যক্তি স্বাধীনতা ও ব্যক্তি চরিত্র বিকাশের উপযোগী একটা পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে।

য়ুবোপে সামাজিক আন্দোলনে পুরুষের পাশে নারীদের আবির্ভাব ঘটে গেছে। সুইডেনে থোবেল্ড (Thoreld), ফ্রান্সে কনড্রট্ (Condort) এবং ইংল্যাণ্ডে মেরী উইলস্টোন, হিপেল প্রভৃতি লেখিকারা বলার চেষ্টা করছিলেন নারীর শিক্ষার প্রয়োজন শিশুদের লালন এবং নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতার জন্য। এই সংগ্রামের সরণী ধরে ইংরাজী সাহিত্যে ব্রন্টি ভগ্নিদ্বয়, জেন অস্টিন প্রভৃতি লেখিকাদের আবির্ভাব। জেন্ আয়ারের ভূমিকায় এমিলি ব্রন্টি বললেন—"Conventionality is not morality. Self-righteousness is not religion". ব্রন্টি ভগ্নিদ্বয়ের উপন্যাসেতে এই নারী ব্যক্তিত্বের প্রতিধ্বনি শুনতে পাবো। ধীরে ধীরে ভারতীয় সমাজ ও সাহিত্যে নাবীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে দেখা যাবে।

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

গিরীন্দ্রমোহিনী ও স্বর্ণকুমারীর পূর্বে মহিলা সাহিত্যিকদের কৃতিত্বকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। উৎসাহের অনুকূল হাওয়া যতখানি বইয়ে দেওয়া হয়েছিল বিচারের

কষ্টিপাথর ততখানি ব্যবহৃত হয়নি। ইতিপূর্বে নারীদের কাছে সাহিত্য চর্চা ছিল বিরল অবকাশের সীমিত ফসল। সন্তানপ্রসব, সন্তানপালন ও সাংসারিক নানাবিধ কাজের পর সাহিত্য চর্চা। সাহিত্য সাধনার বস্তু হলেও জীবনের মুখ্য সাধনা হয়ে ওঠেনি। মুখ ও মনের অবগুণ্ঠন সমাজ ও সংসারের ঝড়ে হয়তো কখনো কখনো একটু আধটু সরে গেছে। কিন্তু পূর্ণ নারীত্বের পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হয়নি। নারীরা পুরুষের কথাগুলিই বলতে চেয়েছিলেন। গিরীন্দ্রমোহিনী, স্বর্ণকুমারী ও কুসুমকুমারী পুরুষশাসিত সমাজের পাঠক-পাঠিকাকে আকর্ষণ করেছিলেন এবং সচেতন করেছিলেন সমালোচকদের। নারীর রচনায় নারী আর অনুপস্থিত নয়, তবে এ উপস্থিতি দ্বিধাজড়িত চরণে।

"Genius is bi-sexual". তবুও দেশে বিদেশে নারীর রচনায় নারীসুলভ মানসিকতা ও নারীর অনুভবের ভাষার সন্ধান লক্ষ্য করা যাবে। ডিকেন্স এলিয়টের সাহিত্যে নারীত্বের স্পর্শে মুগ্ধ হন। ব্রন্টি ভগ্নীদ্বয়, জেন্ অস্টিন্, জর্জ এলিয়ট ও ভার্জিনিয়া উলফ্-এর রচনায় সমালোচকরা নারীর অভাব-অভিযোগ, সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনার সন্ধানে ব্যাপৃত হন। বাংলা দেশে নারীর স্বাধীনতা সীমিত। সামাজিক পরিমণ্ডল যথেষ্ট উদার হলেও, নারীর লজ্জা ও শ্লীলতা বোধ কলম চেপে ধরেছে। তাদের হৃদয় বাণীর প্রকাশ চকিত। স্বর্ণকুমারীর দীপনির্বাণ পুরুষের রচনা বলে সাব্যস্ত হয়েছিল। স্বর্ণকুমারীর রচনার পুরুষালী-ভাব নারী অনুভবের কথা প্রকাশে প্রতিবন্ধকতা করেছে। নারী রচিত সাহিত্যে আমাদের প্রত্যাশা এই যে, আমরা সেখানে দেখতে পাবো পুরুষের দৃষ্টির বাইরের বৃহৎ জগৎ ও জীবনের অন্তরঙ্গ পরিচয়। যেখানে নারী অধীশ্বরী এবং মুক্ত হৃদয়।

গিরীন্দ্রমোহিনী গোঁড়া হিন্দু পরিবারের বধূ। পিতার কাছে শিক্ষা ও কাব্য পাঠের সূচনা। ইংরাজী ও সংস্কৃত কবিতা পাঠ ও অনুবাদে পিতা উৎসাহ দিতেন। স্বামী সে যুগের শিক্ষিত নব্যযুবক। স্ত্রীকে আধুনিক শিক্ষায় দীক্ষা দিয়েছিলেন। কবির জগৎ ও জীবনের অভিজ্ঞতা খুবই কম। পানিহাটী, মজিলপুর ও বহুবাজার তাঁর গতিবিধির জগৎ। অথচ সাহিত্যে তাঁর সৃষ্টির পরিমাণ নিতান্ত কম নয়। আবির্ভাব কালে সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় যথেষ্ট সমীহ সমালোচনা ও অভ্যর্থনা পেয়েছিলেন।

গিরীন্দ্রমোহিনীর প্রথম রচনা "হিন্দু মহিলার পত্রাবলী" (১৮৭২)। স্বামীকে লেখা পত্রের সমষ্টি। স্বামীর সহযোগিতায় স্বামীর জনৈক বন্ধু গোপনে মুদ্রিত করেন। মিসেস ব্রাউনিং সম্বন্ধেও এমনি একটি গল্প আছে। "It was Mrs. Browning, who held him by the shoulder to prevent his turning to look at 'her

and at the same time pushed a packet of papers into the pocket of his coat. She told him to read that, and tear it up if he did not like it, and then she fled again to her own room".[১] মিসেস ব্রাউনিং এবং গিরীন্দ্রমোহিনীর স্বামী তাঁদের রচনায় মুগ্ধ হয়ে ছিলেন। সেকালের সব লেখিকাকেই স্বামীর সম্মতির দ্বার অতিক্রম করতে হয়েছে।

গিরীন্দ্রমোহিনী 'অশ্রুকণার' কবি বলেই সমধিক পরিচিত। অশ্রুকণার (১৮৮৭) পূর্ব কাব্যগুলিব বিশেষ কোন গুরুত্ব নেই। "The difference is like the difference of one age from another, of one world from another. Something has happened to the authoress, and that something has completely changed her own perspective in relation to the world, and the world's perspective in relation to her".[২]

কবি চাতকিনী মর্তের জলে তাঁর তৃষ্ণা মিটবে না। ফটিক জল চাই। কামনা বাসনা সবই তো রয়ে গেল। রইলো না কেবল স্বামী—ভোগের মাধ্যম। এই পরিস্থিতিতে হিন্দু রমণী ভাগ্যের কাছে আত্মনিবেদন করে সান্ত্বনা খোঁজে। গিরীন্দ্র-মোহিনীরও তাই ইচ্ছা ছিল। আজকের দিনে তাঁর কাব্যগ্রন্থের বহু পাতাই বিবর্ণ বলে মনে হবে। তবুও দুই একটি পাতা সজীব ও সবুজ আছে। এটা কম কথা নয়।

কবি ট্রেডিশনকেই পছন্দ করেন। তাঁর জীবনের প্রধান আকর্ষণ ধর্ম। আধ্যাত্মিক বিশ্বাস মানুষের মনে এমন একটি শক্তি সঞ্চার করে যা নিঃসঙ্গ জীবনে চলার প্রেরণা দেয়। গিরীন্দ্রমোহিনীর মত বিধবারা এই আধ্যাত্মিক বিশ্বাসের জোরেই সমাজের পিচ্ছিল পথ থেকে নিজেদের রক্ষা করতেন। যৌবনের সব ক্ষুধাকে স্বর্গীয় অমৃত রসে সিক্ত করে শান্ত হতেন। তাঁর কাব্য জগৎ সতত আন্দোলিত হয়েছে অকপট নৈতিক ভাবনায়। স্বামীর স্মৃতি ও বিচ্ছেদ বেদনা যুক্ত হয়েছে জগৎ ব্যাপারের সঙ্গে। ঈশ্বরের অস্তিত্ব, স্বর্গ, আধ্যাত্মিক বিশ্বাস সংসারের বাত্যাক্ষুব্ধ ঝটিকায় কবির মন সংশয়াকুল হয়েছে, বিচলিত হয়েছে। বিচলিত হয়েছেন বলেই তিনি সাধিকা নন্—কবি।

কবির অন্তর্জীবনে উঁকি দিলে দেখতে পাবো একটি গর্বিত, কামনাকাতর অথচ পবিত্র হৃদয়। এই কামনা পরলোকগত স্বামীর চারপাশে ক্রৌঞ্চীর মত বিলাপ করেছে। অশ্রুকণা এবং তার পরবর্তী কাব্যগ্রন্থগুলি শোক থেকে জাত হয়ে শ্লোকের সম্মান পেয়েছে।

গিরীন্দ্রমোহিনী ভারতী এবং ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। স্বর্ণকুমারীর সঙ্গে তাঁর সখ্য সর্বজনবিদিত। "ঠাকুর পরিবারের সমস্ত কবিই গীতিকবি"

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে সুরু করে স্বয়ং সম্পাদিকা (স্বর্ণকুমারী) মূলতঃ গীতিকবি।"[৩] ভারতী পত্রিকার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল নবীন লেখক লেখিকাদের উৎসাহ দেওয়া। প্রসন্নময়ী, প্রিয়বালা রায়, প্রমীলা বসু, মোহিনী দেবী, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, সরোজকুমারী দেবী, বিণয়কুমারী, শরৎকুমারী, নিস্তারিণী দেবী, লজ্জাবতী বসুকন্যা, হেমলতা দেবী, আমোদিনী ঘোষ, হিরন্ময়ী দেবী, সরলা দেবী, প্রিয়ংবদা দেবী প্রভৃতি ভারতীতে নিয়মিত লিখতেন। "ভারতীর কাব্যবোধ ভিন্নপ্রকারের ছিল।"[৪] গিরীন্দ্রমোহিনী এই ভিন্ন কাব্যবোধের কবি।

গিরীন্দ্রমোহিনীর প্রথম গ্রন্থ 'জনৈক হিন্দু মহিলার পত্রাবলী' (১৮৭২)। এর পাঁচখানি পত্রের মধ্যে চারখানিই স্বামীকে লেখা। "সেকালের গৃহস্থ মহিলার পক্ষে এ-রকম পত্রের প্রকাশ দুঃসাহসিক ছিল, সন্দেহ নাই।"[৫] প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'কবিতাহার' (১৮৭৩)। গ্রন্থটিতে 'উষা বর্ণন', 'বঙ্গ মহিলাগণের হীনাবস্থা' 'শরৎ বর্ণন' 'সঙ্গিনীর বৈধব্য' ও 'লর্ড মেয়োর অপমৃত্যু'—এই পাঁচটি কবিতা আছে। ভাবে ও ছন্দে কবি বিহারীলালের অন্ধ অনুসরণ করেছেন। 'কবিতাহার' সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন—"ইহার অনেক স্থান এমন, যে তাহা কোন প্রকারেই অল্পবয়স্কা বালিকার রচনা বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না।"[৬] লেখিকার বয়স তখন পঞ্চদশ বর্ষ। তবুও রমণীর রমণীয়তা কাব্যকে স্পর্শ করেনি।

দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'ভারত-কুসুম' (১৮৮২)। 'মনের প্রতি', 'ঈশ্বরের প্রতি', কবিতায় কবির মন উর্দ্ধাচারী হয়েছে। অসুস্থ প্রবাসী স্বামীর জন্য অসহায় মনের আকুতি এবং বেদনার সুর মুখ্য হয়ে উঠেছে। 'বাল্যকাল ও বালিকা' কবিতায় কবি বাল্য স্মৃতি রোমন্থন করেছেন। 'অতি বিষম যৌবন' কবির সব শান্তি ও স্বাধীনতা হরণ করেছে। এখনও পর্যন্ত বিষয় ও বিষয়ী একাত্ম হতে পারছে না। কবি চিত্তের নিভৃতে এখনও কোন তন্ত্রী সংযোজিত হয়নি, মানব জীবনের সুখ দুঃখ যাকে আঘাত করে সুর মূর্চ্ছনা তুলবে।

কবির তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'অশ্রুকণা' (১৮৮৭)। কাব্যগ্রন্থটির কবিতাগুলি নির্বাচন ও সংশোধন করেছেন বিষণ্ণ বেদনার কবি অক্ষয়কুমার বড়াল। গ্রন্থটি উৎসর্গ করেছেন, 'প্রিয়তমেষু'-কে। আজ কবির অশ্রু মান-অভিমানের নয়, দীর্ঘ বিরহের পর মিলনের আবেগাশ্রুও নয়—

এ শোকাশ্রু! নিরাশার যাতনায়-গরল-ঢালা।
এ শোকাশ্রু! বাসনার অনন্ত-পিপাসা-মাখা।
এ শোকাশ্রু! হৃদয়ের উন্মত্ত আবাহন।
এ শোকাশ্রু! জীবনের জন্মান্ত আলিঙ্গন। (উপহার)

কবির শোকাশ্রু 'গরল ঢালা' 'নিরাশার যাতনা' 'বাসনার অনন্ত পিপাসা' 'উন্মত্ত আবাহন' এবং 'জন্মান্ত আলিঙ্গন'—এ তো কবির অস্তিত্বের যন্ত্রণার অশ্রু। ইয়েটসের ভাষায় 'Blood, imagination and intellect running together'.

এ শোক কবির মন, আবেগ তথা অস্তিত্বের জাগরণ ঘটিয়েছে। কবির আবেগে গাণ্ডিক বিষয়টি ছন্দ সুষমায় দোলা পেল। একান্ত আটপৌরে সাধারণ শব্দগুলো পতিহীনা নারীর অস্তিত্বের দ্যোতক হয়ে উঠলো।

কবির মন শাস্ত্র-বিধি নির্দেশ মাথায় নিয়েও মাঝে মাঝে বাসনায় বিহ্বল হয়—

যতনে তনু পিঞ্জরে
রাখিয়াছি সমাদরে,
সুমধুর প্রেমফল
সুবাসিত সুখজল
অতিপ্রিয়-সম্বোধন দিতেছি তাহায়,—
তবু এ হৃদয়-পাখী উড়িবারে চায়।
কি হেতু,—কিসের লাগি,—কিবা বাসনায়? (হৃদয়-পাখী)

বিস্ময় এবং প্রশ্ন কেবলমাত্র ভাবটিকে অনির্দেশের পথে চালিত করেনি। কবির রমণীমনও উঁকি দিয়েছে যত সংকাভরেই হোক। 'দেখা হলে' কবিতায় দেহান্তরে প্রিয়তমের সঙ্গে মিলনের কল্প-চিত্রটিতে দাম্পত্য জীবনের স্মৃতিই গাঢ় রংএ চিত্রিত হয়েছে। 'আহ্বান' কবিতায় কবি আত্মরক্ষাব জন্য দয়াময়কে স্মরণ করেছেন। শূন্য হৃদয়ে কামনা-বাসনা অধীর চঞ্চল হয়ে ওঠে। প্রবৃত্তির দৈত্যরা জীবনের শূন্যতায় তৎপর হয়। 'শুনেছি আঁধার গৃহ, হয় ক্রমে দৈত্যালয়।' কুল-মান মর্যাদার শাসনে গিরীন্দ্রমোহিনী চিরায়ত আদর্শের জগতে নির্বাসিত হন। দেহ না গেলে কামনা বাসনা যায় না। কবি বলে ওঠেন—

শুখায়েছে প্রাণ, আরো সে শুখাক্।
ফাটিতেছে হৃদি আরো ফেটে যাক্।
থাক্ মুখে মুখে,
থাক্ বুকে বুকে
হাসিতে অশ্রুতে হয়ে মাখামাখি। (প্রেম-পিপাসা)

মুগ্ধ নয়ন মোর আঁকে হৃদে যারে তারে,
এই তো গো ক্ষুদ্র হৃদি জানি না কেমন ধরে। (মুগ্ধ-আঁখি)

অনন্ত তৃষিত হৃদি, সীমাবদ্ধ প্রেম-নদী,
কেমনে রাক্ষসী তৃষা করিবে পূরণ,
হায় পিপাসার হবে না মরণ।
পিপাসিত চাতকের তৃষা পুরাইতে
পারে নাক সরসী বিমল। (পিপাসা)

এখনো যে আছে তৃষা, এখনো পিপাসা ভরা,
তেমনি অতৃপ্তি-মাখা সে দুটি নয়ন তারা,
তবে আর কোন মুখে,
আছি গো পাষাণ বুকে
ডাক্ ডাক্ মরণেরে যাক্ নিয়ে মোরে ত্বরা। (বহুদিন পরে)

হৃদে মোর অনন্ত পিপাসা
বুকেতে সমুদ্র ভালবাসা।
প্রাণ ভরে বেসেছিনু ভাল
তার কি গো এই প্রতিফল ?
নেত্রে নাই একবিন্দু জল। (আমি)

সংযমে ও সম্ভ্রমে কবি হলেও ব্যক্তিত্বের কতকগুলি মৌল প্রশ্ন বারবার কাব্যে নানাভাবে এসেছে। কবি বিদ্রোহ না করলেও পীড়িতা। "সে সময় প্রেম প্রণয়ের কথা নিয়ে কবিতা মেয়েরা সাধ্যপক্ষে লিখতেন না, লিখলেও তা নির্লজ্জ হয়ে ছাপতেন না। শোকগাথা, ধর্মগাথা, ভাগবত ভক্তির কাহিনী এই সমস্তই সাধারণতঃ তাঁদের লেখার মর্মকথা ছিল, তবে মিলনানন্দ ও বিরহ ব্যাকুলতা যে তাদের লেখায় একেবারেই স্থান পেত না তা অবশ্য বলা যায় না। ও-বিষয়ে তো আমাদের দেশে আড়াল দেবার সুযোগ কিছু কম ছিল না, শ্রীরাধার মুক্তমালা ছিঁড়ে ছড়িয়ে দিয়ে শ্যামদর্শন করার মতো রাধাকৃষ্ণের মধ্য দিয়েই তো যথেষ্ট হা-হুতাশ করা যায় এবং সেইসঙ্গে পরমানন্দ উপলব্ধি করাও চলে।"[৩৭] গিরীন্দ্রমোহিনীর কাব্যে উনিশ শতকীয় নাগরিক মন ও নীতি-বিপর্যস্ত নারী-ব্যক্তিত্বের প্রকাশ লক্ষ্য করার বিষয়। তাই তাঁর সমস্যা—

এ মোর মনের আশা,
সবে পায় ভালবাসা,
আকুল পরাণ মম একা না রহিতে পারে। (মুগ্ধ-আঁখি)

পুরানো বিশ্বাস ও আদর্শ আজ অচল। প্রেম চিন্তা ও আত্ম-চিন্তাই দানা বেঁধে উঠেছে।

নির্বাণ মুক্তি দিও না আমাকে
মোহান্ধ রমণী আমি— (ভিক্ষা)

অথবা—

বৈরাগ্যের নামে, কভু নির্মমতা, এস না নিকটে মোর।
ভালবেসে সুখ, কেন না বাসিবে, ছিঁড়িবে মমতা ডোর?
তোমার ক্ষমতা সব আছে জানা, গোটাকত শুষ্ক কথা।
উলটী পালটী, তাহাই লইয়া ঘুরাইয়া দাও মাথা।
দিনরাত বুঝি শুকাব পরাণ, কেন বা কিসের তরে? (নির্মমতা)

এ যুগের নারীদের হৃদয়ানুভূতির দাবানলে নিজেদের পোড়াতে হয়েছে। আর্তনাদ এবং দীর্ঘশ্বাসই কাব্যে প্রাধান্য পেয়েছে। গিরীন্দ্রমোহিনীর কৃতিত্ব দাবানলের আলোতে তিনি তাঁর হৃদয়ারণ্যের কিছু অংশ দৃষ্টিগোচর করে তুলতে পেরেছেন। নারী পুরুষের ভালবাসা ও মিলনে নারীর উপলব্ধি, পৃথক এবং নারীর অনুভবের ভাষায় তা নিবেদিত করতে হবে।

এ তার কেমন ভালবাসা
বুঝিতে পারি না, সখি।
আদরে ধরিলে পাণি,
চুমিলে অধর খানি
জলে আঁখি ছল ছল,
বুকে যেন নাহি বল। (নবোঢা)

একখানি বাহু রাখিয়া গলায়
আর হাতে খুলি মুখ,—
থর থর তনু উঠিল কাঁপিয়া
দুরু দুরু করে বুক।
কোথায় তরুণী দুটি বাহুকার
নীরবে ধরিল ঘেরি—
আকুল পরশ পরশে গো কার
চেতনা লইল হরি'। (পুরস্কার)

মনে হয় কে যেন
নীরবে এসে পাশে
বাঁধিয়া ধরেছে বাহু
স্নিগ্ধ বাহু পাশে।
ফিরে যেতে চাহি গৃহে,
চলে না চরণ—
কার এ পরশ-ফাঁদ
সুদৃঢ় এমন। (পরশ-ফাঁদ)

যবে উথলিত অশ্রুনদী
দোঁহার কপোলবাহী
চুম্বনের তলে মিশে,
তখনি জগৎ নাহি। (কণিকা)

উপরের উদ্ধৃতি পড়লেই বোঝা যায় গিরীন্দ্রমোহিনী মেয়েদের মতই ভেবেছেন, মেয়েদের মতই লিখেছেন। বাঙালী সম্পন্ন মধ্যবিত্ত ঘরের বধূ, গৃহিণী হবার মত সর্ববিধ গুণই তাঁর ছিল। কিন্তু বিধাতা বাম। গিরীন্দ্রমোহিনীর কবিতায় প্রেম ও বাৎসল্য রসের 'স্ফুরণ' সমধিক হয়েছে।

কবি আত্ম হৃদয় নিয়ে অনেকগুলি কবিতা লিখেছেন। তার সংখ্যা আট। অশ্রুকণায়—এস, হৃদয়, হৃদয়-পাখী, আভাষ কাব্য গ্রন্থে—পাপীর হৃদয়ে, হৃদয়ের কথা, 'ভারতকুসুমে'—মনের প্রতি, হৃদয়, সিন্ধুগাঁথায়—হৃদয় ও সিন্ধু। হৃদয় সম্বন্ধে কবির নিজের বক্তব্য—"হৃদয়টা আমাদের বিশাল দর্পণ—ইহাতে বিশ্বের ছায়া প্রতিফলিত হয়।"[৩৮] নারীর হৃদয় সম্বন্ধে কবি বলেছেন—'এই কি নারীর হৃদয়। এ যে ঘোর বাড়বাগ্নিময়।' তাই কবির আদেশ—

স্বাধীন হৃদয় শুধু বিড়ম্বনা, নারী দেহে ওরে সখী
আপনার মাঝে ডুবিয়া আপনি পরখি দেখিও দেখি। (কবিযশ)

অশ্রুকণা এবং তারপরবর্তী কাব্যে হৃদয় শব্দের বহুল ব্যবহার এবং তার বিচিত্র প্রকাশ ঘটেছে। এই আত্ম সর্বস্বতার অবশ্যই বাস্তব কারণ আছে। কিন্তু এখানে তা নিষ্প্রয়োজন। দুটি অগ্নিশিখাসহ দুখানি হৃদয়, হৃদয়-কুসুম-কানন, হৃদয়ের আলো, সাধ-ভারা-হৃদি, কিশলয়-হৃদি, হৃদয়-সমুদ্রে, আকুল-ব্যাকুল হৃদি, হতে চায় হৃদি বেদনার সাথী, হৃদয়ের তৃষ্ণা, প্রেম-সিন্ধু সে হৃদয়, হৃদয় বিভল পারা, দুরন্ত হৃদয় মম, পূত হৃদি

পদ্ম গন্ধ ভুবন ভুলায়, প্রফুল্ল-হৃদয়, লাজে ভয়ে লুকায় হৃদয়, আকুলিত হিয়া, হৃদয় দুয়ার খুলি, কারে দিব হৃদয় হায়, হৃদয় স্তম্ভিত, হৃদে মোর অনন্ত পিপাসা, দীর্ঘশ্বাসে রেখে গেছে হৃদয়ের ভার, হৃদয় করিতে পারি জগতের ঘর, হৃদয় কুঞ্জে কুঞ্জে, এমন কঠিন হিয়া আগে না জানি, হৃদয় মন্থিয়া, হৃদয়-বিহারী, হৃদয়ের সাথে করি সদা কাণাকাণি, দগ্ধ হিয়া, হৃদয় হরিণে, হৃদয়-উদাস, পাষাণের বেড়া রুদ্ধ এ হিয়া, হৃদয় মধু, শ্যামল হৃদে, হৃদয় আকাশ, হৃদয় আঁধার, হৃদয় কাতর, দাও হৃদয়ের গ্রন্থি খুলে, দেখিবারে সাধ হৃদয়খানিরে, বাসনা থাকিতে হৃদি কোথা যাবি আর, হৃদয়ে যে আঁধার নাথ দিয়াছ ঢালিয়া, ঘুমাইতেছে ঘুমাক হৃদয়, পারি খুলে দিতে হৃদয়—এ হৃদয়ের সীমা পরিসীমা নেই।

হৃদয় সংশ্লিষ্ট কামনা, বাসনা, পিপাসা, আকাঙ্ক্ষা, তৃষ্ণা প্রভৃতি শব্দেরও একটি তালিকা করা যায়। বিশেষ করে প্রেম, অতৃপ্তি, পিপাসা, তৃষ্ণা, আকাঙ্ক্ষা তুমি, থাক আকাঙ্ক্ষা আমার, পরশ ফাঁদ, প্রেম-পিপাসা, যেতে যেতে, হৃদয়, অলস প্রেম, আমি, নির্মমতা প্রভৃতি কবিতায় ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতার কথা ব্যক্ত হয়েছে। নারীর অনুভবের ভাষা কমণীয় এবং উচ্ছ্বাসবহুল। গিরীন্দ্রমোহিনীর কবিতায় 'বাসনার স্তূপাকার'। খুব কমই 'বাসনা সায়রে মরালী' বা 'বাসনা-চকোর'কে দেখা গেছে।

বাংলা সাহিত্যে নারী রচিত কাব্যের সংখ্যা অধিক। রচয়িতারা সকলেই বিধবা। তখনকার কালে বৈধব্য একটা সাধারণ ঘটনা। নিশ্চয়ই অকাল মৃত্যুর হার বেশি ছিল। কুসুমকুমারী দেবীর 'প্রসূনাঞ্জলি', সরলাবালা দাসীর 'বসন্ত প্রয়াণ', রাজকুমারী অনঙ্গমোহিনীর 'শোকগাথা' শ্রীমতী মৃণালিনীর 'নির্ঝরিণী'—আরো অনেক শোকাশ্রু কাব্যরূপ নিয়েছে নিশ্চয়ই। বুঝা গেল বিদ্যাসাগরের আন্দোলন বৃথা যায়নি। এদের মধ্যে গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ও শ্রীমতী মৃণালিনী দেবীর কাব্য একটু স্বতন্ত্র ধরনের। কবি মৃণালিনী বাল্-বিধবা। তাঁর কবিতায় কামনার তীব্র জ্বালা, বাসনার হুতাশন, একটি 'ভীষণ-যন্ত্রণা' প্রকাশ পেয়েছে।

উঃ কি ভীষণ ব্যথা, হৃদয়ে পশেছে মোর,
পাগল করে কি দেবে মোরে।
জ্বলন্ত আগুন যেন ঢেলে কে দিয়েছে বুকে,
জ্বলে গেল,—গেল বুক পুড়ে।

পুরুষের প্রেম সম্বন্ধে মৃণালিনীর ধারণা—

প্রেম জানে পুরুষ কি কভু নারীর মতন ?
একটুকু বাধা পেলে হায়,
পুরুষের প্রেম ভেঙ্গে যায়,

তাহাদের শুধু ছেলে খেলা প্রণয়-রতন ?
কখনো স্বরগে তারা তোলে,
কখনো পাতালে দেয় ফেলে,
সাগরের তরঙ্গের মত তাহাদের প্রেম।
তারা শুধু মধু ভালবাসে;
ফিরিয়া না দেখে মধুশেষে। (সেমন্তী)

এতদিন পুরুষই নারীর প্রেম সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করে এসেছে। এবার নারীরাও পুরুষের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছে।

নারীর ভুবন তখন পর্যন্ত গৃহের পাঁচিল দ্বারা সীমাবদ্ধ। তাই স্বামী, সন্তান প্রসঙ্গ বড় হয়ে দেখা দিত। গিরীন্দ্রমোহনীর কবিতায় অপত্য স্নেহ প্রাধান্য পেয়েছে। 'গার্হস্থ্য' কবিতাটিতে মাতা ও পুত্রের যে চিত্র পাই তা কবির হৃদয়ের বাৎসল্যের অমৃত রসে সিক্ত।

প্রশান্ত মুখের পরে কালো কেশ উড়ে পড়ে
অলসেতে আঁখি ঢুলু ঢুলু।
মৃদু মৃদু ধীর হাতে, আঘাতি শিশুর মাথে,
গাহে ঘুমপাড়ানিয়া গান।

তারপর—

ছেলে ডাকে আয় চাঁদ মা বলিছে আয় চাঁদ,
কি করিবে চাঁদ মনে ভাবে।
মা নাই ঘরেতে যার, ছেলে কোলে নাই যার,
যত কিছু সব তার মিছে।

'মা-মা' ডাকের মধ্যে যাদু আছে। বাঙালী মা-কে গভীর করে পেতে চেয়ে মাতৃসাধক হয়েছে। মা-র চোখে জল দেখে শিশুর অভিমান—

আমার স্নেহের লতা।
তুমি কি বুঝেছ ব্যথা।
কাঁপিছে অধর পাতা, অভিমানী মেয়ে রে। (ভয়ে ভয়ে)

জননী আপন সন্তানের মধ্যে আনন্দ, কৌতূহল ও বিস্ময়ের সীমা পরিসীমা খুঁজে পায় না। শিশুর হাসি, খেলা, তার ক্ষুদ্র হাত-পা, তার 'ওয়াঁ-ওয়াঁ' ডাক মা-র হৃদয়ে স্বর্গীয় শিহরন জাগায়।

এ হাসির রেখা তার প্রেম লেখা, কচি কিশলয় অধরে—
এ মুখ সৌরভ, কমল গৌরব বুঝি পরাভব করে।
নবনীর গুটী, কচি কচি মুঠি ক্ষুদে পা দুখানি রাঙা।
দুগ্ধ-দাহ খেলা, মায়া জাল মেলা, মাঝে মাঝে 'ওয়াঁ ওয়াঁ'।
(স্নেহ উপহার)

শুধু মেয়েদের লেখা এসব কবিতা নয়, মেয়েদের জন্যও লেখা, এদের পাঠক খুব নেই, আছে পাঠিকা। সন্তানের দুর্নিবার স্নেহের আকর্ষণে মা-র কাছে জগৎ ও জীবনের সব কিছু মিথ্যে হয়ে যায়। জননীব আশা, স্বপ্ন, সাধ সন্তানকে ঘিরে আবর্তিত হয়।

কোথা হতে এলি তুই ওরে ওরে ওরে চোর,
সর্বস্ব লইলি হরি যাহা কিছু ছিল মোর।
কোলের উপরে বসে
হৃদয় লইলি চুষে—
বুকেতে কাটিয়া সিঁধ, এমনি সাহস তোব। (চোর)

গ্রাম্যছবি, গার্হস্থ্যচিত্র, প্রভাতে জলাক্ষেত্র, নিদাঘে, গ্রাম্য সন্ধ্যা, গ্রাম্য-ঝটিকা প্রভৃতি কবিতায় বাঙলাব নিস্তরঙ্গ, শান্তি মমতাময় পল্লী পরিবেশের চিত্র এঁকেছেন। শহর কলকাতার ইঁট-কাঠেব সাজান অট্টালিকা শ্রেণী, পাকারাস্তা, এঁদো গলি কবির কাছে কোন মোহ সৃষ্টি করতে পারেনি। গ্রামের কৃষক বধূর নিকানো দাওয়া, তুলসীর মঞ্চ, জলে হাঁসের খেলা, ধান মাড়াই, ধানের গোলা, ধান শুকানো, জলায় শিশুদের মাছধরা, নথ নাকে ঘোমটা দেওয়া কৃষক বধূ, ঢেঁকিতে পাড় দেওয়া, নিদাঘে নিঃঝুম চাষীর গৃহ কবির পল্লী মমতাবই পরিচয়। কোন কোন কাবিতায় বাল্যস্মৃতির আলিম্পনে নস্টলজিয়া সৃষ্টি করেছে।

গিরীন্দ্রমোহিনীর প্রথম দিকের কবিতায় বিহারীলালের প্রভাব থাকলেও অশ্রুকণা ও পরবর্তী কাব্যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব বিশেষ ভাবে অনুভূত হয়। "গিরীন্দ্রমোহিনীর দুই-চারিটি কবিতা রবীন্দ্রনাথের হাতে সংস্কার লাভ করিয়া ছিল।"[৯] অশ্রুকণার ভূমিকায় দেখি কবিতা নির্বাচন ও সংশোধন করেছেন অক্ষয়কুমার বড়াল। ভারতী লেখক গোষ্ঠী রবীন্দ্রনাথ দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত। 'কবিতাহার' থেকে 'সিন্ধুগাথা' কাব্যগ্রন্থে গিরীন্দ্রমোহিনীর মনের বিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। কাব্যের বিষয় ব্যক্তিগত সুখ দুঃখ বোধ থেকে ক্রমশ বৃহত্তর অঙ্গণে প্রবেশ করেছে। বিধবার দুঃখানুভবের বাইরে সমাজ সংস্কার, পরাধীনতার জ্বালা ও কবি হৃদয়কে কাতর করেছে; 'স্বদেশিনী' (১৩১২) কাব্য গ্রন্থখানি কবি ভারতের স্বদেশ-ভক্ত নর নারীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছেন।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, রাখীবন্ধন উৎসব কবিকে উৎসাহিত করেছিল। 'রাখী সংক্রান্তি' 'বঙ্গচ্ছেদ' কবিতা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে নিয়ে লেখা। হিন্দু মুসলমান ঐক্য কবির কাম্য। তিনি স্বদেশমন্ত্রে নারীদের জাগ্রত করতে চেয়েছিলেন। স্বর্ণকুমারী দেবী ছিলেন গিরীন্দ্রমোহিনী দেবীর বন্ধু। জাতীয় কংগ্রেসের সম্মেলনে প্রতিনিধি রূপে কাদম্বরী দেবী ও স্বর্ণকুমারী উপস্থিত ছিলেন। কবি এঁদের উদ্দেশ্যে 'মিলনগীত' কবিতায় লিখলেন—"আজি ভাই বোনে মিলিয়াছি মোরা, পূজিতে তোমারে জননী।" দেশবাসীকে আহ্বান করে কবি লিখলেন,

"অন্ধের মত দ্বারে বসে বসে
কতই কাঁদিস কাঁদুনী।
কে দিবে তোদের ইপ্সিত রতন
কবে তুলে বল তা শুনি। (আহ্বান গীত, পৃ ৪১৫।)

'মাতৃস্তোত্র' 'বঙ্গ ভঙ্গে কৃষকের গান' রবীন্দ্রনাথের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত। 'আত্ম-দ্রোহিতা' স্বদেশ ভাবনা মূলক দীর্ঘ কবিতা। কবি 'শ্যামাপূজা' ও শ্যামা সঙ্গীত' কবিতা দুটিতে শ্যামাকে চিত্রিত করেছেন—

আসিল যদি শিবের সতী,
অন্নপূর্ণার রূপে ঘরে
তবেই তোরে পূজিবে শ্যামা
দীনা বঙ্গ ভক্তি ভরে।
জঠর জ্বালায় জ্বলে বঙ্গ
রঙ্গ দেখে দহে অঙ্গ
শবাসনা উলঙ্গিনী
খরসান অসি করে। (শ্যামাপূজা)

গিরীন্দ্রমোহিনী পরের অলঙ্কারে সালংকারা হননি, তিনি নিজেও প্রচুর উপমা উৎপ্রেক্ষা তৈরি করেছেন। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া গেল।

"জলভরা মেঘ সহ সদা ভার ভার
হয়ে আছে দিবানিশি হৃদয় আমার।"
"গণ্ডূষ জলে খেলে সফরী"
"বাসনা সায়রে মরালী"
"আম পিপাসায় মরুরে চুমি"
"পূত-হৃদি পদ্ম গন্ধ ভুবন ভুলায়" ইত্যাদি।

তাই গিরীন্দ্রমোহিনী আত্ম সর্বতার কবি নন্। উনিশ শতকে সংস্কার আন্দোলন ও জাতীয় ভাব শুধু পুরুষ সমাজকে নয়, নারী সমাজকেও আকৃষ্ট করেছিল। গিরীন্দ্রমোহিনী এই সাধারণ ও সর্বাত্মক প্রেক্ষাপটে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তাই সাধারণ বিধবা রমণীর মত বৈধব্য যন্ত্রণার সঙ্গীত রচনা করেই তিনি নিঃশেষিত হননি। তাঁর কাব্য তাই ব্যক্তিগত হয়েও বৃহত্তর বাঙ্গালী সমাজের সঙ্গে আলাপচারী হয়েছে।

স্বর্ণকুমারী ও ঐতিহাসিক উপন্যাস

স্বর্ণকুমারী বহুমুখী প্রতিভার অধিকারিণী ছিলেন। উপন্যাস, নাটক, ছোটগল্প, গীতিনাট্য, প্রহসন, কবিতা, গাথা, বিজ্ঞান-বিষয়ক নিবন্ধ, সাহিত্য সমালোচনা, পাঠ্যপুস্তক প্রভৃতি রচনায় তিনি আপনার স্বাক্ষর রেখেছেন। দক্ষতার সঙ্গে দীর্ঘদিন তিনি ভারতী পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। সংবাদ প্রভাকর ও বঙ্গদর্শনের মতই ভারতীকে কেন্দ্র করেও একদল নবীন লেখক গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটেছিল। ভারতী গোষ্ঠী একটি স্বতন্ত্র ধারার সৃষ্টি করেছিল। আবার ভারতীতে লেখিকাদের একটি বিশেষ স্থান ছিল। স্বর্ণকুমারীর সমকাল ও পরবর্তীকালের অধিকাংশ লেখিকাদের আবির্ভাব ভারতীর পৃষ্ঠায়। অন্য পত্রিকায় নিশ্চয়ই তাঁদের লেখা প্রকাশিত হত, কিন্তু ভারতীতে তাঁদের অধিকাংশ রচনার প্রকাশ।

লেখিকাজীবন শুরু করার পূর্বেই স্বর্ণকুমারী নিজেকে কিছুটা তৈরী করে নিয়েছিলেন। ইংরাজী, বাংলা এবং সংস্কৃত অধ্যয়ন করেছিলেন। দেশী বিদেশী সাহিত্য পাঠে তাঁর চিত্তোৎকর্ষ ঘটেছে। ঠাকুর পরিবারে সাহিত্য চর্চায় তিনি অগ্রজদের স্নেহধন্যা।

১৮৭৫ সালে রমেশচন্দ্র দত্তের 'মাধবী কঙ্কণ' এবং স্বর্ণকুমারী দেবীর 'দীপ নির্বাণ' প্রকাশিত হয়। দীপ নির্বাণ প্রভাবিত হতে পারে বঙ্কিচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাস এবং রমেশচন্দ্রের 'বঙ্গ বিজেতা' (১৮৭৩) দ্বারা। বঙ্গ বিজেতা সম্বন্ধে সমালোচকের মন্তব্য—"ইহা একেবারে শুষ্ক নীরস প্রাণহীন, কোন স্কুলপাঠ্য ইতিহাস হইতে সঙ্কলন বলিয়া মনে হয়। জীবনের বেগবান স্পন্দন ইহার মধ্যে নাই।"[১০] এই উপন্যাসের ভাষা ও প্রকাশ ভঙ্গির সঙ্গে বঙ্কিমের ভাব, ভাষা ও প্রকাশ ভঙ্গির এমন কি শব্দ প্রয়োগেরও সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যাবে।"[১১] সুতরাং স্বর্ণকুমারী প্রভাবিত হলে বঙ্কিমের দ্বারাই হয়েছেন। ঐতিহাসিক উপন্যাসের মধ্য দিয়ে তাঁর গদ্য চর্চা এবং লেখিকা জীবনের সূত্রপাত।

স্বর্ণকুমারীর পূর্বসূরী নবীনকালী দেবী ও সুরাঙ্গিনা দেবী সামাজিক ও ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করে ছিলেন। সুরাঙ্গিনা দেবীর 'তারাচরিত' (১৮৭৫)-এর পটভূমিকা ইতিহাস। স্বর্ণকুমারী সুরাঙ্গিনা দেবীর মত নবম থেকে একাদশ শতকের ইতিহাস বেছে নিয়েছেন। ঘোরী-পৃথ্বিরাজ সংঘর্ষ তাঁর উপন্যাসের বিষয়বস্তু। বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত করেছেন, 'হিন্দুব অবনতির কথ.'। হিন্দুব শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করা তাঁর উদ্দেশ্য। সন্ধানীর দৃষ্টি নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করেছেন এবং উপন্যাসের পাদটীকায় সেগুলি উদ্ধৃত করেছেন। লেখিকার ইতিহাস জ্ঞান ক্যালকাটা রিভিয়ু পত্রিকায় প্রশংসিত হয়েছিল। "The introduction proves the authoress to be a very learned student of Indian history and antiquities. Perhaps the excellence of her work is in a great measure due to her extensive knowledge of her country's history."[১২]

ঘোরী-পৃথ্বিরাজের ঐতিহাসিক কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে চিতোর রাজের পারিবারিক জীবন এবং স্বদেশহিতৈষণা। দিলীপ-শৈলবালা, কল্যাণ-উষাবতী প্রণয়কথা ইতিহাসের ঘূর্ণাবর্তে জটিলতার সৃষ্টি করেছে। উষাবতী দেহহীন একটা ভাব মাত্রা চরিত্রটির চারপাশে নম্রতা, শালীনতা, স্নিগ্ধতার বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে। উষাবতী জীবনে কিছু একটা পেতে চায়, কিন্তু পাবার জন্য সক্রিয় হতে জানে না। শৈলবালার মধ্যে বঙ্কিমের মৃণালিনী ও বিমলার ছাপ সুস্পষ্ট। প্রভাবতীর চরিত্র তত উজ্জ্বল নয়। সমকালের সমালোচকরা অবশ্য শৈলবালার মধ্যে স্বর্ণকুমারীর অন্তরের প্রতিচ্ছবি দেখতে পেয়েছেন। "She speak, of great and sublime things in the simplicity, music and eloquence of her style. She speaks of great and sublime things in the simplest of words and in sofar resembles her Sailabala. Perhaps this is the reason why without much necessity she has introduced Sailabala into her story. It was her kind wish that her readers should know something about herself".[১৩]

স্বর্ণকুমারীর ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি হিন্দুমেলার পরবর্তীকালের রচনা। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ হিন্দুমেলার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে নাট্যরচনা করেছিলেন। "ঠাকুর-বাড়ীর স্বাদেশিক আদর্শের মধ্যে বর্ধিত হইয়া এবং নবগোপাল মিত্র প্রবর্তিত হিন্দুমেলার সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে জড়িত থাকিয়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্বাদেশিক চেতনাকে নিশ্বাস প্রশ্বাসের মত সহজভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন।"[১৪] তারই ফসল ১৮৭৪ সালে প্রকাশিত 'পুরুবিক্রম' নাটক। পুরুবিক্রমের সমালোচনায় বলা হল, "গ্রন্থকর্তা কেবল স্বদেশানুরাগের

স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছেন। মানব হৃদয়-সিন্ধুর মধ্যে ডুবিতে অধিকক্ষণ সময় দেন নাই।"[১৫] দীপনির্বাণ পড়ে সত্যেন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল 'জ্যোতির জ্যোতি কি প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে।'[১৬] এ জাতীয় মন্তব্যের কারণ, সত্যেন্দ্রনাথ ইতিপূর্বেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'পুরুবিক্রম' পাঠ করেছেন। পুরুবিক্রমের মত দীপনির্বাণও অনালোচিত-বিতর্কিত একটি কালের পটে আত্মকলহ ও গৃহশত্রুতার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। পুরুবিক্রমে ঐলবিলা তক্ষশীলা এবং অম্বালিকা সেকেন্দর প্রাধান্য পেয়েছে। এ প্রণয় কিন্তু নারীজাগরণের ফলে নূতন মূল্যবোধে দ্যোতিত হয়েছে। সর্বশেষে অম্বালিকার ট্রাজেডীই হৃদয় কেড়ে নেয়। দীপনির্বাণেও শৈলবালা-কিরণ সিংহ, উষাবতী, কল্যাণ সিংহ, প্রভাবতী-চন্দ্রপতি প্রণয় কাহিনীগুলি যথেষ্ট প্রাধান্য পেয়েছে। উষাবতীর জীবনের করুণ ট্রাজেডী উপন্যাসের পরিণামী সংবেদনার সৃষ্টি করেছে। ভাষা মার্জিত ও শালীন। 'নারীসুলভ স্পর্শকাতরতার মৃদু আন্দোলনে'[১৭] বঙ্কিম-রমেশ থেকে একটু ভিন্ন স্বাদ এনে দিয়েছে। বঙ্কিম-রমেশ-ইন্দ্রনাথ-দামোদরের পাশেই লেখিকা স্থান পেয়েছেন।

'But I can not refrain from naming Indranath Banerjee, Damadher Mookherjee and the talented authoress of 'Dipa Nirban'.[১৮]

হিন্দুমেলা প্রতিষ্ঠার পর জাতীয়তা বোধ ও দেশ হিতৈষণার জোয়ার এসেছিল। ১৮৭২ সালে হিন্দুমেলার উদ্যোক্তরা জাতীয় সভা স্থাপন করেন। ১৮৭২-৭৬ সাল সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আনন্দমোহন বসুর অভ্যুত্থানের কাল। এই বিশেষ পর্বের ইতিহাস অবলম্বন করে নাটক রচনা করলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং উপন্যাস রচনা করলেন রমেশচন্দ্র এবং স্বর্ণকুমারী। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক নাটকগুলির প্রকাশ কাল পুরুবিক্রম (১৮৭৪), সরোজিনী (১৮৭৫), অশ্রুমতী (১৮৭৯), এবং স্বপ্নময়ী (১৮৮২)। রমেশচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসের রচনা কাল ১৮৭৪-৭৯ সাল। তিনি বঙ্গবিজেতা (১৮৭৪), মাধবীকঙ্কণ (১৮৭৭), মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত (১৮৭৫), রাজপুত জীবনসন্ধ্যা (১৮৭৯)—এই চারখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেন। স্বর্ণকুমারী দেবীর ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির প্রকাশ কাল 'দীপনির্বাণ' (১৮৭৬), মিবাররাজ (১৮৭৭), বিদ্রোহ (১৮৯০) এবং ফুলের মালা (১৮৯৪)। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রমেশচন্দ্রের ইতিহাস বোধ ছিল ভিন্ন। জ্যোতিরিন্দ্র ইতিহাসকে ব্যবহার করার কৈফিয়ৎ দিয়েছেন—"হিন্দুমেলার পর হইতে কেবলই আমার মনে হইত—কি উপায়ে দেশের প্রতি লোকের অনুরাগ, ও স্বদেশ

প্রীতি উদ্বোধিত হইতে পারে। শেষে স্থির করিলাম, নাটকে ঐতিহাসিক বীরত্বগাথা ও ভারতের গৌরবকাহিনী কীর্তন করিলে, হয়ত কতকটা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে"।[১৮ক] রমেশচন্দ্রের ইতিহাস বোধ একটু স্বতন্ত্র ধরনের। "পাঠক। একত্র কবিয়া এক একবার দেশীয় গৌরবের কথা গাইব, আধুনিক ও প্রাচীন সময়ের বীরত্বের কথা স্মরণ করিব, কেবল এই উদ্দেশ্যে লেখনী ধারণ করিয়াছি। যদি এই সমস্ত কথা স্মরণ করাইতে সক্ষম হইয়া থাকি তবেই যত্ন সফল হইয়াছে, নচেৎ আমার পুস্তকগুলি দূরে-নিক্ষেপ কর, লেখক তাহাতে ক্ষুন্ন হইবে না।"[১৮খ] রমেশচন্দ্রের কল্পনা তাই সর্বগ্রাসী হতে পারেনি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কল্পনা অবাধ সঞ্চরণের ফলে কাহিনীর সৌষ্ঠব বাড়লেও সার্থক নাটক হল না। স্বর্ণকুমারী জ্যোতিরিন্দ্রনাথের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন এবং বঙ্কিমের ঐতিহাসিক উপন্যাসের আদর্শের দ্বারস্থ হয়েছেন। রমেশচন্দ্র সমসাময়িক কালের ভাবনা ও আদর্শের তাগিদকে প্রাধান্য দেননি। জ্যোতিরিন্দ্র ও স্বর্ণকুমারীর কাছে কালের ভাবনা ও আদর্শই বড় কথা ছিল।

দীপনির্বাণের তিন জোড়া প্রণয় কাহিনী ইতিহাস বহির্ভূত। সম্ভবতঃ লেখিকা এ ব্যাপারে বঙ্কিম দ্বারা প্রভাবিত। "উপন্যাসে সকল কথা ঐতিহাসিক হইবার প্রয়োজন নাই"।[১৯] বঙ্কিম এ তত্ত্ব নিজে প্রচার করলেও রাজসিংহকে তাঁর একমাত্র ঐতিহাসিক উপন্যাস বলে বিবেচনা করেছেন। সাহিত্যের বা যুগের প্রয়োজনে ঐতিহাসিক সত্যটিও পরিবর্তিত হতে পারে। "Our historical sense that even the most public stories change their meaning from one era to another."[২০]

বঙ্কিমের রাজসিংহের ঔরঙ্গজেব আর ডি. এল. রায়ের শাজাহানের ঔরঙ্গজেব নিশ্চয়ই এক নয়। যুগে যুগে ইতিহাসকে কালের প্রয়োজনের লীলাভূমিতে নেমে আসতে হয়। "Where the event of a great action is left doubtful, there the poet is left master."[২১]

কল্পনার অবাধ সঞ্চরণে তো কোন বাধা নেই। স্বর্ণকুমারী ইতিহাসের সেই তমসাচ্ছন্ন কালের জীবন কথা কল্পনায় ভরিয়ে তুলতে চেয়েছেন। তাঁর উপন্যাস রচনা-কালে ইতিহাস সন্ধানের কাজ কেবল আরম্ভ হয়েছে। উপকথা, প্রবাদ, লোকগাথা, কিম্বদন্তীর মধ্য থেকে ইতিহাস জন্ম নিচ্ছে। তিনি প্রচলিত ইতিহাস গ্রন্থগুলি এবং লোক কবির গাথার উপর নির্ভর করেছেন। জাতীয় জীবনের বিশেষ এক মুহূর্তে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচিত হয়। তখন তার মধ্যে বিশেষ একটি উন্মাদনা প্রাধান্য পায়। ঐতিহাসিক উপন্যাসে সেই প্রেরণা সঞ্চারিত হয়। ঐতিহাসিক

উপন্যাস বা নাটকের ক্ষেত্রে বড় হয়ে ওঠা উচিত অতীত ও বর্তমানের 'emotional identification'. নারীর প্রতি রূপমুগ্ধ পুরুষের স্বাভাবিক দুর্বলতার গাঢ় বর্ণ চিত্রের মধ্যে দিয়ে লেখিকা যেখানে নিয়ে গেছেন তা আদিরসের গুপ্তপর্বত নয়। নারী হৃদয়ের ঈর্ষা, দ্বেষ, মোহ, মাদকতা কেমন করে মহৎ ব্যক্তিদের পতন ঘটায় এবং নিজের প্রেমের অগ্নিতে কিভাবে সতীর মত নিজেকে ভস্মীভূত করে, তারই অত্যন্ত বাস্তব ও আদর্শ চিত্র। এরই মধ্যে এসে পড়েছে নিভৃত অন্তঃপুরের কিছু সুবাস।

পৃথ্বিরাজ, রাজমহিষী, রাজকন্যা ঊষাবতী, রানা সমরসিংহ, যুবরাজ কল্যাণসিংহ ও কিরণসিংহ ঐতিহাসিক ব্যক্তি। বিজয়সিংহের গুপ্তঘাতকতা, ষড়যন্ত্র প্রভৃতি ঐতিহাসিক ঘটনা।

সে যুগের পাঠক এবং সমালোচকরা দীপনির্বাণকে বাঙলা সাহিত্য একটি সংযোজন বলেই মনে করতেন। আশ্চর্য! লেখিকার বয়স তখন কুড়ি বৎসর।

১২৯৪ সালে 'হুগলীর ইমামবাড়ী' রচিত হয়। সালাউদ্দিন-মুন্না-রোসেনারা প্রণয় বৃত্তান্ত প্রাধান্য পেয়েছে। রোসেনারার প্রেমে মত্ত সালাউদ্দিন আপন স্ত্রী মুন্নাকে মানসিক ও দৈহিক পীড়ন করতো। একদিন সে বুঝলো রোসেনারার দেহকে পেলেও মনকে পায়নি। সুস্থ জীবনে ফিরে আসার চেষ্টা করলেও তা সম্ভব হয়নি। উপন্যাসটির শেষে ভ্রাতা-ভগ্নীর সুন্দর সম্পর্কটি পাঠককে মুগ্ধ করে। স্বর্ণকুমারীর উপন্যাস, ছোটগল্প ও নাটকে ভ্রাতা-ভগ্নীর মধুর সম্পর্কের চিত্র বারবার ফিরে এসেছে। হাসি-গুহা, মালতী-রমেশ, স্নেহ-চারু, প্রমোদ-কণক, 'অমরগুচ্ছ' গল্পের সিভিলিয়ান দাদা-বিধবা ভগ্নী, রাজকন্যা নাটিকার ধ্রুব-রাজকন্যা প্রভৃতি চিত্রগুলির মধ্যে সত্যেন্দ্র, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের তাঁর প্রতি স্নেহ এবং কনিষ্ঠদের তাঁর প্রতি আকর্ষণের কথা নানা ভাবে বারবার বলেছেন। নারী শিল্পীর সীমিত ভুবনের প্রতি আসক্তি বলে একে তুচ্ছ করা যায় না।

'মিবাররাজ' (১৮৭৭) বাঙলা ঐতিহাসিক উপন্যাসের ধারায় একটা ভিন্ন স্বাদ এনেছে। মিবাররাজের নায়ক গুহা রাজপুত কিন্তু পালিত হয়েছে ভীলদের মধ্যে। স্বর্ণকুমারীর একাধিক উপন্যাস ও ছোট গল্পে নায়ক নায়িকারা পালিত বা পালিতা। গুহা, স্নেহলতা, মালতী, শরৎকুমার, ধ্রুব প্রভৃতি চরিত্রগুলি লালিত হয়েছে অন্যত্র। লেখিকা ভীলদের জীবনযাত্রার বিশ্বস্ত চিত্র তুলে ধরেছেন। ভীলদের গ্রাম, গ্রামের পথ, অরণ্য, মৃগয়া, আচার আচরণ, সামাজিকতা, উৎসব, সর্বোপরি তাদের আতিথেয়তা, সরল বিশ্বাস, সহজ ও সুন্দর জীবনযাত্রা প্রভৃতির বর্ণনায় লেখিকার বাস্তব দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। গুহার শিকার থেকে ফেরার বর্ণনা, গুহার রূপের বর্ণনায় লেখিকা যথেষ্ট পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। কথাবার্তা, আচার-আচরণ, পোষাকে সে ভীল। গুহার মধ্যে

সুপ্ত রাজপুত রক্তের কৌলীন্য তাকে সব ভীলকুমারদের থেকে পৃথক করেছে। দলপতি হবার জন্যই যেন তার জন্ম। গুহার রাজোচিত আচরণ ও বীরত্ব সহচরীদের আকর্ষণ করে। সহচরীরা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই গুহার কপালে রক্তের তিলক পরিয়ে দিয়ে রাজপদে বরণ করে। কাহিনীর মূল দ্বন্দ্ব ভীলপুত্র তালগাছ ও গুহার মধ্যে। হীনচেতা তালগাছ, গুহার বীরত্ব সহ্য করতে পারেনি। ভীলবালকদের গুহার প্রতি আকর্ষণ তার হৃদয়ে বেদনার সঞ্চার করেছে। সে সহ্য করতে পারেনি পিতা মন্দালিকের গুহার প্রতি অপত্যস্নেহের আধিক্যকে। ধূমায়িত বেদনা ঈর্ষায় রূপান্তরিত হয়েছে। ঈর্ষা প্রতি-হিংসার অগ্নিকে উসকিয়ে দিয়েছে। তাতে নিহত হয়েছে পিতা এবং আত্মহত্যা করেছে নিজে। পিতা মন্দালিকের চরিত্রে স্নেহ ও কর্তব্যের দ্বন্দ্ব সুন্দর ভাবে চিত্রিত হয়েছে। সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণীর সত্যপ্রীতি এবং সমাজের মূল্যবোধগুলির প্রতি আনুগত্য স্বাভাবিক ঘটনা। মন্দালিক দলপতি রূপে কোন দুর্বলতাকেই প্রশ্রয় দেয়নি। একদিকে পিতৃহৃদয় আর একদিকে কঠিন কর্তব্যের আহ্বান, মন্দালিক কর্তব্যের কাছেই আত্মসমর্পণ করেছে। ভীলজাতির একান্ত বাসনাকেই প্রতিষ্ঠা দিয়েছে।

ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'মিবাররাজ'-কে উপন্যাস বলেই গণ্য করেছেন।[২২] ডঃ পশুপতি শাসমল বঙ্কিমের 'যুগলাঙ্গুরীয়', 'রাধারাণী'র মত বড় গল্প বলে সাব্যস্ত করেছেন।[২৩] কাহিনীর আয়তনই কেবল ক্ষুদ্র নয়, ঘটনা বিন্যাসও স্বল্প।[২৪] এই ইতিহাসের মধ্যে রাজ্য, রাজনীতির ঘনঘটা নেই, কূটকৌশল নেই, নেই প্রণয়ঘটিত রোমান্সের চিত্র। উপন্যাসটিতে কোন নারীচরিত্র নেই বললেই হয়। এই উপন্যাসে অবশ্য তাঁর নারী মনের বিশেষ পরিচয় ফুটে ওঠেনি।

'মিবাররাজের' তিন বৎসর পর 'বিদ্রোহ' (১৮৯০) প্রকাশিত হয়। অল্প সময়ের ব্যবধানে 'হুগলীর ইমামবাড়ী' (১৮৯৪) এবং 'স্নেহলতা' (১৮৯৩) প্রকাশিত হয়। 'বিদ্রোহ' এবং 'ইমামবাড়ী'তে প্রেম নারীজীবনের অস্তিত্বের দ্যোতক হয়ে উঠেছে। মুন্না এবং সুহারের জীবনের ট্রাজেডী বহুল পরিমাণে পরিবেশ ঘটিত। বিদ্রোহ, ইমামবাড়ী ও স্নেহলতা উপন্যাসের নারী চরিত্রগুলি উনিশ শতকীয় আদর্শ ও মর্যাদাবোধে উদ্বুদ্ধ। কেবলমাত্র দেহগত আকর্ষণে তারা ধরা দিতে প্রস্তুত নয়। ইতিহাস তার উপকরণ, কিন্তু details-এর ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। অনেক সময় এত পুঙ্খানুপুঙ্খ বাস্তব জীবনের বর্ণনা ইতিহাসের পক্ষেও বিপদজনক হয়ে উঠেছে। নারীর স্বাভাবিক বিকাশের ক্ষেত্রই হল পরিবার। লেখিকার উপন্যাসগুলির সবচেয়ে আকর্ষণীয় স্থানগুলি পারিবারিক রসে সঞ্জীবিত। স্বর্ণকুমারীর প্রতিভার মূল ক্ষেত্র সামাজিক উপন্যাস।

সেমন্তী ও সুহারের প্রেমে ট্রাজেডী নেমে এসেছে নাগাদিত্য ও সেমন্তীর জীবনে।

বঙ্কিমের সামাজিক উপন্যাসের প্লটের ছায়াপাত ঘটেছে। সেমন্তী ও সুহারের সমস্যা তিনি পুরুষের দৃষ্টিকোণ থেকে মীমাংসা করেছেন।

রাজা ও সুহারের প্রণয় কাহিনীর মধ্যে রোমান্টিক ভাবের যেমন সার্থক জাগরণ ঘটেছে তেমনি দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্য দিয়ে ধূলি ধূসরিত জীবনের পথে রক্তাক্ত পায়ে চলার চিত্রও বাস্তব। রাজা ও সুহারের প্রেমের বিভিন্ন চিত্রের মধ্যে তাদের আত্ম-আবিষ্কারের প্রবণতা স্নেহলতা উপান্যাসেও সঞ্চারিত হয়েছে।

নির্জন নিকুঞ্জে সুহারকে দেখে রাজার মনে হয়েছিল বনদেবী। রাজা অস্ফুট স্বরে বলে উঠেছিলেন, 'ভালবাসিবার সামগ্রী বটে'। রাজাকে দেখলে সুহারের নব উন্মেষিত নারীত্বের বয়ঃসন্ধিব সসঙ্কোচ লজ্জার দৃশ্যটি হৃদয়গ্রাহী—"বালিকাদিগের হঠাৎ বিবাহের পর দিন যেমন যুবতীর লজ্জার ভাব আসিয়া পড়ে, আগের দিন সে সকল পরিচিত পুরুষেব সহিত অসঙ্কোচে কথা কহিয়াছে,—তাহাদের নিকট দিয়া যাইতেও যেমন ঘোমটা না টানিয়া তাহারা থাকিতে পারে না, সেইরূপ কি এক সঙ্কোচ কি এক লজ্জাব ভাবে বালিকা বদ্ধপদ হইয়া দাঁড়াইল। সে জানে কেন তাহার এই লজ্জা। সে ত শুধু ফুল কুড়াইতে যাইতে চায়—শুধু ফুল তুলিতে। আর কোন কারণ নহে, তবে কেন ত'হার এত লজ্জা।" (পৃঃ—১৪৩)। এর বিপরীত চিত্র পাব স্নেহলতায়। স্নেহের বয়ঃসন্ধিক্ষণের একটি ভাবনা উদ্ধৃত করছি—

"স্নেহের বড় ইচ্ছা করিতে লাগিল, সে মরে, চারুকে কাঁদাইবার জন্যেই মরে··· সে কেবল নিজের মৃত্যু কল্পনা করিয়া নিজেই কাঁদিয়া আকুল হইতে লাগিল।" (পৃ-১৩)। দুজনেরই বয়স এক। একজন প্রেমের জাগরণের সুখস্বপ্নে বিভোর, আর একজন প্রেমের ক্ষেত্রে আঘাতের বেদনায় কাতর।"

চারুর সঙ্গে স্নেহের মিলনের বাধা দুটি। একটি তার বৈধব্য, অপরটি তার পরিবেশ। সুহারের মিলনের পথের বাধা তার হীনমণ্যতাবোধ এবং রাণী সেমন্তী। একদিন সেমন্তী আবিষ্কার করলো সবই রাজার ছলনা, স্নেহলতার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল।

যেটুকু তফাৎ তা মাত্রাগত। ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলিতে বিশেষ করে 'বিদ্রোহ' এবং 'হুগলীর ইমামবাড়ীতে' ঘটনা সংস্থাপন এবং তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চিত্রনে সামাজিক উপন্যাসের ছকটিই ব্যবহার করেছেন। এইজন্য পারিবারিক ও ব্যক্তি-জীবনের প্রাত্যহিকতা প্রাধান্য পেয়েছে। রমণীর রমণীয়তা প্রধান হয়ে উঠেছে। বঙ্কিমের সঙ্গে মিলিয়ে পড়লেই বোঝা যাবে কোথায় এর পার্থক্য।

স্বর্ণকুমারীর সামাজিক উপন্যাস

উনিশ শতকের শেষে সমাজসংস্কার আন্দোলন বহুমুখী হয়েছে। শ্মশানের চিতা থেকে সতীকে উদ্ধারের মধ্য দিয়ে যে আন্দোলনের সূত্রপাত, পতিতালয় থেকে নারীকে তুলে এনে সমাজে সুস্থ জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার মধ্য দিয়ে সেই আন্দোলন পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। নূতন মূল্যবোধ লালনের জন্য নূতন গৃহ ও পরিবার গড়ে উঠেছে। মানুষের প্রতি মানুষের সহানুভূতির ভুবন বিস্তৃত হচ্ছে। শিল্পীর কল্পনা সর্বগ্রাসী হয়ে জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে রহস্যের সন্ধানে ব্যাপৃত হল। নারী ব্যক্তিত্বের বিস্ময়কর প্রকাশ ঘটছিল। এই নারী ব্যক্তিত্বের উচ্চারণ—"নিজের মাতা, ভগিনী, স্ত্রী প্রভৃতিকে যথাযোগ্য রূপে আত্মশাসন ক্ষমতা প্রদত্ত হউক, পরে স্বয়ং রাজ্য-শাসনে অগ্রসর হইবেন। দেশহিতৈষী সামাজিকদিগের নিকট মহিলাগণের এই প্রার্থনা।"[২৫] দ্বিধাহীন কণ্ঠে ধিক্‌কার জানালেন কুণ্ঠাহীন পৌরুষকে—"আপনি মনুষ্য নামের অধিকারী হইয়া কি করিতেছেন? আপনার গৃহমধ্যে দশমবর্ষীয়া কন্যা ও একাদশবর্ষীয়া পুত্রবধূ শোচনীয় বৈধব্যের মলিন বেশে। কলপ দিয়া রূপার তারে দাঁত বাঁধিয়া পঞ্চাশৎ বৎসর বয়সে বালিকার পার্শ্বে শঙ্কোচিত হইয়া দণ্ডায়মাণ হইতেছেন। ছি। ছি। আপনার কি লজ্জা হইতেছে না?"[২৬]

স্বর্ণকুমারী দেবীর সামাজিক উপন্যাস রচনার পূর্বেই সতীদাহ, বিধবাবিবাহ আইন পাশ হয়েছে, বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ নিয়ে কমিশনের রায় প্রকাশিত হয়েছে, ব্রাহ্মবিবাহ বিল এবং সহবাসসম্মতি সূচক আইন গৃহীত হয়েছে। ব্রাহ্মবিবাহ বিল নারী জীবনে বিশেষ কতকগুলি সুযোগ এনে দিল। বিবাহের সর্বনিম্ন বয়স, মনোনয়ন, বিবাহবিচ্ছেদ এবং অসবর্ণ বিবাহের পথ প্রশস্ত হল। অবলাবান্ধব সম্পাদক দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত 'হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়' (১৮৭৬) একদল উচ্চশিক্ষিতা সমাজসেবিকার সৃষ্টি করলো। কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়, সরলা রায় ও খৃষ্টান চন্দ্রমুখী এনট্রান্স পরীক্ষার সুযোগ পেলেন। নারীদের উচ্চশিক্ষার দ্বার খুলে গেল। ১৮৭৮ সালে মনোরমা মজুমদার সমাজের আচার্যারূপে মাঘোৎসবের উপাসনা পরিচালনা করলেন। ইতিপূর্বে অন্নপূর্ণা চট্টোপাধ্যায় বগুড়ার পারিবারিক ব্রাহ্মসমাজে আচার্যার আসন অলঙ্কৃত করেন। ঢাকা, বরিশাল, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, যশোহর, সিলেট প্রভৃতি অঞ্চলে নারীশিক্ষা ও অন্তঃপুর শিক্ষার জন্য সমিতি গড়ে উঠলো। ১৮৮০ বেঙ্গল লেডিস্ এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হল। পণ্ডিতা রমাবাঈ বাঙলাদেশে এসে দ্বারকানাথ ও শশীপদের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়ে

বোম্বাইতে আর্য মহিলা সমিতি গড়ে তুললেন। বাঙলা ও বোম্বায়ের মধ্যে নারীমুক্তি আন্দোলনের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ হল।

অনুরূপা দেবী স্বর্ণকুমারীর সামাজিক উপন্যাস আলোচনা প্রসঙ্গে সে যুগের সমালোচকদের সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ উত্থাপন করেছেন।

"ললিতকুমার প্রভৃতি কয়েকজন নিরপেক্ষ সমালোচক ভিন্ন, বিশেষ করে আধুনিকরা ত তাঁদের সাহিত্য জগৎ থেকে নির্বাসিতই করতে চান, এর কারণ কি পুরুষ সাধারণের স্বাভাবিক রক্ষণশীলতার অবচেতন মনের ছায়া হইতে উৎপন্ন? দশের মধ্যে নারী সম্বন্ধে আলোচনায় লজ্জিত করে? অথবা চিরন্তন পৌরুষ তাদের কাছে কোন ঋণ স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হয়?"[২৭] উক্তিটি যথার্থ নয়। সমসাময়িক কালের সাময়িক পত্রে যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে নারীদের রচনা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সংবাদ প্রভাকর দি বেঙ্গল ম্যাগাজিন, বামাবোধিনী, ক্যালকাটা রিভিয়্যু, বঙ্গদর্শন, প্রবাসী, ভারতবর্ষ প্রভৃতি পত্রিকায় তাদের মৌলিক রচনা এবং সমালোচনা প্রকাশিত হত।

স্বর্ণকুমারীর প্রথম সামাজিক উপন্যাস স্নেহলতা বা পালিতা (১৮৯২)। দুটি খণ্ডে বিস্তৃত। নারীমুক্তি আন্দোলনের পতাকা উড়িয়ে এসেছিল নবযুগের নবীন ভাব-মন্দাকিনী। পুথি পত্রে, সমাজ ও জীবনে নারীর স্বাধিকার লাভের আন্দোলনের তুঙ্গে দাঁড়িয়েছিলেন যে সব ভগীরথরা, নব্যহিন্দুয়ানির আন্দোলনে তাঁরা ভেসে গেলেন। তারা ভাসিয়ে দিলেন স্নেহলতার মত অসহায় নারীদের। তিনি তারই বিশ্বস্ত ও শিল্পসম্মতরূপ দিয়েছেন। "So far as I can see the novel is the only medium through which we can discuss the great majority of the problems which are being raised in such bristling multitude by our contemporary social development".[২৮] উনিশ শতকে সামাজিক সমস্যা যতই তীব্র হয়ে উঠতে লাগল সামাজিক উপন্যাসের গুরুত্ব ততই বেড়ে যেতে লাগল। এ যুগের সমস্যা যতখানি ব্যক্তিগত ঠিক ততখানিই পারিবারিক। স্নেহলতার জীবনবৃত্তান্ত চিত্রিত হয়েছে সামাজিক ও পারিবারিক পরিবেশ ও তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার পটভূমিকায়। নারীজীবন ও সমাজজীবনের এমন বিশ্বস্ত কাহিনী স্বর্ণকুমারী ব্যতীত সে যুগে আর কারো উপন্যাসে লক্ষ্য করা যাবে না। সমকালে ইংল্যাণ্ডের উপন্যাসও বিশেষ করে নির্ভর করছিল পারিবারিক জীবনের উপর। "The ordinary domestic relations are the legitimate province of novels."[২৯]

বাংলা কথাসাহিত্যেও গার্হস্থ্য জীবন ও রস ক্রমশই দানা বেঁধে উঠছিল। মিসেস

ক্যাথারিণ মলেনস্-এর 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' (১৮৫২)-এ গ্রামের অনুন্নত বাঙালী খৃষ্টান জীবনের চিত্র পরিবেশিত হলেও পারিবাবিক জীবনের কথাও স্থান পেয়েছে। বর্ধমানের চাষীঘরের নিখুঁত চিত্র উপস্থিত করেছেন লালবিহারী দে তাঁর 'চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান' (১৮৫৯) ও 'গোবিন্দ সামন্ত' (১৮৭৪) নামক গ্রন্থে। রমেশচন্দ্র দত্তের 'সংসার' (১৮৮৬)এ পল্লীবাংলার ভদ্র পরিবারের চিত্র উপস্থাপিত হল। বাল্যবিধবা সুধার কেবল বিবাহই হল না স্বামী পুত্র ও পরিজন নিয়ে সুখী সংসারের চিত্রও উপস্থাপিত হল। সেই হিসাবে বইটি বিষবৃক্ষের "জবাব"।[30] তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা' ১৮৭৪ সালে প্রকাশিত হয়। এটিও গ্রামবাংলার গার্হস্থ্যজীবন নিয়ে লেখা। বাংলার গ্রামের নিত্য পবিচিত মানুষেবা দল বেঁধে লালবিহাবী, রমেশচন্দ্র ও তাবকনাথের উপন্যাসে উপস্থিত হল। বঙ্কিমের উপন্যাসে এ সব মানুষ কেবল গৌণ নয়, উপেক্ষিত। বঙ্কিমেব জীবনজিজ্ঞাসা ও অনুসন্ধানের ক্ষেত্র পৃথক ছিল কিনা, এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করে লাভ নেই। বঙ্কিমচন্দ্রের বিচবণ ক্ষেত্র ছিল উনিশ শতকীয় বিত্তবান অভিজাত সমাজ। এদের সমস্যা বিত্তের নয়, চিত্তের। বঙ্কিমে নায়িকারা প্রেমসর্বস্ব এবং দ্বন্দ্বহীন। এটাই স্বাভাবিক। নারী ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ এখনও সম্ভব হয়নি। বঙ্কিমের উপন্যাসের সব দ্বন্দ্ব কেন্দ্রীভূত হয়েছে নায়ক চরিত্রে। নারীবা পরিবার ও পরিজন নিয়ে স্থান কালের বন্ধনে ধরা দেয়নি। তারা প্রেমিকা ও বধূ ব্যতীত আর কিছুই নয়। এমন কি কেউ ভগ্নী নয়, জননী নয়, কন্যা নয়। নগেন্দ্র কুন্দকে বরণ করলে সূর্যমুখী গৃহত্যাগ করেছে। সূর্যমুখীর কোন সন্তানও ছিল না, ভ্রমর নিঃসন্তান এবং সম্ভবত তার কোন ভাই-ও নেই। স্বর্ণলতার লেখক তারকনাথ বাস্তবতার এই সঙ্কীর্ণ রূপ ধরতে পেরেছিলেন। তাঁর বাস্তবতা তাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত নয়, অনেককে নিয়ে তাঁর বাস্তব পরিরারের আঙিনায়। সংসার জীবনের ধরা ছোঁয়া মানুষগুলোকে অবলম্বন করে জীবনের আর এক সত্য উদ্ঘাটিত হয়েছে। একদিকে একান্নবর্তী পরিবার, ভ্রাতৃকলহ, জায়ে জায়ে কলহ, চুরি, প্রবঞ্চনা, দারিদ্র্য, ষড়যন্ত্র, ব্যাধি আর একদিকে ফেরিওয়ালা, গ্রামের মহিলাদের জটলা, নারীর গহনার লোভ, পরের ঘরে আড়িপাতা প্রভৃতি দৃশ্য বাংলা সাহিত্যে ইতিপূর্বে ছিল না। তারকনাথ উর্ণনাভের মত সংসার জীবনের চারপাশে মায়া-মমতা দ্বেষ-ঈর্ষার তন্তুজাল সৃষ্টি করে মানুষগুলোকে মাটির সাথে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধেছেন। রমেশচন্দ্রে এই বাস্তবজীবন চিত্রের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সামাজিক সমস্যা অর্থাৎ বিধবা বিবাহ। তিনি বিদ্যাসাগরকেই সমর্থন করেছেন। ইংরাজী শিক্ষালব্ধ মূল্যবোধ সমাজে যে আলোড়ন ও দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছিল স্বর্ণকুমারী তার রূপকার। স্নেহলতা ও মণি ক্রম-উন্মোচিত নারী ব্যক্তিত্বের বাঙ্ময় রূপ। "রামমোহন থেকে বিদ্যাসাগরোত্তর যুগে নারীকে

ব্যক্তিত্বে-প্রতিষ্ঠিত করার প্রবল আন্দোলন চলছে পুরুষের পক্ষ থেকে। এই প্রয়াসের পূর্ণাঙ্গ সার্থকতা স্বভাবতঃই নারীর আত্মশক্তিতে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠার অপেক্ষা করছিল। বীটন্ বিদ্যালয়ের নারীশিক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থার ফলে সে পথের সম্ভাবনাও অবারিত হয়েছিল।"৩১ এই অবারিত সম্ভাবনার ফলশ্রুতি স্বর্ণকুমারীর 'স্নেহলতা' ও 'কাহাকে ?' উপন্যাসদ্বয়। নবজাগ্রত নারী ভাবনার সার্থক প্রতিফলনের জন্য সাহিত্যক্ষেত্রে নারী ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র-তারকনাথ ও রমেশচন্দ্রের পাশে স্বর্ণকুমারী এসে দাঁড়ালে যুগটার পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া সম্ভব হবে। ইংলণ্ডের অষ্টাদশ শতকের জীবন ও সমাজকে জানতে হলে ফিল্ডিং এবং অস্টিন দুজনেব সাহিত্য কর্মেব সঙ্গে যুক্ত হতে হয়।

স্বর্ণকুমারীর উপন্যাসেব কাহিনীতে প্রাধান্য পেয়েছে উদীয়মান ইংরাজী-শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবাব। সে সময় সব আন্দোলন, সব সংস্কারের তাঁরাই ছিলেন অগ্রদূত ও কারিগর। "A new caste has been created under modern conditions, namely that of English educated Indians, who live in most respect a life quite distinct from that of Brahman pundits on the one hand and the masses on the other."৩২

ডাক্তার জগচ্চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের পরিবার এই উপন্যাসের আখ্যানভাগের ভিত্তি। লেখিকা জগচ্চন্দ্রের পারিবারিক পরিচয় দিয়েছেন নিম্নরূপ :—

"ডাক্তার জগচ্চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় একজন সঙ্গতিসম্পন্ন লোক। তাঁহার পিতা তাঁহার জন্য কিছু বিষয় সম্পত্তি রাখিয়া যান, আর তিনিও নিজে ডাক্তারী করিয়া বিলক্ষণ দু'পয়সা উপার্জন করিয়াছেন। জগচ্চন্দ্রের বহির্বাটী তাঁহার অর্থস্বচ্ছলতার যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করে, কিন্তু অন্তঃপুর—যেখানে তাঁহার গৃহলক্ষ্মী বিরাজমান, সেখানে লক্ষ্মীদেবতার আবির্ভাব অনুভব করা নিতান্ত সহজ নহে। সাধারণ বাঙালী বাটীর যেরূপ দস্তর, অন্তঃপুরের ঘরগুলি সবই ছোট ছোট,······ সাজসজ্জাও সামান্য।" (পৃ-২)

গৃহিনীর পরিচয় দিতে যেয়ে বলেছেন, "(অন্তঃপুর) কর্তার ইচ্ছায় কর্ম এখানে হইবার নহে, গৃহিণী, যিনি কর্তারও কর্তা।" বাড়ীর ভিতর আধুনিকীকরণ হয়নি—না আসবাবে, না ভাব-ভাবনায় ও আদব কায়দায়। অথচ সে কালে ইংরাজী শিক্ষিত বাঙালী যুবকরা ঘরের সংস্কারে তৎপর হয়েছিলেন। জগচ্চন্দ্র সে যুগের সব রকম প্রগতিশীল ক্রিয়া-কলাপ, ধ্যান-ধারণার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি ব্রাহ্ম হননি বা হতে পারেননি। কারণ পিতার ক্রুদ্ধ স্বর তাঁর পিছনে প্রহরীর মত কাজ করছে, "তুই যদি ব্রাহ্ম হবি ত তোকে আমি ত্যাজ্য পুত্র করিব।" পিতা জগচ্চন্দ্রকে স্কুল

ছাড়িয়ে ঘরে বন্দী করে, বিয়ে দিয়ে, মেডিকেল কলেজে ভর্তি করে নিশ্চিন্ত হলেন। বিবাহের পব জগৎবাবু, তিনি মাতার চোখের জল, পিতার মুখ, বিষয়সম্পত্তি সবই রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু সমাজ সংস্কাব ও 'উন্নত ধর্মভাবের' ভূত তাঁর ঘাড় থেকে নামলো না। রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্রের মাহাত্ম্য ও মানসিক বলেব কথা স্মবণ করেই তৃপ্ত হতেন। প্রথম বিবাহেব পাত্রীর বয়স দশ। তখন বাংলাদেশের ঘবে ঘবে ইংরাজী শিক্ষিত যুবকবা স্ত্রীশিক্ষার মাধ্যমে গৃহসংস্কাবে আত্মনিয়োগ করেছেন। লেখিকা শ্লেষেব সঙ্গে বলেছেন, "বিবাহেব পব জীবনের এই সমস্ত আবেগ সমস্ত আশা, একটিমাত্র প্রণালীতে প্রবাহিত হইল, তাহাব নববিবাহিতা স্ত্রীকে নিজের মনের মত করিয়া গঠন কবিতে তাঁহার সমস্ত উৎসাহ অর্পণ করিলেন।" তিনি ব্রাহ্মধর্ম এবং সমাজ-সংস্কার আন্দোলনেব প্রত্যক্ষ ভূমিকা থেকে সবে দাঁড়াবায় জন্য সান্ত্বনা খুঁজলেন, "ক্ষুদ্র লোকেব মহৎ কার্য সাধিত করতে যাওয়া বিড়ম্বনা। আমি যদি পিতামাতা ত্যাগ করিয়া, ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিতাম তাহা হইলে, না আমি ঈশ্বরধর্ম রাখিতে পারিতাম, না মানবধর্ম রাখিতে পারিতাম।" (পৃ-১৯)। সন্তান প্রসবকালে প্রথমা স্ত্রীর বিয়োগ ঘটলো। প্রথমা স্ত্রীব বিধবা আত্মীয়াকে চিকিৎসা করতে যেয়ে প্রণয়পাশে আবদ্ধ হন। তাঁর সহচররা সে যুগেব প্রগতিশীল ভাবনা ও কর্মের শরিক। কিন্তু ব্যক্তিজীবনে তা গ্রহণে অনীহা। বিধবাবিবাহ, বিবাহের বয়স, মনোনয়ন নিয়ে তারা আন্দোলন করছে কিন্তু ব্যক্তি বা পরিবারজীবনে তা গ্রহণ কবছে না। জগচ্চন্দ্র বিধবাবিবাহে সম্মত হলেও বাধা দিল তাঁব বন্ধুবা অর্থাৎ সে কালের সমাজসংস্কারকরা। বিধবাবিবাহ প্রসঙ্গ পিতার কানে গেল। পিতা আবাব পুত্রকে গৃহবন্দী করে বিবাহ দিলেন। দ্বিতীয় স্ত্রীর বয়স বার। কেশবচন্দ্র সেন বালিকাদের বিবাহের উপযুক্ত বয়স সম্বন্ধে বিশিষ্ট ব্যক্তিদেব মতামত জানতে চাইলে সকলেই বালিকার বিবাহের নিম্নতম বয়স চোদ্দ বৎসর বলে মতামত জানিয়েছিলেন। (বাইওগ্রাফি অব্ নিও ফেথ্—পি. কে. সেন, পৃ-২৯৫)।

বিবাহের পর জগৎবাবু অন্যের কাছে শুনেছেন, 'বিধবা আত্মহত্যা করিয়াছে, আর তাহার মা কাশী গিয়াছেন।' কেহ বলিল, "দুইজনেই কাশী গিয়াছেন।" এতদিন নববিবাহিতা স্ত্রীকে ভাল করে দেখেননি। বিধবাপ্রসঙ্গ শেষ হওয়ায় দ্বিতীয় স্ত্রীর প্রসঙ্গে এলেন। দ্বিতীয় স্ত্রীকে লেখাপড়া শিখিয়ে মনের মত করে গড়তে গিয়ে ব্যর্থ হলেন। "স্বামী বকিয়া যান, স্ত্রী ঢোলেন।" স্ত্রীকে ছেড়ে ধরলেন পুত্র কন্যাদের। "স্বামী-স্ত্রী একমত না হইলে সন্তানদিগকে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়। তিনি যেখানে সত্য বলিতে শিক্ষা দেন, স্ত্রী সেখানে মিথ্যা বলিতে শেখান।" এবার তাঁর আশ্রয় হল ভগ্নী

সুমতির ননদের মাতৃ-পিতৃহারা কন্যা স্নেহলতা। "বালিকা নম্র অথচ সরল, বালিকা অলস নহে, বালিকা বিদ্যানুরাগী, সে সত্য কথা বলে। স্বাভাবিক কোমলভাবে হৃদয় পরিপূর্ণ।" নিজ কন্যা টগর ও স্নেহলতায় কোন মিল নেই। স্নেহলতা স্বামী-স্ত্রী বিরোধের কারণ হয়ে উঠলো। এতদিন সবাই জানতো স্নেহ ও চারুর বিবাহ প্রায় ঠিক। জগৎবাবুর মা এবং জগৎবাবুর নিজের তাই ইচ্ছা। গিন্নীর ইচ্ছা অন্যত্র স্নেহের বিবাহ দেওয়া। স্নেহের বিবাহ প্রসঙ্গ উঠলেই জগৎবাবু বলেন, 'এই ত সবে দশ বছর বয়স—এর মধ্যেই এত কথা।' গিন্নীর উত্তর—"দেখতে তো ষোল বছরের মাগী হয়েছে।" জগৎবাবু বুঝলেন সবই এবং জানলেন চারুবও মত নেই। জগৎবাবুব জীবনের সবচেয়ে বড় ট্রাজেডী—"বাল্যকাল হইতে যেখানে তাঁহাব সঙ্কল্পেব সহিত দুর্বলতার যুদ্ধ বাধিয়াছে,—সেখানেই প্রায় তাঁহার দুর্বলতার জয় হইয়াছে।" সে যুগে রথী ও মহারথীদের এমন দুর্বলতা ও ত্রুটির উদাহরণ ভুরি ভুরি পাওয়া যাবে। বামাচরণ, কিশোর, হেম, নবীন, জীবনরা কথা লোপালুপি করে। বড় বড় আদর্শের কথা বলে। জীবনে তা রক্ষা করে না। বরং উল্টোটাই করে। বাল্যবিবাহ নিয়ে তর্ক করে কিন্তু শেষপর্যন্ত বাল্যবিবাহের খুরে মাথা মোড়ায়।

মোহনের সঙ্গে স্নেহের বিবাহ, মোহনের মৃত্যু—স্নেহের বৈধব্য—উপন্যাসের প্রথম ভাগের সমাপ্তি।

উপন্যাসের দ্বিতীয় ভাগে জগচ্চন্দ্র চরিত্রের অদ্ভুত বিবর্তন লক্ষ্য করা যাবে। বিধবা স্নেহলতা এখন জগচ্চন্দ্রের আশ্রিতা। জগৎবাবু স্নেহের বৈধব্যজীবন উন্নত করার জন্য ধর্ম, বিজ্ঞান, প্রকৃতি বিজ্ঞান ও নির্দোষ কাব্যাদি পড়ান। বিধবাবিবাহে এখন আর তিনি বিশ্বাসী নন্। অবশ্য যৌবনে তিনি স্বয়ং বিধবাবিবাহ করতে চেয়েছিলেন। এখন পুত্রকে পুনরায় বিবাহ দিতে আগ্রহী। বিধবা স্নেহেব বিবাহ প্রসঙ্গে তাঁর মনের প্রতিক্রিয়া—"এখন এই প্রৌঢ় বয়সে মনের সে উদার ভাবই বা কোথায়? এখন বিধবাবিবাহ দিবার কথাও তিনি মনে আনিতে পারেন না।" (২য় খণ্ড, পৃ-১৪)। চারুর সঙ্গে স্নেহের বিবাহ না হওয়ায় এক সময় তিনি মনে নিদারুণ ব্যথা অনুভব করেছিলেন। যখন চারু ও স্নেহের প্রণয়প্রসঙ্গ জানলেন তখন তিনি ক্ষিপ্ত। মৃতদার চারু ও বিধবা স্নেহ পরস্পর সহানুভূতির সূত্রে দুজন দুজনের হৃদয়ের কাছাকাছি চলে গিয়েছিল। স্নেহ ও চারুর ভালবাসা আজ তাঁর কাছে নীতিগর্হিত কাজ। "এই জঘন্য অধর্মাচরণ দেখবার জন্যেই কি আমি বেঁচে আছি? ভগবান্। কি অপরাধে এমন কুলাঙ্গার আমার সন্তান হয়েছিল।" পিতার যৌবনের ঘটনার সঙ্গে পুত্রের যৌবনের ঘটনার অনেক মিল। পিতার মধ্যে সময়ের ব্যবধানে একটা রূপান্তর ঘটে গেছে।

এ পরিবর্তন কেবল বয়সের জন্য নয়। যুগেরই পরিবর্তন হয়ে গেছে। নব্য হিন্দুয়ানির তিনি এখন পৃষ্ঠপোষক। সে যুগের চিন্তানায়করা অনেকেই পিছু হাঁটতে আরম্ভ করেছেন। প্রাসঙ্গিকভাবে সে যুগে কয়েকজন চিন্তানায়কের উক্তি উদ্ধৃত করছি। জগচ্চন্দ্র এখন এঁদের ভাবশিষ্য।

শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু—"আমাদের যৌবনকালেও আমরা অমনি ঘোর বিপ্লবের পক্ষপাতী ছিলাম, তদনুসারে কত কি অনুষ্ঠান করতাম, কিন্তু যতই বয়স হতে লাগলো, যত চাপল্য ঘুচে বহুদর্শিতা ও চিন্তাশীলতা জন্মাতে লাগলো, যত দুধ মরে ক্ষীর হতে লাগলো, ততই বুঝতে পারলেম, হতু্ কি খেকো বাকলপড়া বুড়োরা যা করে গেছে, তার ভিতরে নিগূঢ় তাৎপর্য আছে, থপ্ করে তাকে মন্দ বলা আর বদল করা বড় ভুল। কালানুযায়ী সকল সংশোধন ও পরিবর্তন প্রয়োজন, তা আপনা হতেই হয়। অতএব বাপ্ সকল, বুড়োদের কথা শুন, উষ্ণ মস্তিষ্কে হঠাৎ কোন কাজ করো না—সব দেখেশুনে মতামত স্থির করে কার্যে পরিণত করতে হয়।" (পৃ-৬৩)।[৩৩]

যুবক বুড়ো হলেই প্রতিক্রিয়া পন্থী হয় না। আসলে কালের বদল হয়েছে। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সহজ সরল পরিহাস প্রবণতার সঙ্গে বললেন—"পছন্দ বিবাহের আমি পক্ষপাতী। কিন্তু আমার একটা কথা আছে। পছন্দ করিয়া লইতে গেলে, এ সংসারে খাঁদা পেঁচা কানা খোঁড়া সব যায় কোথা? পৃথিবীতে সুরূপ না কুরূপের সংখ্যা বেশি। চাঁদের হাটের মধ্যে কেহ কিন্তু কুৎসিৎ বাছিয়া লইবে না। বারান্দায় দাঁড়াইয়াও পছন্দ করাইতে পারিবে না। মেয়ে পছন্দ কোথায় করিব। বাজারে গিয়া সব পছন্দ করিয়া কিনিতে পারি, মেয়ে পছন্দের জন্য একটা মেয়ে হাট করিয়া দাও।"[৩৪]

চন্দ্রনাথ বসু, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, অক্ষয়চন্দ্র সরকার একই মনোভাব প্রকাশ করেছেন।[৩৫] বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শশধর তর্কচূড়ামণি ও অক্ষয়চন্দ্র সরকারের নেতৃত্বে হিন্দুধর্মের নবজাগরণ ঘটে। ফলে সামাজিক নীতিগুলি পশ্চাদাপসরণ করছিল। ১৮৮০ থেকে ১৮৯০ পিছু হাঁটার কাল। কর্নেল ওলকট, মাদাম ব্লাভাটস্কী, স্বর্ণকুমারী ও জানকীনাথ ঘোষালের নেতৃত্বে থিয়সফিক্যাল সোসাইটি স্থাপিত হয়। নব্য হিন্দুয়ানির পিছনে এঁদের অবদানও কম নয়। স্নেহলতা, মিলনরাত্রি প্রভৃতি উপন্যাস এবং ছোট গল্পে ব্লাভাটস্কীর বক্তৃতার প্রতিধ্বনি শোনা যায়। প্রচার, নব্য ভারত ও বঙ্গবাসী প্রভৃতি পত্র-পত্রিকা নব্য হিন্দুয়ানির মুখপত্র হয়ে উঠলো।

"রামমোহন ও বিদ্যাসাগর সমাজসংস্কারের জন্য যে ডাক দিয়েছিলেন, বাঙলা হিন্দু সমাজের একটা বড় অংশ আজ তা প্রত্যাখ্যান করলো। যে বিধবাবিবাহের স্বপক্ষে

বিদ্যাসাগর তাঁর কালের নব্যশিক্ষিতদের সমর্থন পেয়েছিলেন, আজকের নব শিক্ষিতদের একাংশ তার বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করতে লাগল।"৩৬ ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে সাবিত্রী লাইব্রেরীর কক্ষে অক্ষয়চন্দ্র সরকার বিধবাবিবাহের বিপক্ষে বক্তৃতা দিলেন, বঙ্গবাসী পত্রিকা স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে কলম চালনা করতে লাগলো। অথচ এমন একদিন ছিল, যখন রাজা রাধাকান্ত দেব পর্যন্ত স্ত্রী শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন।

বাল্যবিবাহ নিবারণ, বহুবিবাহ নিবারণ, বিধবাবিবাহ প্রচলন, জাতিভেদ প্রথা লোপ, অসবর্ণ বিবাহ, স্ত্রী স্বাধীনতা, স্ত্রীশিক্ষা, অবরোধ প্রথা লোপ, স্ত্রীজাতি সম্মেলন, পণপ্রথা, বিবাহে মনোনয়ন প্রভৃতি আন্দোলনের গতি শ্লথ হয়ে গেল। ব্রাহ্ম সম্প্রদায় এবং ইয়ং বেঙ্গলরা পিছু হটতে লাগলেন। কেশবচন্দ্র, শিবনাথ, বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি ব্রাহ্ম নেতারা ভক্তিকে প্রাধান্য দিয়ে সমাজসংস্কারের পথ থেকে সরে গেলেন।

এই পিছু হটা যুগের চরম মুহূর্তে স্নেহলতা উপন্যাসের আত্মপ্রকাশ। স্বর্ণকুমারী অসাধারণ পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ শক্তি দিয়ে সমাজের পিছু হটাকে লক্ষ্য করেছেন। এবং নিপুণ শিল্পীর মত অন্তঃসলিলা ব্যঙ্গের আবরণে শিল্পসম্মতভাবে প্রকাশ করেছেন। সামাজিক ইতিবৃত্তের এই পর্বের কথা জানা না থাকলে স্নেহলতা উপন্যাসের যথার্থ মূল্যায়ণ সম্ভব নয়। মহৎ শিল্প সব সময় Spirit of the age কে ভৃগুর পদচিহ্নের মত বক্ষে ধারণ করে বেঁচে থাকে। জগৎবাবুর সাহচর্যে স্নেহলতার চিত্ত বিকশিত হয়েছিল। কিন্তু আজ রক্ষণশীল আন্দোলনের চাপে স্নেহলতা নির্বাক ও নিঃসঙ্গ। অথচ চারুকে সে ভালবাসে। চারু তার ভালবাসাকে তুচ্ছ করেছে, মৃত্যু ছাড়া তার অন্য গতি কোথায়। বঙ্কিম, শশধর, অক্ষয়, মনোমোহন ও জগচ্চন্দ্রেরা পিছু হটতে পারেন কিন্তু স্নেহলতারা জীবনযন্ত্রণা অস্বীকার করবে কেমন করে? তাই এ কালের উপন্যাসের সহজ সমাধান আত্মহত্যা। ১৩০৭ সালে ভারতীতে জ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'সাহিত্যে আত্মহত্যা' নামক নিবন্ধে লিখলেন—

"শিক্ষা ও বিজ্ঞানের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আমরা ঘোর অবিশ্বাসী হইয়া উঠিতেছি— কি স্ত্রী কি পুরুষ ভগবানের বড় ধার ধারিনা, পরমেশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও অনেকে সন্দিহান, নরক কবিকল্পিত মিথ্যা চিত্রবিশেষ ইহাই অনেকের ধারণা। সুতরাং আত্মহত্যা ঘোরতর পাপ কেহ ভাবিয়া দেখেন না .....।" (পৃ-২২১)। জগৎবাবু এবং চারু অর্থাৎ পিতা ও পুত্র দ্বিতীয় বিবাহের পর পালটে গেছেন। বিধবা নায়িকারা উভয় ক্ষেত্রেই আত্মহত্যা করেছে। উপন্যাসের শেষে জগৎবাবুর সিদ্ধান্ত—

"স্নেহকে লেখাপড়া না শিখাইলে সে বেশ সন্তুষ্ট চিত্তে আপনার অদৃষ্ট বহন করিতে পারিত।" (উপসংহার)।

এতদিন নারীশিক্ষা, বিধবাবিবাহ রাজনীতি ও ধর্ম বিষয়ে রচনায় পুরুষের দৃষ্টিকোণের প্রাধান্য ছিল। এবার নারীর দৃষ্টিকোণ থেকে পুরুষের সমাজসংস্কারের নামে খামখেয়ালী, চারিত্রিক দুর্বলতা, প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হল। স্বর্ণকুমারীর দৃষ্টি স্বচ্ছ, নৈব্যক্তিক অথচ বিষয়ের গভীরে যাবার মত তীক্ষ্ণ। নারীমুক্তি আন্দোলনের প্রবক্তাদের গালভরা বুলি, কথা ও কাজের মধ্যে মিল খুঁজতে যেয়ে বিব্রত ও হতাশ হয়েছেন। আদর্শের সঙ্গে কর্মকে মিলিয়ে দেখতে গিয়ে ব্যর্থতার করুণ চিত্র তুলে ধরেছেন। এই গরমিলের কারণ নির্দেশ করেছেন অর্থনৈতিক ও সামাজিক। সামাজিক আন্দোলনের প্রেরণায় যারা যৌবনের উন্মাদনা নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন নব্যহিন্দু ধর্মের আন্দোলন ও অর্থনৈতিক কারণে তারা ঠিক ততখানি বরং তার চেয়েও বেশি পিছিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছেন। জীবন, কিশোরী, চারু এমন কি জগচ্চন্দ্র পর্যন্ত পৈতৃক বিষয় থেকে বঞ্চিত হবার আশঙ্কায় শিশুসুলভ যুক্তির উপর ভর দিয়ে অনাদিকালের জীবনস্রোতে গা ভাসাতে চেয়েছেন। বধূ নির্যাতন সে কালের স্বাভাবিক ঘটনা হলেও তরুণ শিক্ষিতেরা বধূদের রক্ষায় তৎপর হচ্ছেন। মোহনের জ্যেঠাইমার নির্যাতনে স্নেহলতা সর্বদাই সশঙ্কিত। স্নেহলতার আবদার রক্ষা করতে যেয়ে মোহন স্নেহকে জগৎবাবুর বাড়ী পাঠাবার প্রস্তাব নিয়ে জেঠিমার সামনে উপস্থিত হলে জেঠিমার উক্তি—"একে ত স্বভাব চরিত্রের ছি রি ঐ। বৌ মানুষ একবার মাথায় কাপড় ওঠে না, রোজ রোজ বাপের বাড়ী গেলে শিক্ষে হবে ভাল।" (পৃ-২৪)। মোহন স্নেহকে পাঠাবার জেদ ধরলে, জেঠিমা গালিগালাজ, কান্নাকাটি করে মোহনের পিতা কুঞ্জবাবুকে এনে প্রতিবিধান চাইলেন। কুঞ্জবাবুর নির্দেশ, বৌ বাড়ীর অমতে জগৎবাবুর বাড়ী গেলে আর আনা হবে না। "এই অবিচারের কষ্টে মোহন নীরবে জ্বলিতে লাগিল।" (পৃ-৪৩)। আর্থিক ক্ষেত্রে মোহন সম্পূর্ণভাবে পিতার উপর নির্ভরশীল। সে ছাত্র। অপরিণত বয়সে, আর্থিক সামর্থ অর্জনের পূর্বে বিবাহের বিষময় ফলের কথা বহুকাল থেকেই যুবকরা অনুভব করছিল। ১৮৪৭ সালের হিন্দু ইনটেলিজেন্সার পত্রিকা থেকে ভুক্তভোগী যুবকের পত্রাংশ উদ্ধৃত করছি—"I am destitute of learning, destitute of friends, destitute of money, in a word destitute of every comfort that makes a man happy in society."[৩৭]

সে যুগে মোহন ত একলা নয়। সব যুবকেরই ছিল একই অবস্থা। স্বর্ণকুমারী দেবী মোহন ও স্নেহলতার এই অবস্থার কারণ নির্দেশ করতে যেয়ে বলেছেন—"যেখানে অবস্থা অন্যরূপ, স্বামী উপার্জন করেন—স্ত্রী, গৃহিণী সেখানে স্ত্রীর কোন কষ্ট নাই। সংসার ক্ষমতার বশ, সুতরাং স্বামীর আত্মীয়বর্গ সেখানে তাঁহারই অধীন, তাঁহারই

অনুগ্রহভাজন, এবং সাধারণতঃ সেখানে তিনিও এই ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়া থাকেন।" (পৃ-৪৩)। মোহনের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নেই। পুরানো পারিবারিক আদর্শের সঙ্গে এ কালের মোহনদের বিরোধ নিশ্চিত হয়ে উঠেছে। পুরাতন পরিবার প্রথার মধ্যে মোহন একটি স্বতন্ত্র ব্যক্তি। সে তার বিবাহিত জীবনের কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন। স্ত্রীর চোখের জলকে সে উপেক্ষা করেনি। বরং সবকিছু উপেক্ষা করে স্ত্রীকে জগৎবাবুর গৃহে পাঠিয়েছে। এর জন্য তাকে যথেষ্ট মাশুল দিতে হয়েছে। কুঞ্জবাবু স্পষ্ট ভাষায় মোহনকে জানিয়ে দিয়েছেন—"তাহার উপর সে যেন কোন প্রত্যাশা না রাখে। সে তাহার পুত্র নহে, সে কুলাঙ্গার" মোহন দমেনি বা জগৎবাবুর আশ্রয় ভিক্ষা করেনি। তার আত্মমর্যাদাবোধ প্রখর। সে যুগে শ্বশুরের পয়সায় পড়া বা ঘরজামাই থাকাই স্বাভাবিক নিয়ম। রুরকিতে পড়তে যাবার সময় সে জগচ্চন্দ্রের কাছে টাকা ঋণ হিসাবে চেয়েছে। এ কথা সে তার পিতাকে জানিয়ে দেওয়া প্রয়োজন বোধ করেনি। মোহন পুরাতন পরিবারে নূতন বাসিন্দা, নবীন যুগের নবলব্ধ জীবনবোধের নিঃসঙ্গ পথিক। চারু ও স্নেহের সম্বন্ধও এই নূতন-পুরাতন পরিবারবোধের বিরোধে চারু দ্বিতীয়বার বিবাহ করেও স্নেহের কথা ভুলতে পারেনি। নববধূকে নানাপ্রসঙ্গে স্নেহের গল্প শোনাত। সেই চারু দানপত্রে সই করতে যেয়ে স্নেহের উপর ক্ষেপে গেল। নতুন জীবনবোধ সবটুকু অধিকার কায়েম করতে পারছে না।

ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় স্নেহলতা উপন্যাসের তরুণের দল সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন—"হেম, কিশোর, জীবন, নবীন, মোহন প্রভৃতি প্রকাণ্ড একদল যুবকের আবির্ভাব হইয়াছে, তাহাদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য কিছুই নাই, তাহারা কেবল তর্কের বল লোফালুফির প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইয়াছে।"[৩৮] সব অভিজ্ঞতা উপন্যাসের কাঁচা মাল হতে পারে না। নিছক শিল্পের বিচার ছাড়া আর একটি বিচারও আছে। উপন্যাসে কতটা সেই যুগ ধরা পড়েছে, সে বিচারও চাই। লেখিকা প্লট গ্রন্থনের দিকে দৃষ্টি রেখে নানা চরিত্র অবতারণা করেছেন। এরা উপন্যাসে বিধৃতকালের যুবমনের ও জীবনবোধের পরিচায়ক হয়ে উঠেছে। মোহন ও জীবনরা একুশ বছর বয়সের আগে বিয়ে করবে না বলে শপথ করে; অথচ দুজনেই উনিশ বছর বয়সে বিয়ে করতে বাধ্য হয়। হেম বলে—"আচ্ছা, বাল্য বিবাহ সমাজের পক্ষে অশুভ, বেশ, বক্তৃতা খুব কর, খবরের কাগজে লেখ, কিন্তু তাই বলে নিজে যে কেন বিয়ে করবে না—তা ত আমি ভেবে পাইনে।" কিশোরী বলে—"Early marriage, Female emancipation, Social reformation-এ সব বড় বড় কথা মুখে বেশ বলতে ভাল, সুবিধে পেলে আমিই কি বলতে ছাড়ি? সেদিন পাদ্রি স্মিথ্ সাহেব আমার Radical views শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন।

কিন্তু তাই বলে যদি তেমন তেমন জুটে যায়, রূপ আর রূপী একই সঙ্গে মেলে, তা হলে আমি ছেড়ে কথা কই ?" গুপ্ত সমিতির দেশোদ্ধারের এরা নেতা। অথচ এরাই সুরায় ডুবে থাকে, গুপ্ত সমিতির অর্থ আত্মসাৎ করে, মুদির দোকানে ধারের অন্ত নেই, জোর করে জেঠিমার সিন্দুক থেকে টাকা নেয়, চিঠি জাল করে, বিধবা ভ্রাতৃবধূকে বিপদে ফেলে কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে চায়।

জীবনের কাছে ইউরোপ মাতৃভূমির চেয়েও প্রিয়। "তাহার চক্ষে তাহা কামরূপ, তাহার স্পর্শে যেন অন্ধও দিব্যচক্ষুলাভ করে, কেবল তাই নয়—সে ভাবিত যদি সে বিবাহই করে ত ভালবাসিয়াই বিবাহ করিবে। আমাদের দেশের পক্ষে তাহা সম্ভব কিনা—ইহা তাহার মনে আসিত না।" স্নেহলতাকে জগচ্চন্দ্রের কন্যা ভেবে ভালবেসেছিল। বিবাহের পর জানলো স্নেহ বিধবা, মোহনের স্ত্রী। তাই বলে সে স্ত্রী টগরকে অবহেলা করেনি। আবার স্নেহের আকর্ষণও নষ্ট হয়নি।

স্নেহলতা উপন্যাসের প্রধান চরিত্র স্নেহলতা, জগচ্চন্দ্রের পালিতা কন্যা। স্বর্ণকুমারীর ঐতিহাসিক ও সামাজিক উপন্যাসের অধিকাংশ নায়ক-নায়িকা পালিত বা পালিতা।

দ্বিতীয় খণ্ডে বিধবা স্নেহলতা ও বিপত্নীক চারুর প্রণয় ও তার করুণ পরিণতি চিত্রিত হয়েছে। প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর চারু মদ্য পানে অভ্যস্ত হয়েছে। বালিকা স্ত্রীর মৃত্যুতে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল অশ্রুমুখী বাল্‌বিধবা স্নেহলতা সান্ত্বনার প্রতিমূর্তি হয়ে চারুর সামনে উপস্থিত হয়ে তা পূর্ণ করেছিল। "স্নেহের এই বৈধব্য মূর্তি আজ তাহার নূতন বলিয়া মনে হইতে লাগিল—স্নেহ বিধবা। একটি অসীম মর্মবেদনায় তাহার হৃদয় পূর্ণ হইল, উভয়ের সমবেদনা পূর্ণ প্রাণস্পর্শী দৃষ্টি উভয়ের স্থাপিত হইল।" (পৃ-৫) এরপর চারু সুস্থ জীবনে ফেরার চেষ্টা করলো। কবিতা পাঠ, রাজনীতি, ধর্ম, বিধবাবিবাহ, স্নেহলতার গান প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে স্নেহ ও চারু খুব কাছাকাছি চলে এল। বিধবা বিবাহ প্রসঙ্গে চারুর খরতর যুক্তি স্নেহের মনে মোহের সঞ্চার করেছিলো। 'স্নেহলতা এই তীব্র সুখে অশান্ত হইয়া পড়িল।' আজ মোহনের ছবিটি স্নেহের কাছে কেমন অস্পষ্ট মনে হতে লাগলো। কিছুতেই মানস নয়নে মোহনের মূর্তিটি জাগিয়ে তুলতে পারলো না। উপরন্তু ছবিখানির সঙ্গে চারুর মিলই সে বেশি করে দেখতে পেল। "স্নেহলতা চোখ বুজিল, মুদ্রিত নয়নের সম্মুখে চারুর জীবন্তমূর্তি দেখিতে পাইল, চক্ষু খুলিয়া আবার ছবির দিকে দৃষ্টিপাত করিল, দেখিল, সেখানি স্পষ্ট চারুর ছবি।" (পৃ-১২) চারু আবেগ প্রবণ পুরুষ। সে স্নেহকে ধরাছোঁয়ার মধ্যে পেতে চায়। স্নেহের মুখ থেকে শুনে

নিতে চায় যে স্নেহ তাকে ভালবাসে। 'চারু, আমি তোমার, চিরদিনই তোমার।' (পৃ-২৫)। এ কথার পর চারু নিজেকে আর সংযত রাখতে পারেনি। 'চারুর ওষ্ঠাধর স্নেহের ওষ্ঠাধরে মুদ্রিত হইয়াছে।' (পৃ-২৫)।

চারু তার জননীর দ্বিতীয়বার বিবাহের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। টগর ও গিন্নী যুক্তি করে স্নেহলতাকে জোর করে তার শ্বশুরবাড়ী পাঠিয়ে দিল এবং চারু ও জগৎবাবুকে জানাল স্নেহ স্ব-ইচ্ছায় গেছে। গিন্নী বিদ্রূপ করে জগৎবাবুকে বললেন, 'শ্বশুরবাড়ী মেম আসে, খিরিষ্টান হবার সুবিধে, এটা আর বুঝছো না।' (পৃ-২৭)। খৃষ্টান হবার প্রসঙ্গটি উপন্যাসে অনেকখানিই অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হতে পারে। কিন্তু ঠাকুর পরিবারের বিধবা মহেশ্বরী দেবী খৃষ্টান হয়েছিলেন।[৩৯] ঠাকুর পরিবারের নারী শিক্ষার জন্য মেম যাতায়াত করতো। কুঞ্জবাবুর বাড়ী মেমের যাতায়াতের খবর আমরা পূর্বেও পাইনি, পরেও পাবনা। মহেশ্বরী দেবীর চরিত্রের কিছু প্রভাব স্নেহলতার চরিত্রেও পড়ে থাকবে। স্বর্ণকুমারী হয়তো সে প্রসঙ্গটিই উল্লেখ করে থাকবেন। শ্বশুরবাড়ী উপস্থিত হলে জেঠাইমার উক্তি—'খ্যাঙ্গরা মারবো আর দুটি দুটি করে ভাত দেবো।" (পৃ-৩১)।

কিশোরী এখন গৃহের কর্তা। সে বিবাহিত এবং পিতা। এই চরিত্রটি ভিলেনের পর্যায়ে পড়ে। কিশোরী চারুর চিঠিগুলি আত্মসাৎ করে চারুকে স্নেহলতার প্রতি বিরক্ত করে তোলে। এই চিঠির ভয় দেখিয়ে স্নেহকে ভোগ করতে চায়। কিশোরীর স্ত্রী বছরে বছরে সন্তান প্রসব করে। আঁতুড় ঘর এবং শিশু সন্তান নিয়ে সে ব্যস্ত। স্নেহলতা অন্য পুত্র কন্যার জননীর স্থান অধিকার করে। কিশোরীর ব্যবহারে স্নেহ জীবনের গৃহে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। জীবনও স্নেহকে ভালবাসে। জীবনের কাছে ভালবাসার অর্থ কেবল মাত্র দেহভোগ নয়। তাই সম্মান এবং স্বাভাবিক অধিকার স্নেহ না চাইতেই পায়। চারু যখন স্নেহকেই তাদের ভালবাসার সম্পর্কের জন্য দায়ী বলে সাব্যস্ত করছিল সেই সময়ে ঝড়ের মত স্নেহলতা প্রবেশ করে। পিতা-পুত্রের সংলাপ তার কানে যায়। স্নেহলতা সব দোষ নিজের স্কন্ধে নেয়। সব গরল একাই পান করে। জীবনে সব যন্ত্রণা, সব দুঃখ যার মুখ চেয়ে সহ্য করছিল আজ বিশ্বাসের সে স্থানটিও ধ্বসে গেল। "Love is the history of a woman's life, it is an episode in man's". অস্তিত্বই তার কাছে যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠলো। মৃত্যুর কাছে আত্মসমর্পণ ব্যতীত তার আর গতি রইলো না। নানা আন্দোলন ও শিক্ষার প্রসার সত্ত্বেও বিধবাদের কোন গতি হয়নি। স্বর্ণকুমারীর সমকালে স্বর্ণময়ী গুপ্তা আক্ষেপ করে লিখেলেন—

"হিন্দু বিধবা বালিকার যদি কোনই প্রতিকার না থাকে তবে তাঁহারা দয়া করিয়া সেই পুণ্য সতীদাহ প্রথা পুনঃপ্রবর্তিত করিয়া দিউন। সর্বশুচি হুতাশন হিন্দু অবলার চির সহায়। তাহারা সেই সর্বান্তকারীর সাহায্যে আপনাদের যন্ত্রণার সঙ্গে সঙ্গে পাপ ও কলঙ্কের অবসান করিতে পারিবে।"[৪০]

উপন্যাসে বিধবাদের সমস্যা বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম উপস্থাপিত করেন। এর পর বালিকা, যুবতী, বর্ষীয়সী, পুত্রবতী, পুত্রহীনা বিধবাদের নানা সমস্যা উপন্যাসে স্থান পায়। বঙ্কিমের ইন্দিরায় সোনার মা বিধবা প্রসঙ্গে বলে, 'মুসলমানের হয়, যত দোষ হিন্দু মেয়ের।' (৯ম পরিঃ)। আনন্দমঠের গৌরী ঠাকুরানীর মতও প্রায় এক। শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের 'কৃতজ্ঞতা' থেকে শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন' পর্যন্ত উপন্যাসে বিধবারা নায়িকা, উপনায়িকা ও পার্শ্ব চরিত্র রূপে উপস্থিত হয়েছে। মহিলা ঔপন্যাসিকরাও এ সমস্যার গভীরে যাবার চেষ্টা করেছেন। কুসুমকুমারীর 'প্রেমলতা', ইন্দিরা দেবীর 'স্পর্শমণি' প্রভৃতি উপন্যাসে নারীরা পুরুষের বক্তব্যকেই উপস্থাপিত করেছেন। চারুর আত্মহত্যার কারণ যতখান ব্যক্তিগত ততখানি সামাজিক নয়। "স্বর্ণকুমারীর 'স্নেহলতা' বাঙালী সমাজে আধুনিকতার সমস্যা লইয়া এই প্রথম উপন্যাস লেখা হইল।"[৪১]

বঙ্কিমের উপন্যাসে লক্ষ্য করি নায়ক একজন, নায়িকা দুই জন। নগেন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে সূর্যমুখী ও কুন্দনন্দিনী এবং গোবিন্দলালকে কেন্দ্র করে ভ্রমর ও রোহিণীর জীবন বিবর্তিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। স্নেহলতার জীবনে স্বামী রূপে এসেছে মোহন। প্রণয়ীরূপে এসেছে চারু ও জীবন। দুষ্ট গ্রহের মত উপস্থিত হয়েছে কিশোরী। একটি নারীকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে চারটি পুরুষ। মোহনের কথায় ও কাজে কোন বিরোধ নেই। চারুদের স্বার্থে যখন আঘাত লাগে, সুখ ও স্বাচ্ছন্দ যখনি সংকোচিত হয় তাদের মোহ কেটে যায়। জীবন স্নেহকে ভালবাসে কিন্তু তাকে পাবার জন্য—সমাজবিধি অতিক্রম কবতে চায়না। স্নেহ সামাজিক ও পারিবারিক অত্যাচারকে সহ্য করেছে। সে সহ্য করতে পারেনি জগৎবাবুর মত ও পথের পরিবর্তন, চারুর অপবাদ ও উপেক্ষাকে। স্নেহের চরিত্রের জটিলতা ও গভীর যন্ত্রণা ভ্রমর, রোহিনী, কুন্দ পাবে কোথায়? স্নেহের আত্মহত্যার ন্যায্য এবং সঙ্গত পরিবেশ ও পটভূমিকা রচনায় স্বর্ণকুমারী সক্ষম হয়েছেন। 'কাহাকে?' উপন্যাসের নায়িকা একজন, নায়ক দুজন। মৃণালিনীর প্রেমপ্রার্থী ব্যারিষ্টার ও ডাক্তার। বঙ্কিমের নায়ক-নায়িকারা বাঙলার পরিবেশ ও অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য পায়নি। স্বর্ণকুমারী সামাজিক উপন্যাস স্থান কাল ছুট্ নয়। তাঁর উপন্যাস বিশেষ ভাবে বঙ্গদেশীয় ও তৎকালিক। ডঃ সুকুমার সেন 'স্নেহলতা'কে স্বর্ণকুমারীর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলে চিহ্নিত করেছেন।[৪২]

স্বর্ণকুমারীর সমকালে এতখানি সমাজসচেতনার পরিচয় আর কোন ঔপন্যাসিকের রচনায় পাওয়া যাবে না।

স্বর্ণকুমারীর দ্বিতীয় সামাজিক উপন্যাস 'কাহাকে?' (১৮৯৮) সালে প্রকাশিত হয়। ১৯১৩ খৃঃ E. M. Lang-এর ভূমিকাসহ ইংরাজীতে 'An Unfinished Song' নামে অনুবাদ করেছিলেন। এবার উপন্যাসের আখ্যানবস্তু অন্য পরিবেশ থেকে আহৃত। ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। লেখিকা দীর্ঘকাল সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংস্পর্শে ছিলেন। সূর্যকুমার গুডিভ চক্রবর্তীর সঙ্গে পারিবারিক ঘনিষ্ঠতা ছিল। সে সময় বাঙলাদেশে ইংরাজী কেতাদুরস্ত একটি শ্রেণীব জন্ম হচ্ছিল। তার সাথেও লেখিকার পরিচয় না থাকাব কথা নয়। উপন্যাসের নায়িকা মৃণালিনী অর্থাৎ মণি। মণির ভগ্নীপতি বিলাত ফেরৎ ব্যারিস্টার। তাঁর ব্যারিষ্টার বন্ধু রমানাথ, ডাক্তার সকলেই বিলাত ফেরৎ। গৃহটি বিলেতী কায়দায় সাজান। বাড়ীর চারপাশে ফুলের বাগান, টেনিস লন্। দিদিরা 'ইংরাজীয়ানা চালে চলেন'। প্রতি সপ্তাহে টেনিস পার্টি উপলক্ষ্যে স্ত্রী-পুরুষ সম্মেলন হয়। পিয়ানো বাজিয়ে প্রথমে ইংবাজী, পরে বাঙলা গান গাওয়া হয়। এখানে অতিথিকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য সকলকে উঠে দাঁড়িয়ে ইংরাজী কায়দায় দেহভঙ্গিমা করতে হয়। এদের সমাজেব সকলেই 'ইংলণ্ডের best manners শিখে এসেছেন।' স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে টেনিস খেলেন। পার্টিতে যান। গৃহ-স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে এলে ড্রইং রুমে বসে পরিচয় পত্র দিতে হয়। বেয়ারা ট্রে করে সেই কার্ড প্রভুর কাছে নিয়ে যায়। পাত্র-পাত্রীদের সাক্ষাতের জন্য engagement করতে হয়। গৃহে ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, টি, ডিনারের সময় টেবিলে যাবার জন্য ঘণ্টা বাজে। খাবার টেবিলে বসে শেলির কবিতা পাঠ, বিলেতী গল্প, ইংলণ্ডের শীত, বরফে স্কেট করা নিয়ে রসিয়ে রসিয়ে আলোচনা হয়। উপন্যাসের নায়কদেব বিশ্বাস স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে একবার করে বিলেত ঘুরে আসা উচিত। মণির ভগ্নিপতি ক্রুদ্ধ হলে বাংলার চেয়ে ইংরাজী বলেন বেশি। দিদি পার্টিতে গিয়ে সারারাত কাটিয়ে, সারাদিন নিদ্রা যান। উপন্যাসটির পাতায় পাতায় জর্জ এলিয়ট, স্ত্রী স্বাধীনতা প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা। নায়ক-নায়িকাদের কথাবার্তা ইংরাজী বুকনিতে ভরা। নিম্নলিখিত ইংরাজী শব্দগুলি উপন্যাসে একাধিকবার ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। Love at the first sight, Happy pair, Good gods, Never mind, Bad luck, Nod. Cut, Heavens, Excuse, Gracefully, Nervous, Influence, Awkward feel, Idea, Reform, Energy, Duty, Engagement, Party , Late, First love, Sacrifice, Scoundrel, Shamefull প্রভৃতি।

আর্দালি, ভৃত্য, পাচক প্রভৃতি কেবল ইংরাজী নামেই পরিচিত হয় না তাদের পোষাকে পরিচ্ছদ চাল-চলনও তদানীন্তন সমাজে সম্পূর্ণ নূতন। উপন্যাসে নায়িকা কেঁদে কেঁদে বাইবেলের ঢং-এ প্রার্থনা করে—'তোমার করুণা। প্রভু তোমার করুণা।' (পৃ-১৪৪)। নায়িকা জানালার পর্দা সরিয়ে ইজিচেয়ারে বসে ইংবাজী নভেল পড়ে। বাংলা উপন্যাসে স্বর্ণকুমারীই সমাজের এই শ্রেণীর চিত্র প্রথম আঁকবার চেষ্টা করেন।

নায়িকা মণি লরেটোর ছাত্রী। বিলেতী সাহিত্য-সঙ্গীত-শিল্প-সমাজ সম্বন্ধে সে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। এ সমাজে মনোনয়ন প্রথা প্রচলিত। মণির দিদি লাভ্ ম্যারেজ করেছে। জর্জ এলিয়ট প্রভৃতি লেখিকাদের সঙ্গে পরিচিত। পিয়ানোতে দেশী-বিদেশী গান বাজাতে ও গাইতে পারেন। স্বামী ও তাঁর বন্ধুদের সাথে বাড়ীর বাইরে পার্টিতে সারারাত কাটিয়ে আসেন। মণি এদের পরিবারের মধ্যে এসে পড়লেও এবং ইংরাজী স্কুলে লেখাপড়া শিখলেও সম্পূর্ণ পৃথক। উপন্যাসে লেখিকা যথেষ্ট যত্ন সহকারে সেই পার্থক্যটুকু চিত্রিত করেছেন। মণির জীবনবৃত্তান্ত এবং তার প্রণয়ের পরিণতির রূপরেখা চিত্রণই উপন্যাসের প্রধান লক্ষ্য। কাহিনী সরল এবং মণির চরিত্রটি ফ্লাট। উপন্যাসের অধিকাংশ অংশ জুড়ে রয়েছে নায়িকার মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা। স্বর্ণকুমারী মণির পরিচয় দিয়েছেন নিম্নরূপ—

"ইঙ্গবঙ্গ সমাজের সুশিক্ষিত নামা কোন বঙ্গবালা হইতে যে আমার ইংরাজী ব্যুৎপত্তি প্রতিপত্তি কিছু কম, তাহা নহে, আমিও লরেটো কন্‌ভেন্টে শিক্ষা লাভ করিয়াছি, বাবাকে জ্যেঠাইমাকে ও পিসিমাকে ছাড়া আর কাউকে চিঠিপত্র লিখিতে হইলে ইংরাজীতেই লিখিয়া থাকি। সখীদের সহিত কথাবার্তাও অনেক সময় ইংরাজীতেই চলে, আর এ পর্যন্ত যে কত শত ইংরাজী-উপন্যাস কবিতা মস্তিষ্কজাত করিয়াছি, তাহার ত ঠিক ঠিকানাই নাই।" সে যুগে নারী শিক্ষার ধারাই ছিল এমনটি। এই শিক্ষাকে কেন্দ্র করে যে সমাজ গড়ে উঠ্‌ছিল তার পরিচয় দিয়েছেন প্রতাপচন্দ্র মজুমদার—
"There are not a few homes both in Calcutta and mofussils where the style of living is modernised and Europeanised, and there are troops of handsomely dressed children whose parents take pride that they cannot speak their mother tongue but talk either in broken English or often in broken Hindustani."[৪৩]

১৮৯৪ খৃঃ বেথুন স্কুল ও কলেজের রিপোর্টে ইংরাজী শিক্ষার দ্রুত প্রসারের চিত্রটি পাওয়া যায়।[৪৪] হেমলতা দেবী দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় পরিচালিত বিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিলেন। তাঁর বিদ্যালয়জীবনের অভিজ্ঞতার কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি—

"মেয়েরা সারাদিন একটি বাঙ্গালা কথা বলিতে পারিত না। যে বাঙ্গালায় কথা বলিত, তাহার গলায় কৃষ্ণবর্ণ পদক ঝুলাইয়া দেওয়া হইত। দিনান্তে যার গলায় কৃষ্ণবর্ণ পদক দুলিত সেই Black Mark পাইত। এই বিদ্যালয়ে ইংরাজী ধরনে শিক্ষা দেওয়া হইত।"[৪৫] ভারতীতে নারীদের চলন, বলন, কণ্ঠস্বর, প্রসাধন ও ব্যায়াম সম্বন্ধে নির্দেশাবলী দেওয়া হচ্ছিল। "চলন—মাথার উপর একখানি বই রাখিয়া একেবারে সোজা হইয়া হাঁটিতে অভ্যাস করিলে গমন সহজ ও সুন্দর হয়।"[৪৬] একটি মাত্র কৌতুকপ্রদ উদ্ধৃতি দিলাম। ডেপুটী, ব্যাবিস্টার, বিলাত ফেরৎ ডাক্তার- ইঞ্জিনীয়ারদের জন্য সুশিক্ষিতা, রুচিশীলা, পাশ্চাত্য ভাবধারায় পটীয়সী রমণীদের আবির্ভাব ঘটছিল। মৃণালিনী একটু স্বতন্ত্র জীবনবোধের দ্বারা চালিত হলেও ডাক্তার, ডেপুটী, ব্যারিস্টার ছাড়া তার জীবনেরও অন্য গতি নেই। এই সময় নারীমুক্তির প্রশ্নে সমাজ দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল—রক্ষণশীল ও উদারনৈতিক। কতকটা ইংলণ্ডের কন্সারভেটিব্ ও লিবারেলেব মত। শিবনাথ শাস্ত্রীর ভাষায় "একশ্রেণী ভূতকালে গৃহনির্মাণ করেন, আর একশ্রেণী ভবিষ্যতে গৃহনির্মাণ করেন। একশ্রেণী উন্নতির আদর্শের জন্য ভূতকালের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া থাকেন, আর একশ্রেণী আশাপূর্ণ হৃদয়ে ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিপাত করেন।"[৪৭] একদিকে নব্যপন্থী হিন্দুরা আর একদিকে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের নেতারা। নব্যপন্থী হিন্দু নেতাদের বক্তব্য—"ইংরাজী শিক্ষার ফলে মানুষ উগ্র, স্বাধীনতাপ্রিয় এবং কৃত্রিম স্বভাবযুক্ত হয়। আমরা বঙ্গললনাদিগকে ঐ প্রকৃতিবিশিষ্টা দেখিতে ইচ্ছা করি না। সুতরাং তাহাদিগকে ইংরাজী পড়িতে উপদেশ দিতে পারি না।"[৪৮] তবুও সে কালের মেয়েরা ইংরাজী পড়ছিল এবং মৃণালিণীর মত জীবনে স্বামী মনোনয়নে তাদের আদর্শ ছিল—"আমার স্বামীকে আমি জ্যোতিস্মান গৌরবমণি দেখিতে চাই। সংসারে যেমনই হোক, পৃথিবীতে সে আমাকে স্বর্গ দেখাইবে, আমি তাহাতে দেবতা পাইব।" একমাত্র 'ছিন্নমুকুল' ব্যতীত তার সকল উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা হিন্দু। শিক্ষা-দীক্ষায়, আচার আচরণে ব্রাহ্মদের সাথে গরমিল খুবই কম। স্বর্ণকুমারীও বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের[৪৯] মত মনে করতেন ব্রাহ্মসমাজের কাজ হিন্দুর হৃত শক্তিকে জাগিয়ে দেওয়া। সে জাগরণ যখন ঘটে গেছে ব্রাহ্মসমাজের কাজও শেষ হয়েছে।

মণির কৈশোর প্রেম ছোটুর সাথে ফুল দেওয়া নিয়ে। বিদ্যালয়ের পাঠভ্যাসের সাথে প্রণয়ের পাঠভ্যাসও আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। মণি কৈশোরেই উপলব্ধি করেছিল পিতৃপ্রেম ও ছোটু প্রেমের পার্থক্য। চিন্তা ভাবনার চেয়ে আবেগটাই সে বয়সের ধর্ম।

ইউরোপ খণ্ডে উনিশ শতকের মধ্যভাগে একদল মানিনী বিদগ্ধা নাগরিকার

আবির্ভাব ঘটছিল। "The 'Lady' that new social class which had recently come into existence, suddenly emerged from her narrow domesticity, and stepped into the light."[৫০]

স্বর্ণকুমারীর 'কাহাকে?' উপন্যাসের নারী চরিত্রগুলি কেবলমাত্র নারী নয় 'মহিলা' পদবাচ্য। সুবলচন্দ্র মিত্র তাঁর অভিধানে 'মহিলা' শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করেছেন। "মহ্ (পূজা করা)+ইল কর্ম+আপ্।"[৫১] শব্দটি শ্রদ্ধা এবং ব্যক্তিত্ব দ্যোতক। এতদিন নারীজীবনে যে সব অনুভূতি আবেগের সৃষ্টি করতো সেগুলির ধার ও ভাব ক্রমশ নষ্ট হতে লাগলো। জীবন ক্রমশ বুদ্ধি ও যুক্তিনির্ভর হওয়ায় আত্মসম্মানবোধ প্রাধান্য পেতে লাগলো। এ যুগের নারীরা নবলব্ধ মূল্যবোধ ও প্রবণতাগুলির প্রতিষ্ঠার জন্যে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হল। মৃণালিনী উচ্চশিক্ষিতা অথচ উগ্র ইংরাজীয়ানার জন্য রমানাথের উপর বিরক্ত এবং বিব্রত। স্বামী মনোনয়নে তার পূর্ণ অধিকার। স্বামী সম্বন্ধে তার ধ্যান ধারণা দেশকালোচিত। রমানাথ বিলেতে ইংরাজরমণীর প্রেমে পড়েছিল। দেশে ফিরে তাকে শুধু ভোলেনি, অস্বীকার করেছে। দিদি ও ভগিনীপতি রমানাথ ব্যাপারটাকে লঘু করে দেখায় মণি কেবল ব্যথা পায়নি, ঘৃণা করেছে। নারীকে অমর্যাদা করেছে বলেই মণি রমানাথকে মর্যাদা দিতে পারেনি। রমানাথের দিক থেকে সে মুখ ফিরিয়েছে। "রমণী সব পারে যথার্থ প্রেম উপেক্ষা করিতে পারে না, বিধাতা বুঝি এখানেই স্ত্রী-পুরুষের স্বভাবগত বিশেষ পার্থক্য নির্দেশ করিয়াছেন।" মৃণালিনী রমানাথ প্রসঙ্গে বলেছে—"আমার কিন্তু নিদাঘ-নিশীথের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়াছে, নয়নে আর টিটানিয়ার প্রেম দৃষ্টি নাই।" রমানাথ রাজকন্যা ও অর্ধেক রাজত্বের সন্ধান করেছে। গোপনে কুসুমের বাবার টাকার অঙ্কের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। এ সংবাদ মণির জানা। অথচ রমানাথ তা গোপন রেখে মণির কাছে ভালবাসার ভাণ করে। রমানাথের এই ছলনা, নারীর অমর্যাদা বলে মণির মনে হয়েছে। একদিন স্পষ্ট করে তাকে বলতে হল—"আমার ক্ষতির জন্য আমি ভাবিনে—আপনার ভাববার আবশ্যক নেই,—সুবিধার জন্য আমি বিবাহ করতে চাইনে—আপনার সুখ যখন এর উপর নির্ভর করছে না—তখন আমি অব্যাহতি প্রার্থনা করি।" এমন অবিচলিত নারী ব্যক্তিত্ব, এমন স্থির প্রত্যয় বাংলা উপন্যাসে দেখা যায়নি। কুন্দ বা রোহিণীকে এ জাতীয় জটিল মানসিক গতিপথ পরিক্রমা করতে হয়নি। জীবন, প্রেম, স্বামী ও সমাজ সম্বন্ধে তারা এতটা সচেতন ও স্বচ্ছ দৃষ্টির অধিকারিণী ছিল না। রবীন্দ্রনাথের নষ্টনীড় (১৯০১), চোখের বালি (১৯০৩), নৌকাডুবি (১৯০৬), গোরা (১৯১০), চতুরঙ্গ (১৯১৬) এবং ঘরে বাইরের (১৯১৬) নায়িকারা মৃণালিনীর উত্তর পুরুষ। মৃণালিনীর জন্ম ১৮৯৮ সালে।

মৃণালিনীরা আর পুরুষের হাতের পুতুল হবে না। নারীরা আর কেনা-বেচার সামগ্রী নয়। বাইশ বছরের নারী ক্ষোভে-দুঃখে-ঘৃণায় আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলে—"দিদি তোমার দুটি পায়ে পড়ি, তার কাছে (রমানাথ) আর এ কথা পাড়তে বলো না, এ কি কেনা-বেচা যে, সুবিধে বুঝে ক্রমশঃ দর কমাতে হবে?" এ তো ইবসনের নোরার মত নারীব্যক্তিত্বের অনতিস্ফুট আভাস শোনা যাচ্ছে। এ যুগের শিক্ষিত মহিলাদের কণ্ঠে শোনা যাচ্ছে—"স্ত্রীজাতি কেবল পুরুষের জন্যই সৃজিত হইয়াছে, ও ঐ উদ্দেশ্য ব্যতীত উহাদের জীবনের অন্য কোন অভিপ্রায় থাকিতে পারে না, এই অসভ্য ও ঘৃণিত ধারণা স্ত্রীদের সংসারে সাম্য জ্ঞান ও সম-অধিকার লাভের পক্ষে সর্বাপেক্ষা বিপদজনক ও সাংঘাতিক বাধা।"[৫২]

মৃণালিনী ও ডাক্তারের ভালবাসা গভীর হয়েছে। বুঝেছে ছোটু আর রমানাথ এক নয়। মৃণালিনীর মনের ভৌগোলিক পরিচয় বড়ই বন্ধুর। স্বতঃসিদ্ধ পথে মন আর চলতে চায় না। "এখন আর সেকাল নেই, অন্যান্য অনেক আচার-অনুষ্ঠানের ন্যায় সখীদিগের নিকট মন খুলিয়া মনের জ্বালা নিবারণ করিবার প্রথাও নিতান্ত পুরাতন হইয়া পড়িয়াছে, এ কালের মেয়েদেরও মনের দুঃখ সহজে মুখে ফুটিতে চাহে না, বিশেষতঃ এমনতর দুঃখ, ইহা ত কিছুতেই প্রকাশের নহে, আমি মনের কথা মনে রাখিয়া কাষ্ঠহাসি এবং বাক্‌চাতুরীতে তাঁহাকে ক্রমশঃ নিরুত্তর করিলাম।" এ নারী চরিত্র আঁকা বঙ্কিম বা রমেশচন্দ্রের পক্ষে সম্ভব ছিল না। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের হাতে এর পূর্ণ বলয়িত রূপ পাওয়া যাবে।

ডাক্তারকে আত্মনিবেদনের মধ্য দিয়েই মণি প্রেমের প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করলো। এ ভালবাসা তার কাছে 'মর্ম বিজড়িত আকুল আকাঙ্ক্ষায় আত্মদান।' একটি সঙ্গীতকে কেন্দ্র করে যে প্রেমের প্রথম পদসঞ্চার জীবনের নানা জটিলতার মধ্য দিয়ে সে সঙ্গীত সমে এসে মিলেছে।

স্বর্ণকুমারী দেবী তাঁর সময়কার দার্শনিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভাবনার অংশীদার। সে সময় সামাজিক রূপান্তরের অপেক্ষা চিন্তার রূপান্তর ঘটছিল আরো দ্রুতগতিতে। নারীব্যক্তিত্ব ও তার বিবর্তনকে তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন। আধুনিক শিক্ষায় পরিবারের চেহারা পালটে যাচ্ছে। পুরনো মূল্যবোধগুলি সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে। অবশ্য স্বর্ণকুমারীর অভিজ্ঞতার গণ্ডী ছিল খুবই সংকীর্ণ। তা সত্ত্বেও এই সব রূপান্তর তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। এইখানে তাঁর নারীর সহজাত বাস্তববোধ কাজ করেছে।

নায়িকা মৃণালিনী উচ্চশিক্ষিতা। পাশ্চাত্য আচার-আচরণে সে রপ্ত হলেও দাম্পত্য

জীবনে সে কিন্তু স্বামীকেই দেবতা বলে মনে করেছে। স্বামীর মধ্য দিয়েই সে বিশ্বের সঙ্গে নূতন করে পরিচিত হতে চাইলো। তবুও সে সমাজের হাতের পুতুল হতে রাজি নয়। বিদ্যা ও বিত্ত নয়, প্রেমকেই সে মূল্য দিতে চেয়েছে। প্রেমভিক্ষা বা যাচ্ঞা করার বস্তু নয়। রমানাথের সাজান সাজান কথা, সাজান আদব-কায়দা, আচার-আচারণকে সে ঘৃণা করেছে। মৃণালিনীর হৃদয় জ্বালা শান্ত করেছে সত্যবাদী, সদাচারী এবং নিষ্ঠাবান ডাক্তার। মৃণালিনীর মানসিক পরিস্থিতির ব্যাখ্যা ক্ষুদ্র উপন্যাসটির সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। মৃণালিনীর মত মহিলারা লেখিকার জবানীতে আর সন্তুষ্ট রইলো না। আত্মজবানীতে অর্থাৎ উত্তম পুরুষের আশ্রয় নিতে হল। এক অর্থে এ কালের মহিলাদের আত্মজীবনী হোল-এই উপন্যাস।

স্বর্ণকুমারী স্বয়ং থিয়োসফিক্যাল সোসাইটীর সভ্যা ছিলেন। স্বামীর সঙ্গে নিয়মিত মাদ্রাজে সোসাইটীর সম্মেলনে যোগ দিতেন। হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থানের পিছনে সোসাইটীর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। তাই বলে তিনি ঘোড়ার পিছনে গাড়ী জুড়তে চাননি। তিনি জানতেন সমাজ-পরিবারের ধর্ম এগিয়ে যাওয়া। অগ্রগতিকে ক্ষণকালের জন্য স্তব্ধ করা যায় কিন্তু থামিয়ে দেওয়া যায় না। অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সুফলগুলি নারী জীবনের অবরোধ খর্ব করছিল। মহিলারা বুঝেছেন তাঁদের ভারতীয় সংস্কৃতির বাহক হতে হবে। পরিবর্তনের নামে অনুকরণ নয়, জাতীয় ভাবাদর্শকে বিকৃত করা চলবে না। বিদুষী কৃষ্ণভামিনী দাসী নারীদের উদ্দেশ্যে বললেন—"সংস্কার সাধনের জন্য আমাদের অতি সতর্ক ভাবে চলা উচিত। আজকাল অনেক পাশ্চাত্য সভ্যতাভিলাষী যুবকেরা আমাদের সমাজব্যবস্থা আগাগোড়া ভাঙ্গিয়া চুরিয়া উহা ইউরোপীয় বা ইংরাজী ধরণের নূতন করিয়া গড়িতে চান, উহার কর্মে তাহাদের মন উঠা ভার। কিন্তু ফ্রাইং প্যানে লুচি ভাজায় যেমন ঘিয়ের শ্রাদ্ধ করা হয়, ইউরোপীয় বা ইংরাজী আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া ভারতীয় সমাজ নির্মাণের চেষ্টা পাইলে সেইরূপ পরিশ্রমের অপব্যয় করা হইবে।"[৫২ক] ১৮৮৪ সালে রচিত ধীরেন্দ্রনাথ পালের 'সঙ্গিনী বা গার্হস্থ্য নীতির প্রথম ভাগ' নামক গ্রন্থে বিবাহ, ভালবাসা, স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ প্রভৃতি বিষয়ে ভারতীয় আদর্শকে যুগের উপযোগী করে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'গৃহধর্ম' 'বক্তৃতা স্তবক' প্রভৃতি গ্রন্থে একই কথা বলতে চেয়েছেন।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক রূপান্তরের ফলে সমাজ ও পরিবারের চেহারার রূপান্তর হচ্ছিল। সমাজে নারী-পুরুষের, পরিবারে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার মূল্যবোধগুলির রূপান্তর ঘটছিল। এই রূপান্তরের সাহিত্যিক রূপ উপন্যাস ব্যতীত আর কিছু হওয়া সম্ভব ছিল না। "Men lived in a social and economic world which was real, and

the most real part of their behaviour was that which changed or in some way determined their position in that world".[৫৩]

ইংরাজী শিক্ষার মধ্য দিয়ে যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠছিল তাদের সব কৌতূহল কেন্দ্রীভূত হয়েছিল সমাজ ও অর্থনীতিতে। তারা চাইছিল সামাজিক মর্যাদা ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠা। এখন আর জাত-ধর্মের কৌলীন্য বড় কথা নয়—বড় কথা অর্থনীতি-ভিত্তিক সামাজিক কৌলীন্য। এই কৌলীন্য গড়ে তুলেছে ইংরাজী শিক্ষা। জগচ্চন্দ্রের পরিবার, মোহনদের পরিবার, মৃণালিনী, রমানাথ, ব্যারিষ্টার, ভগিনীপতি সবারই কৌলীন্য সামাজিক মর্যাদা ও অর্থনৈতিক সঙ্গতি। স্নব্ ইংরাজী শব্দটি আলোচ্য উপন্যাসের বিশেষ এক শ্রেণীব চরিত্রের আংশিক পরিচয়। এই নূতন মূল্যবোধের প্রবর্তক এবং তার শিল্পসম্মত রূপের রূপকার মধ্যবিত্ত শ্রেণী। এই রূপান্তর চলে ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে, পবিবার থেকে পরিবারে।

স্বর্ণকুমাবী তাঁর উপন্যাসের রূপ ও রীতির ক্ষেত্রে বহুলংশে বঙ্কিম নির্ভর। লেখিকা উপন্যাসের চরিত্রগুলিকে যেমন মহাপুরুষ করতে চাননি, তেমনি চরিত্রহীন লম্পট করেও আঁকেননি। তিনি চরিত্রগুলিকে করেছেন অন্তর্মুখীন। নায়ক—নায়িকারা তাদের ব্যক্তিগত আবেগ, আসক্তি দ্বারা চালিত হয়েছে। ইংরাজীতে যাকে বলে 'personal vision' স্বর্ণকুমারী সেই দৃষ্টিভঙ্গীরই অধিকারিণী ছিলেন। বঙ্কিম উপন্যাসের চরিত্রগুলি নৈর্ব্যক্তিক সত্যের ধারক ও বাহক। বঙ্কিম দর্শকের ভূমিকা থেকে চরিত্রেব গুণাগুণ দেখেছেন এবং একজন দর্শকের মত উপন্যাসে চরিত্র ও ঘটনা চিত্রণের পাশে পাশে মন্তব্য, ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ এবং নিজের বিচারবুদ্ধির প্রয়োগ করে একটা সত্যে পৌঁছতে চেয়েছেন। স্বর্ণকুমারীর মধ্যে প্রাধান্য পেয়েছে নারীর ব্যক্তি-রূপ। স্বর্ণকুমারীর উপন্যাসের নায়ক-নায়িকারা নিজেরাই উপন্যাসে তাদের স্থান করে নেয় এবং ধীরে ধীরে কাহিনী ও ঘটনার উপর তাদের প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। স্বর্ণকুমারী বিবিক্ত কাহিনী দর্শকের নয়, জীবনভোক্তার। সম্ভবতঃ স্বর্ণকুমারীই প্রথম ঔপন্যাসিক যিনি ব্যক্তিজীবনের গভীর রহস্য উদঘাটনে ব্রতী হয়েছেন। এর জন্য বুদ্ধির জটিল কসরৎ অপেক্ষা অশ্রুর নিঃশব্দ ধারাপাতকে অধিক মূল্য দিয়েছেন। তিনি মানসিক জটিল ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা অপেক্ষা প্রাধান্য দিয়েছেন হৃদয়কে। বাংলা কবিতার মত বাংলা উপন্যাসও ক্রমশই সাব্জেকটিভ্ হচ্ছে। এই নূতন মূল্যবোধের প্রবর্তক এবং শিল্পসম্মত রূপের রূপকারও মধ্যবিত্ত শ্রেণী। এই রূপান্তর চলে ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে, পরিবার থেকে পরিবারে।

ইউরোপে গৃহসংস্কারের মধ্য দিয়ে সমাজ ও নারীদের সংস্কার পরিপূর্ণতা

লাভ করেছিল।[৫৪] জেমস বিনের 'Family Worship' (1812)-এর মূল বক্তব্য 'Families are the nurseries of the state'. Heman's Female Instructor or Young Woman's Companion (1835, London)[৫৫] গ্রন্থে আলোচ্য বিষয়সূচীর সঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রীর 'গৃহধর্ম', সতীশচন্দ্র চক্রবর্তীর 'ললনাসুহৃদ', ধীরেন্দ্রচন্দ্র পালের 'সঙ্গিনী' প্রভৃতি গ্রন্থগুলির উদ্দেশ্য ও বিষয়সূচী পাশাপাশি রাখলেই বোঝা যায় ইউরোপীয় সমাজ ও পরিবার উন্নয়নে গৃহীত পদ্ধতি ও পরিকল্পনা এ দেশেও গ্রহণ করা হয়েছিল। স্থান-কাল ও পাত্রের ভেদে তা ব্যবহৃত হয়েছে মাত্র। উনিশ শতকের শেষপাদে ইউরোপে ও ভারতবর্ষে পরিবার ও পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে যে ধারণা গড়ে উঠতে লাগলো তার সাথে মধ্যযুগীয় পরিবার ও পারিবারিক জীবনের আদৌ কোন মিল নেই। কেননা '......' the medieval family was large, loose and undemanding'.[৫৬] গতানুগতিক জীবন—বংশবৃদ্ধি, সম্পত্তির অধিকার ও পরিবারের অস্তিত্ব রক্ষা। মধ্যযুগীয় জীবন ছিল সমাজগত। অধুনাকালে এল পরিবারগত জীবন। 'Domesticity in the modern sense started to emerge. The family concentrated itself and turned inward, privacy became important, the education of children assumed major proportions and women acquired a great many new duties and responsibilities".[৫৭] জীবন ও পরিবারকে ঘিরে থাকে ধর্ম, শিক্ষা, সমাজ প্রভৃতি। এগুলির রূপান্তর চলছিল। এই রূপান্তরে নারীর ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্যের বিকাশ ঘটছিল।

'কাহাকে ?' উপন্যাসের নায়িকা মৃণালিনী নিজেই নিজের কথা বলেছে। চরিত্র-প্রধান উপন্যাস। নায়িকার রূপের চেয়ে গুণের বহর বড়। নায়করা রূপমুগ্ধ নয়, গুণমুগ্ধ। মৃণালিনী বঙ্কিম-রমেশের নায়িকাদের মত অসহায় নয়, লজ্জায় মূক-বধির নয়। নিজের চাওয়া-পাওয়া সম্বন্ধে যেমন সচেতন তেমনি নিজের আত্মসম্মান বোধও প্রখর। বাইরে থেকে যে সব ঘটনার তরঙ্গ এসে তার উপর পড়েছে তার চিত্রণেই লেখিকা সময় অতিবাহিত করেননি। বরং অন্তর গভীরে যে বিচিত্র অনুভূতি জাগছিল এবং রূপান্তর চলছিল তারই নির্ভরযোগ্য চিত্র উপস্থিত করেছেন। এ সমাজে চাওয়া ও পাওয়ার মধ্যে ক্রমশই ব্যবধান সৃষ্টি হচ্ছে। নায়িকারাও তাই বহুলাংশে রহস্যময়ী। উপন্যাসে মনস্তত্ত্ব প্রাধান্য পাচ্ছে। 'মালতী' গল্পে—লেখিকা "মনের নিউটনের" জন্য উন্মুখ হয়েছেন। "কিসে যে হৃদয়ের কি হয়—কি প্রাকৃতিক নিয়মে যে তাহা চলিতেছে তাহা নির্ণয় করা বড় সহজ নহে। নিউটন গেলিলিও অনেক ভাবিয়া বাহিক জগতের নিয়ম বাহির করিয়াছেন, কিন্তু মনের নিউটন এখনও জন্মগ্রহণ করেন নাই। আর কবেইবা জন্মাইবে

কে জানে।" (পৃ—৫৬)। মনের নিউটন ব্যতীত শিক্ষিতা নবীনা রমণীকুলের চরিত্র চিত্রণ আর সম্ভব নয়। সম্ভবতঃ ফ্রয়েডের জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। "একালে একটা নূতন ধরণের স্ত্রীসমাজ গঠিত হইতেছে, এ দলের রমণীর নাম New woman বা নূতন ছাঁদের রমণী, ইহারা এই প্রাচীন কথার বিপক্ষে। স্ত্রী পুরুষে বিভেদ থাকিবে কেন ? সকলে সমান এ ধুয়া কিছু নূতন নয়, কিন্তু এই 'নিউ উওম্যান' এ ধুয়ার সুরটুকু সপ্তমে তুলিয়া ধরিয়াছেন।"[৫৮] নব্য ভারতের সম্পাদক জানিয়ে দিলেন কালান্তরেব কামিনীদের আবির্ভাব হয়ে গেছে। স্নেহলতা, মৃণালিনী, মৃণালিনীর দিদি, জ্যোতির্ময়ী, হাসি, মালতী, সুশীলা, নিরজা প্রভৃতি নিউ উওম্যানদের চরিত্র চিত্রণের জন্য—নিউটনের মত অন্তর্ভেদী দৃষ্টি চাই।

স্বর্ণকুমারীর বিচিত্রা (১৯২০), স্বপ্নবাণী (১৯২১) ও মিলনরাত্রি (১৯২৫) স্বতন্ত্র তিনটি নামে বিভক্ত হলেও, উপন্যাস হিসাবে একটি। ডঃ পশুপতি শাসমলের মতে, 'বিচিত্রা', 'স্বপ্নবাণী' ও 'মিলনরাত্রি'র মধ্যে ঘটনার যোগ আছে বলে আমরা ঐ তিনটি উপন্যাসকে 'ত্রয়ী' (Trio) এই অভিধায় চিহ্নিত করেছি।"[৫৯] বাংলা সাহিত্যে রাজনৈতিক উপন্যাস রূপে—এই তিনখানির মূল্য যথেষ্ট। উপন্যাসের পটভূমিকা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন। এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে কংগ্রেসের ভূমিকা, বিদেশী পণ্য বর্জন, স্বদেশী শিল্প গঠন, ইংরেজদের অত্যাচারে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের প্রসার প্রভৃতি দেখা দিয়েছিল। স্বর্ণকুমারী স্বামী জানকীনাথ ঘোষালের সঙ্গে জাতীয় কংগ্রেসের আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। বোম্বাই ও কলকাতার মহাসভায় কাদম্বিনী ও স্বর্ণকুমারী মহিলা প্রতিনিধি রূপে যোগদান করেছিলেন। উপন্যাসের সূচনা রাজনৈতিক প্রসঙ্গ দিয়ে, পরিসমাপ্তিও রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে, জ্যোতির্ময়ীর মৃত্যুতে।

বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠে (১৮৮২) "একটা বিশেষ আইডিয়া মূর্তিলাভ করিয়াছে।"[৬০] উপন্যাসটির প্রতিপাদ্য বিষয় দেশপ্রীতি ও নিষ্কামকর্ম। রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' (১৯১০) এবং 'ঘরেবাইরে' (১৯১৬) উপন্যাসে বিশেষ কালের রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ও বক্তব্য লক্ষ্য করা যাবে। বঙ্কিমের আইডিয়া প্রাধান্য লাভ করায় চরিত্র ও কাহিনী দানা বেঁধে ওঠেনি। "বঙ্কিমের সন্তান সেনা বৈষ্ণব···।"[৬১] অর্থাৎ অহিংস পন্থী। রবীন্দ্রনাথ ও স্বর্ণকুমারী দেবীও ভারতীয় রাজনীতিতে সহিংস অপেক্ষা অহিংস নীতিকেই সমর্থন করেছেন। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'গোরা'' আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, "গার্হস্থ্য জীবনে এখানে অনেকটা স্বধর্মচ্যুত হইয়া বৃহত্তর সমাজ প্রতিবেশের অধীনতাই স্বীকার করিয়াছে। অধিকাংশ পরিবারের উদ্দাম কলকোলাহল ঘরের নিভৃত আত্মসমীক্ষা বা অন্তরঙ্গ ভাববিনিময়কে যথাযোগ্য মর্যাদা দেয় নাই।"[৬২] একথা ঠিক ভাবীকালের

গার্হস্থ্য জীবনের রূপ রবীন্দ্রনাথ গোরাতে উপস্থাপিত করেছেন। স্বর্ণকুমারী দেবীর রাজনৈতিক উপন্যাসে তাঁর ব্যক্তিজীবনের নানাপ্রসঙ্গ স্থান পেয়েছে। উপন্যাসে বর্ণিত পিতা ও কন্যার মধুর সম্পর্কে মহর্ষি ও স্বর্ণকুমারীর ব্যক্তি জীবনের নানা ঘটনা ঠাঁই পেয়েছে। স্বয়ং দ্বিজেন্দ্রনাথ কৃষ্ণলালের চরিত্রের অনেকখানি জুড়ে আছেন। জ্যোতির্ময়ীর মধ্যে সরলাদেবীর আত্মপ্রকাশ লক্ষ্য করি। হাসিদের বাগানবাড়ী, হাসি জ্যোতির্ময়ীর সখ্য, বিবাহ উপলক্ষে নানা খাবার তৈরীর বর্ণনা, নৌকা বিহার, প্রভৃতি অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে।

উপন্যাসের মূল ঘটনাগুলি ঘটেছে প্রসাদপুর ও কলকাতায়। রাজকুমারী জ্যোতির্ময়ী, গৃহশিক্ষক দেবব্রত ভট্টাচার্য, রাজা অতুলেশ্বর, ডাক্তার শরৎকুমার, বিজনকুমার, গুরুদেব প্রভৃতি প্রধান চরিত্রগুলি প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। উপন্যাসটিতে নায়ক-নায়িকাদের ব্যক্তিজীবনের প্রণয় ভাবনার চেয়েও বড় হয়ে উঠেছে দেশের রাজনৈতিক ভাবনা। জ্যোতির্ময়ী একটি আইডিয়ার প্রতিরূপ হয়ে উঠেছেন। শরৎকুমার প্রসঙ্গেই তাকে মাঝে মাঝে মাটির পৃথিবীতে ধরা ছোঁয়ার মধ্যে পাওয়া যায়।

'বিচিত্রা'র আরম্ভে স্বর্ণকুমারী লিখেছেন—'জয় ঔপন্যাসিকের জয়। এখন আর বাঙালী ঘরে বয়স্কা অবিবাহিতা কন্যা বা প্রেম পরিণয় লেখিকার কল্পনামাত্র নহে, ইহা ঘরের কথা, দৈনন্দিন ঘটনা।...অষ্টাদশ বর্ষীয়া হাসি অবিবাহিতা।" হাসি, জ্যোতির্ময়ী, মালতী, স্নেহলতা, মৃণালিনী, অমরগুচ্ছের নায়িকা, সুশীলা, নিরজা প্রভৃতি নায়িকাদের বয়স পনেরো বৎসরের কম নয়। ১৮৭২ খৃঃ ব্রাহ্ম বিবাহ বিল এবং পরবর্তীকালে সহবাস সম্মতি সূচক আইনে নির্দিষ্ট বয়সকেই তিনি নায়িকার বয়স বলে গ্রহণ করেছেন। নায়কদের বয়সও ২২ বৎসরের নীচে নয়। হাসির জীবনে শরৎ ও বিজন দুজনের আবির্ভাব। হাসি শরৎকে ভালবাসে। হাসির মনোনয়নের অধিকার স্বীকার করা হয়নি। আবার জ্যোতির্ময়ীর ক্ষেত্রে পিতা অতুলেশ্বর মনোনয়ন ব্যাপারটা কন্যার হাতেই ছেড়ে দিয়েছেন।

কুন্দমালার হিন্দুমেলায় লাঠিখেলা, ব্যায়ামচর্চা, পণ্ডিতের ইলবার্ট বিল নিয়ে বক্তৃতা প্রভৃতি জ্যোতির্ময়ীকে দেশানুরাগে উদ্বুদ্ধ করেছিল। ন্যাশানাল বোধ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

"ন্যাশানাল শব্দটা যখন বাঙলা দেশে প্রথম প্রচার হয় তখনকার কথা মনে পড়ে। একদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া হঠাৎ দেখা গেল, চারিদিকে ন্যাশানাল পেপার, ন্যাশানাল মেলা, ন্যাশানাল থিয়েটার,—ন্যাশানাল কুজঝটিকায় দশদিক আচ্ছন্ন।"[৬৩] বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে সেই কুজঝটিকা কেটে স্বদেশীবোধ স্থির আলোর মত প্রতীত হবে। নারী

পুরুষ নির্বিশেষে দেশ ও জাতির ভাবনায় একাত্ম হবে। জ্যোতির্ময়ীর মুখে শুনি—"আমি একজন সামান্য বাঙালী মেয়ে, অন্যায়ের দমনে এত তেজ, এত বল অনুভব করছি আমি কোথা থেকে? আমাদের দেশের আকাশে বাতাসেই কি সে তেজ ছড়ানো নেই? আমি নিশ্চয়ই বলছি, আমি যেমন আজ এখানে এ রকম করে ভাবছি—তেমনি আরো অনেকেই ভাবছেন।" পণ্ডিত মশায়ের সামনে আনন্দমঠের দেবীমূর্তি প্রত্যক্ষ হয়ে উঠলো। তিনি গদগদ কণ্ঠে বললেন—'বন্দে মাতরম্'। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে বন্দে-মাতরম্ জাতীয় সঙ্গীতে পরিণত হয় এবং সমস্ত জাতির চিত্তে অভূতপূর্ব উন্মাদনা ও শক্তি জোগায়।

প্রমাতাময়ী বিচিত্রাদেবীর অশ্বারূঢ়া বীরাঙ্গনা মূর্তিটি ঝান্সীরাণীর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বিচিত্রাদেবী একটি আইডিয়ার মত প্রতিভাত হয় এবং তার বাস্তবসম্মত রূপ জ্যোতির্ময়ী। তিনি রাজবাড়ীতে বিদ্যালয়, দেশের ছেলে-মেয়েদেয় জন্য ব্যায়াম-সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। ইংরাজী সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি তার মোহের জন্য ইংরাজ বিতাড়িত ভারতের কথা তিনি ভাবতে পারেন না। সমিতির ছয় দফা নিয়মাবলীর মধ্যে অন্যতম হল—'ভারত সম্রাটের শুভ কামনা করিবে।' মিলনরাত্রিতে অনাদি-জ্যোতির্ময়ী, গুরুদেব-জ্যোতির্ময়ী, শরৎ-জ্যোতির্ময়ী কথোপকথনের মধ্য দিয়ে সে সময়ের রাজনৈতিক পটভূমিকাটি সুন্দর ভাবে তুলে ধরেছেন। দেশে তখন সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন এবং নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন দুটিই পাশাপাশি চলছিল। বঙ্কিমের আনন্দমঠের প্রভাবে ভারতজননীর একটা মানসস্বরূপ গড়ে উঠেছিল। ভারতজননী 'সাম্যমৈত্রীর অধিশ্বরী দেবী।'

অতুলেশ্বর কন্যার দেশহিতকর কর্মযজ্ঞের অন্যতম উৎসাহ দাতা। জাতীয় মহাসভার তিনি পৃষ্ঠপোষক। তেমনি জমির জন্য সরিকের সঙ্গে লাঠিয়াল নিয়ে লড়াই করতেও দ্বিধা করেন না। পিতা-পুত্রী থিয়োসফিক্যাল সোসাইটীর দ্বারা প্রভাবিত। থিয়োসফিষ্ট পত্র পড়ে জ্যোতির্ময়ী গুরু সন্দর্শনের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন। মিলনরাত্রির প্রথম পরিচ্ছেদে গুরুরূপে যিনি আবির্ভূত হন তিনি চরমপন্থী নেতা। "শরীর পতন কিংবা মন্ত্রের সাধন"—এই গুরুর মন্ত্র। এদের সাধনা বিদেশী বিবর্জিত ভারত। জ্যোতির্ময়ী আশৈশব যে শিক্ষা ও পরিবেশে মানুষ হয়েছেন তাতে ইংরাজ অপসারণের কথা তার মনে ঠাঁই পায়নি। বরং তিনি মনে করতেন ভারতবাসী ইংরাজের সমকক্ষ হলেই ইংরাজের অত্যাচার বন্ধ হয়ে যাবে।

বিচিত্রাতে অনাদি বঙ্গভঙ্গ, রাখিবন্ধন, বিদেশীপণ্য বর্জন প্রভৃতি আন্দোলনের প্রসঙ্গ উপস্থাপন করেছে। পণ্ডিত মশাই খুড়ীমার চরকা কাটার প্রসঙ্গটি পরিবেশন

করেছেন। 'বিবেকানন্দের সুন্দর প্রতিমূর্তি'—সে সময় বাঙলাদেশের তরুণের ধ্যানের বস্তু। অনাদি জ্যোতির্ময়ীকে বলেছে, "কাঁচের চুড়ি ও বিলাতী ফিতা মেয়ে মহল থেকে একেবারে উঠিয়ে দাও। তোমার স্কুলের মেয়েরা চরকা কাটে বটে, কিন্তু তাতেই শুধু হবে না, গাঁয়ে গাঁয়ে চরকা ধরাও, তাঁত বোনার ব্যবস্থা কর—অধিকন্তু এ রাজ্যে বিলাতী জিনিস আদৌ স্থান না পায়, দোকানদারদের উপর কড়া হুকুমজারী করে পাঠাও।" জ্যোতির্ময়ী এ প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেছে। তাঁত অর্থবানের বিলাসদ্রব্য উৎপাদন করে। দোকানদাররা দরিদ্র, তাদের দোকান বন্ধ করলে রুজি-রোজকার বন্ধ হবে। এ সব কথা রবীন্দ্রনাথের 'কালান্তর' প্রবন্ধ সংকলনে এবং 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। ঠাকুর পরিবারের রাজনৈতিক ও সামাজিক ভাবনাই রবীন্দ্রনাথ ও স্বর্ণকুমারীর রচনায় প্রতিফলিত হয়েছে।

'স্বপ্নবাণী'-র পঞ্চম পরিচ্ছেদে সন্ত্রাসবাদীদের দুর্গের (মাতৃমন্দির) সুন্দর চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। মাতৃসেবকরা বিবেকানন্দের শিষ্যদের মত গেরুয়া বসন পরিধান করে।

প্রসাদপুর কন্‌ফারেন্স, বন্দেমাতরমের উপর নিষেধাজ্ঞা, ইংরাজ শাসকের অত্যাচার প্রভৃতির সঙ্গে হুবহু মিল বরিশাল কন্‌ফারেন্সের।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন জাতীয় সংহাত গড়ে তুলতে এবং কংগ্রেসকে জনগণের প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। চরমপন্থীরা নরমপন্থীদের ইংরাজ ও তার রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি মোহকে তীব্র ভাষায় ধিক্‌কার জানাচ্ছিল। স্বদেশী সমাজ গড়ে তোলার আন্দোলন ক্রমশই তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছিল। চরমপন্থীরা উপলব্ধি করেছিলেন টুকরো টুকরো সমাজসংস্কার দিয়ে জাতির মুক্তি লাভ সম্ভব নয়। চাই স্বরাজ। প্রসাদপুরের কন্‌ফারেন্স নরমপন্থীদের কন্‌কারেন্স। স্বর্ণকুমারী, জানকীনাথ ঘোষাল, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং ঠাকুর পরিবারের প্রায় সকলেই মডারেটপন্থী। গোখেলের ভাষায় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন—"a landmark in the history of our National progress." একমাত্র বাংলাদেশেই বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে পাঁচশত সভা ডাকা হয়েছিল। পূর্ববঙ্গ থেকে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে ৭০,০০০ সহি সংগ্রহ করা হয়েছিল। বরিশাল কন্‌ফারেন্স হয় ১৯০৫ সালে। এই সভার সভাপতি ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইংরাজ সরকার সভায় বন্দেমাতরম্ ধ্বনি নিষিদ্ধ করেন। ইংরাজ আমলার আদেশ অমান্য করায় সুরেন্দ্রনাথ বন্দী হন এবং জামিনে মুক্তিলাভ করেন। মুক্তি লাভের পর সভায় উপস্থিত মহিলাদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতায় বিদেশীপণ্য বর্জনের আহ্বান জানান। মহিলাগণ হুলুধ্বনি সহকারে জাতীয় জীবনতরীর কর্ণধারের কথায়

সম্মতি জ্ঞাপন করেন।[৬৪] প্রসাদপুরের সভাপতির বক্তৃতার সাথে ১৯০২ সালে সুরেন্দ্রনাথের সভাপতির ভাষণের যথেষ্ট মিল লক্ষ্য করা যায়। বরিশালের কেম্প সাহেব সভায় উপস্থিত হয়ে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি বন্ধ করে সমবেত জনতাকে গৃহে ফিরে যেতে বলেন। ফিরে যাওয়ার প্রশ্নে বিপিনচন্দ্র পাল ও দীনবন্ধু মিত্রের সঙ্গে ব্যারিষ্টার বিজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও কৃষ্ণকুমার মিত্রের মতবিরোধ হয়। শেষোক্ত দুজনের মতে, "পুলিশ লাঠি ও গুলি দিয়ে সভা ভেঙ্গে দিক আমরা নিজেরা যাব না।"[৬৫] কেম্প সাহেব জানিয়ে দিলেন সৈন্য দিয়ে সভা ভেঙ্গে দেওয়া হবে। সভায় উপস্থিত সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলাদের অপমান ও কষ্টভোগ নারীর দেশপ্রেমকেই তীব্র করে তুলেছিল। নরোত্তমপুর নিবাসী শ্রীতারাপ্রসন্ন বসুর স্ত্রী সরোজিনী বসু দক্ষিণ হস্তের বালা অশ্বিনী-কুমার দত্তের হাতে পৌঁছে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন—"প্রতিজ্ঞা করিলাম যে, যে পর্যন্ত 'বন্দেমাতরম্' বলা নিষেধী সার্কুলার রহিত না হইবে, সে পর্যন্ত ঐ হাতে আর সোনার বালা পরিব না। বন্দেমাতরম্।"[৬৬] বাখরগঞ্জের মহিলারা শপথ করেছেন বন্দেমাতরম্ নিষেধী সার্কুলার রহিত না হওয়া পর্যন্ত তারা চুলে তেল দেবেন না, কেশবিন্যাস করবেন না। 'বরিশাল হিতৈষী' পত্রিকায় কলসকাঠির একটি সংবাদে জানা যায় সেখানকার মহিলারা গেরুয়া পরিধান করেন এবং অলঙ্কার বর্জন করেছেন। চুলে তেল দেন না, কেশ বিন্যাস করেন না। "রমণীগণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন—যে পর্যন্ত আপনাদিগের স্বামী, পুত্র, ভ্রাতা প্রভৃতি আত্মীয়স্বজনগণ আত্মরক্ষা করিতে এবং আত্মসম্মান বজায় রাখিতে সমর্থ না হইবেক, সে পর্যন্ত তাঁহারা এইরূপ বেশেই থাকিবেন।"[৬৭] ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর বাঙলা দ্বিখণ্ডিত হল। সেদিন পাঁচশত বঙ্গনারী অরন্ধন পালন করে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর বাড়ীতে জমায়েত হয়ে স্বদেশীব্রত পালনের শপথ করেন।[৬৮]

স্বর্ণকুমারী দেবী জাতীয় আন্দোলনের এক গুরুত্বপূর্ণ সময়কে উপন্যাসের পটভূমিরূপে গ্রহণ করেছেন। উপন্যাসে জাতীয় আন্দোলনের নেত্রীরূপে জ্যোতির্ময়ী চরিত্রের অবতারণ যথাযথ হয়েছে। জাতীয় আন্দোলনে নারীর একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। সে সময়ের পত্র-পত্রিকায় এ কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছিল। "এস ভাই, এস বোন, মাতৃপূজার দিন ক্রমশ নিকটস্থ হইতেছে—আমরা এই সময় হইতে উহার যথাবিহিত আয়োজনে বদ্ধপরিকর হই। ঐ শুনি নিশীথকালে নিদ্রামগ্ন প্রকৃতির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া সুমধুর কণ্ঠে কে গাহিতেছে, 'বন্দেমাতরম্'।"[৬৯] কলকাতা কংগ্রেসে স্বর্ণকুমারী ও কাদম্বিনী দেবী প্রতিনিধিত্বের সম্মান লাভ করেন। ধীরে ধীরে বোম্বাই, মাদ্রাজ, গুজরাত এবং অন্যান্য প্রদেশ থেকেও মহিলা প্রতিনিধিরা আসতে থাকেন।

নারীদের প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ অনেকেই ভাল চোখে দেখলেন না।

'নব্য ভারত' পত্রিকার সম্পাদক শ্লেষের সঙ্গে বললেন, "তবে শিক্ষিত মহিলারা যদি একটা মেয়ে কংগ্রেস গড়িতে পাবেন, তবে গোবর্ধন ধারণটাও বাকী থাকিবে না।"[৭০] ১৯০৬ সালে কলকাতা কংগ্রেসের সঙ্গে মহিলা সম্মেলন হল। নব্যভারত সম্পাদকের সরস বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য—"আমরা না হয় সন্তান পালনে নিযুক্ত হই। কিন্তু কর্মক্ষেত্র হইতে মনমোহিনী-গণ যখন গৃহে ফিরিয়া আসিবেন, তখন তাঁহাদের সান্ত্বনার জন্য আমরা কোমল হস্ত, স্নেহময় প্রাণ এবং কটাক্ষ কোথায় পাইব।"[৭১] অভিযোগ করা হল নারীস্বাতন্ত্র্যের ফলে গৃহের শান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে এবং নারীও তার গৃহকর্মে অবহেলা করছে। সমসাময়িক কালে ইংলণ্ডের রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণ নিয়ে একশ্রেণীর লোকের মাথাব্যথা দেখা দিয়েছে। "All political firebrands and moral insurgents they are specially distasteful, warring as they do against the best traditions, the holiest functions, and the sweetest qualities of their Sex."

এখানে থামলো না—"Quick as disagreeable as the bearded chin, the bass voice, flat chest, and lean hips of a woman who has physically failed in her rightful development, the unfeminine ways and works of the wild women of politics and morals are even worse for the world in which they live."[৭২]

প্রগতিবিরোধীদের ভূমিকা সবদেশে ও কালে একই রকম। বিরোধিতা সত্ত্বেও কি ইংলণ্ডে, কি বাংলাদেশে রাজনীতির ক্ষেত্র নারীর পদধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠলো।

নরমপন্থীদের ইংরাজের কাছে আবেদন-নিবেদনে কোন ফল হল না। ইংরাজের নিপীড়ন ক্রমশই বেড়ে চললো। লর্ড কার্জনের জনস্বার্থ বিরোধী নীতিগুলি ভারতীয়দের চরম রাজনীতি ও প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দিকে ঠেলে দিল।৭৩ স্বর্ণকুমারী নরমপন্থী হলেও ঐতিহাসিক সত্যকে বিস্মৃত হননি। সত্যপ্রীতি সাহিত্যিকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মিলন-রাত্রির তৃতীয় পরিচ্ছেদে লেখিকা স্বীকার করেছেন ইংরাজের দমননীতিই এনার্কিজম ডেকে এনেছে। মানিকতলার মামলায় ধৃত আসামীদের জন্য অতুলেশ্বর প্রভৃত অর্থ সাহায্য করেছেন। রাজা অতুলেশ্বর, জ্যোতির্ময়ী, অনাদি ও শরৎ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যো-পাধ্যায় মহাশয়ের ভাবশিষ্য।

একদিকে নরমপন্থীদের চরম ব্যর্থতা, আর একদিকে চরমপন্থীদের ক্রিয়াকলাপে সারা দেশে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। চারিদিকে ইংরাজের নিপীড়নও বেড়ে চললো। জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে জ্যোতির্ময়ী বিচলিত। বিপ্লবী গুরুর কাছে

সে দীক্ষা নিতে চাইলো। গুরু মন্তব্য করলো—"আপনার ব্রত আমার ব্রত একই—উভয়ের উদ্দেশ্য দেশমঙ্গল সাধন। পুরুষ সঙ্কল্পের সহিত আত্মাশক্তির সহযোগেই প্রকৃতভাবে এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে।" (পৃ-৩)। মহারাষ্ট্রে যেমন শিবাজী ও গণপৎ উৎসব গড়ে উঠেছিল তেমনি বাঙলা দেশে আনন্দমঠের ভবানী বা কালীই প্রাধান্য পেয়েছে। অরবিন্দ ঘোষের 'ভবানীমন্দির' রচনা বঙ্কিম-প্রভাবিত। মিলনরাত্রিতে পরিকল্পিত 'মাতৃমন্দির' বিপ্লবীদের ডেরা। বাঙলাদেশে তন্ত্রসাধনাই বড় সাধনা—মাতৃমন্ত্রই তার জপমন্ত্র। "Here the worship of Kali made a stronger appeal to the new educated middle class of the 12th century, when Hindu revivalism centred round the devotee Ramkrishna"[৭৪]

কালীমূর্তিই দেশমাতৃকার প্রতীক হয়ে উঠেছিল। এ কালের জাতীয়তাবোধ গভীর-ভাবে ধর্মবোধের সাথে যুক্ত। একালের বিপ্লবীদের ধর্ম হল—'শরীর পতন কিংবা মন্ত্রের সাধন'। (পৃ-৩)। গুরু কর্তৃক শবসাধনার প্রস্তাব—সবই শাক্তদের কথা। শরৎকুমারের মুখে স্বর্ণকুমারীর রাজনৈতিক আদর্শ টিই ব্যক্ত হয়েছে—

"ভারত কখনই বিদেশী-বিবর্জিত হয়নি, হবে না—হতে পারে না। এ বাসনা উন্মাদের প্রলাপ। তবে নৈতিক একতার বলে, ধর্মবলে এমন একদিন আসতে পারে, যেদিন বিদেশীও স্বদেশী নামভুক্ত হতে বাধ্য হবে। এ দেশকে তারাও স্বদেশের মত ভালবাসবে।" (পৃ-২৩৯)।

শরৎকুমারের কথায় রাজকুমারী বিপ্লবের পথ থেকে ফিরে এসেছিল। অন্যত্র স্বর্ণকুমারী 'নব ডাকাতের ডায়েরীতে' বিপ্লবের ছিন্নমস্তারূপ তুলে ধরেছেন। কেমিক্যাল সাহেব সম্বন্ধে নবকুমারের দুটি মন্তব্য খুবই উল্লেখযোগ্য।

"যদি ভারতে এইরূপ দশ বিশটা কেমিক্যাল সাহেব থাকিতেন, তাহা হইলে ইংরাজ রাজ্য আজ প্রেমরাজ্য হইয়া উঠিত।" (পৃ-২৩৯)।

"কে বলিতে পারে, কেমিক্যাল সাহেবের ন্যায় কোন বিদেশী মহাপুরুষই তাঁহার হস্তের বিশাল মশাল আলোকে অন্ধকার পথ আলোকিত করিয়া তুলিবেন না? হিউম সাহেবও ত ছিলেন বিদেশী।" (পৃঃ-২৩৯)।

হিউম সাহেবের সঙ্গে জানকীনাথ ঘোষাল ও স্বর্ণকুমারীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। হিউম স্বর্ণকুমারীর উপন্যাস ও গল্পে নানা রূপে ও নামে উপস্থিত হয়েছেন। কখন ক্লডেন, কখন অ্যাঞ্জেলো বা কখন কেমিক্যাল সাহেব রূপে। নব ডাকাতের ডায়েরীর নবকুমারের স্থির বিশ্বাস ভারতের মুক্তি ইংরাজদের সহৃদয়তার পথেই আসবে। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় রাজনৈতিক নেতা রূপে স্বর্ণকুমারীর নানা রচনায়

অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লিখিত হয়েছেন। তাঁর মতামত দ্বারা লেখিকা বিশেষভাবে প্রভাবিত।[৭৫]

স্বর্ণকুমারী তাঁর রাজনৈতিক ভাবনার প্রতিচ্ছবি রূপে জ্যোতির্ময়ীকে সৃষ্টি করেছেন। মিলনরাত্রি উপন্যাসে তাঁব মানস কন্যা জ্যোতির্ময়ী তাঁর নিজ কন্যা সরলাদেবীর দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত। ডঃ পশুপতি শাসমল বলেছেন, "জ্যোতির্ময়ী চরিত্রটি সরলাদেবীর ছায়াশ্রিত, তাঁহার দেশানুরাগ, ব্যায়াম শিক্ষা, ব্যায়াম সমিতি স্থাপন প্রভৃতি কার্যাবলী জ্যোতির্ময়ীর কর্মপন্থা নির্ধারণ করে দিয়েছিল। কালে তেজস্বিতা ও মাধুর্য সরলাদেবীকে মহিমাময়ী লোকমাতায় পরিণত করে, জ্যোতির্ময়ীর মধ্যেও তার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।"[৭৬] সরলাদেবী বঙ্কিম-রবীন্দ্র আশীর্বাদ ধন্যা। মাতা ও কন্যা রাজনৈতিক দিক থেকে একই পথের পথিক। সরলাদেবী ভবানীপুর, কালীঘাট, বালিগঞ্জ এবং বাগবাজারে ব্যায়াম, কুস্তি, লাঠি খেলার আয়োজন করেন। শিবাজী উৎসবের অনুকরণে প্রতাপাদিত্য, বীরাষ্টমী ও উদয়াদিত্য প্রভৃতি উৎসবের আয়োজন করেন। বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর 'নিউ ইণ্ডিয়া' গ্রন্থে লিখলেন—"As necessity is the mother of invention, Sarala Devi is the mother of Pratapaditya to meet the necessity of a Hero for Bengal".

সন্ত্রাসবাদ সম্বন্ধে জ্যোতির্ময়ীর মতামত সরলার রাজনৈতিক বক্তব্যের প্রতিধ্বনি মাত্র। "অ্যানার্কিষ্টদের দেশদ্রোহীর হত্যা অঘোরপন্থী নরবলিদানের সমান গর্হিত ও জঘন্য। তাহাতে দেশের দেবতা তুষ্ট হইতে পারেন না।"[৭৭] বিজনকুমারের গুলিব আঘাতে আহত হলে জ্যোতির্ময়ী বিজনকুমারকে বলেছে—"তোমরা যে পথে চলেছ সে পথ যে মুক্তির পথ নয়।" (পৃ-৯৮)। শেষে বিদ্রোহীদলের সবাই জ্যোতির্ময়ীর প্রাণহীন দেহটাকে ঘিরে বসল। ঔপন্যাসিক মহাত্মাজীর মুখ দিয়ে জ্যোতির্ময়ী সম্বন্ধে বললেন, "ইনি ত মানবী নন—ইনি একটি মঙ্গলভাব, একটি idea, ইঁহার মৃত্যু নাই।' (পৃ-১০৩)। বিপ্লবীরা জ্যোতির্ময়ীর অহিংসা ব্রত গ্রহণ করলেন। ভারতের রাজনীতিতে মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাব ইতিপূর্বেই ঘটেছে। উপন্যাসের মহাত্মাজীর কণ্ঠে মহাত্মা গান্ধীর অহিংসার বাণীই উচ্চারিত হয়েছে। মহাত্মা গান্ধীর জয় হলেও এটি উপন্যাস হিসাবে ব্যর্থ হয়েছে।

শরৎ-জ্যোতির্ময়ীর প্রেমে উত্থান-পতন নেই। প্রেম নায়িকার অন্তরে স্থির জ্যোতির মত জ্বলছে। দেশকে সব সঁপে দিতে গিয়ে, রাজনৈতিক জীবনকে নারী-ধর্মের উপরে স্থান দেওয়ায় শরৎকে হৃদয় দেবার অবকাশ পায়নি। মৃত্যু শয্যায় যখন সে ধরা দিল তখন সে অধরার যাত্রী।

রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' (১৯১০) উপন্যাসের প্রভাব স্বর্ণকুমারী দেবীর ত্রয়ী উপন্যাসে পড়েছিল। প্রতিভার তারতম্যের জন্য উপন্যাসের গঠনরীতিতে গুণগত পার্থক্য ঘটে গেছে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন বাঙালী মনে অভাবনীয় উত্তেজনা ও উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিল। ইংরাজের দম্ভ ও হটকারিতা বাঙালীর ইংরাজের প্রতি মোহকে চূর্ণ করেছে। রবীন্দ্রনাথের 'বঙ্গ বিভাগ' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩১১), সফলতার সদুপায় (চৈত্র, ১৩১১), যজ্ঞ ভঙ্গ (মাঘ. ১৩১৪), সভাপতির ভাষণ—'পাবনা প্রাদেশিক সম্মেলনী' (১৩১৪) প্রভৃতি নিবন্ধে আলোচিত সমস্যা ও সমাধানের উপায়গুলি স্বর্ণকুমারীর ত্রয়ী উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে। "গোরা'র সমাজ পটভূমিকাটি উহার প্রকাশের প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্বেকার সমষ্টিগত বঙ্গ জীবন পরিচয়টি উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে।"[৭৮] বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ ও স্বর্ণকুমারী তাঁদের কাহিনী স্থাপন করেছেন। স্থান সহর, পাত্রপাত্রীরাও বিশিষ্ট ব্যক্তি। শীল ও শালিনতায় তারা তদানীন্তন সমাজের উচ্চপ্রকোষ্ঠের অধিবাসী। গোরা গৃহকেন্দ্রিক নয়, সে বিশাল সমাজমুখী। তাই গার্হস্থ্য-জীবনের দৈনন্দিন তুচ্ছতা তার মধ্যে প্রবেশের সুযোগ নেই। স্বর্ণকুমারী নারী, গৃহাঙ্গনে আসন পেতে না বসলে তাঁর তৃপ্তি নেই। তাই তাঁর উপন্যাসে মহৎ ভাব, আত্মত্যাগ, চরম-নরম পন্থীর বিরোধ সবই আছে। তবে সবচেয়ে বেশি করে আছে ঘর, গৃহস্থালীর কথা।

ডকটর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্যে নারীর বৈশিষ্ট্যের প্রসঙ্গে বলেছেন, "নারীর যে বিশেষত্ব তাহার কণ্ঠস্বর, তাহার বলার ভঙ্গীতে, তাহার আবেগকম্পিত ভাবপ্রকাশে, তাহার স্নেহব্যাকুল, অশ্রুসজল আশীর্বাদ ধারায় ফুটিয়া উঠে, তাহার রচিত সাহিত্যে তাহাই লালিত্য ও কমনীয়তা সঞ্চার করিতে পারে।"[৭৯] স্বর্ণকুমারীর উপন্যাসে নারী মানসিকতার বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। মিলনরাত্রি, বিচিত্রা ও স্বপ্নবাণী—ত্রয়ী উপন্যাসে অতুলেশ্বর ও হাসি এবং হাসি ও জ্যোতির্ময়ীর নৌকা বিহার, নৌকায় রাজার মনের প্রতিক্রিয়া, হাসি ও জ্যোতির্ময়ীর রসিকতা, হাসি ও শরতের সম্পর্ক, শরৎ ও রাজকুমারীর প্রণয়প্রসঙ্গ প্রভৃতি ঘটনা নির্বাচনে লেখিকা যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। নারীদের বাচনভঙ্গীর একটা বিশিষ্টতা আছে। নারী রচিত সাহিত্যে মেয়েলি ছড়া, প্রবচন, বচন প্রভৃতির বহুল ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। সব মিলিয়ে নারীদের নিজস্ব একটি শব্দভাণ্ডার গড়ে তোলা যায়। স্বর্ণকুমারীর উপন্যাসগুলো থেকে শব্দ, বচন ও প্রবচনের কিছু উদ্ধৃতি দিলাম—পোড়ামুখি, লক্ষ্মীছাড়ি, স্বর্গের বিদ্যেধরী, পোড়াকপাল, মা খেকো মেয়ে, আয়ি ঠাকরুণ, গজগিরি, দিব্যি মেয়ে, মাথা পোরা সিন্দুর, তোরা যে নিজের গরবেই মলি, মুখ ভরা নথ, মেয়ের নাকমুখ যেন ঠিক

পটের ঠাকরুণ, কচি মুখ আঁটির মত পাকা, মাটি মাথা যুঁই ফুল, অত পড়ে কি হবে চাকরী তো করবিনে, ঠোঁটদুটি টুকটুক্ করছে, ভোঁতা ভাব, গড়ন পিটন, পিত্তিজ্বলা, দিন দিন তালগাছ হচ্ছে, পাগড়ি বেঁধে অফিস যাবে, নেকাপড়া নিয়ে কি ধুয়ে খাবে, যতো রাখো যতো ফেলো কিছুর আর দরদাম নেই, ভাঁড়ার দিবিনে, যেন সব ধুলো ধুলো, ঘর করতে হলে তুমিও বুঝতে, কোন সাধই মিটলো না, কর্মিষ্ঠ সুবোদ মেয়ে, ফুলের ঘায়ে মুচ্ছা, মেয়ের গায়ে বাজে, মাথা খাও, হাতের নোয়া ক্ষয়ে যাক্, মেয়েটা অপয়া, শাশুড়ি মাগি, বৌ নয় এ যে রাক্ষসী তোকে শুদ্ধ যে যাদু করেছে, স্ত্রীর ভেড়ো হয়েছো, যত নষ্টের গোড়া, ঐ জঞ্জাল (বৌ) ঘরে এনেই তো ঘরে আগুন লাগলো। সুখে স্বামীর ঘর কর, কলকেমুখী বেটী, ছাইপাঁশ মাথা মুখ, দেমাকী, ক্ষান্ত দে, কোলের ধন, বুকটা ঠাণ্ডা হয়ে গেল, বেয়ান, এস বাছা, মরে যাই আর কি (?), পোড়া কপাল অমন প্রশংসা, কথার ছিরি, হ্যাকা ধরনের লোক, সই পাতান, আদুরে, রাঙ্গামুখ, চাপা মেয়ে, প্রেমের আঁচড়, গুমট মুখ, হেসে ঢলে পড়া, তা বাছা শুনবে না, বুঝি লীলাবতী হবেন, সংসারের জন্য শরীর পাত করলাম, ক্ষেপেছ বৌ ওর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে, স্বভাব চরিত্রের ছিরি, মাথায় কাপড় ওঠে না।

স্বর্ণকুমারীর দুটি প্রহসন ঃ
কনে বদল (১৯০৬) এবং পাকচক্র (১৯১১)

স্বর্ণকুমারী সমাজ সচেতন শিল্পী। সামাজিক অনাচার, শাস্ত্রাচার এবং ভণ্ডামীর বিরুদ্ধে তিনি সব সময় ক্রিটিক্যাল। তাঁর ব্যঙ্গকৌতুকের মধ্যে কক্ষচ্যুত লক্ষ্যভ্রষ্ট জীবনের নির্মম অপচয়ের দিকটি বড় হয়ে উঠেছে। ব্যঙ্গকৌতুকের দর্পণে যে জীবনকে তিনি প্রতিফলিত করতে চাইলেন তা যতখানি সমাজ সচেতন ততখানি আত্মসচেতন নয়। শ্রীধর গড়গড়ি, শশিনাথ পাকড়াশি, চন্দ্রকান্ত, শশিমুখীদের ব্যক্তিগত ভ্রান্ত ধারণা, যা বাস্তবের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে পারেনি তার থেকে উদ্ভূত সমস্যা এবং অসঙ্গতি প্রহসনের মধ্যে হাস্যরসের সৃষ্টি করেছে। প্রহসন দুটিতে সামাজিক সমস্যা হিসাবে স্থান পেয়েছে মনোনয়ন এবং পণপ্রথা। কনেবদলে শ্রীধর বয়স্কা, শিক্ষিতা এবং আধুনিকা পাত্রী চায়। "আমি চাই কোর্টশিপ প্রেমালাপ, কবিতায় কবিতায় ভাবপ্রকাশ · । আমি চাই, গানে গানে প্রাণে প্রাণে মদির মিলন। ১৪।১৫ বছরের মেয়েতে এ প্রেম হতেই পারে না।" (১ম অঃ, ১ম দৃঃ, পৃ-১৩)।

বিলাত ফেরৎ শশিনাথ বিলেতে বয়স্কা নারীদের ভাবসাব দেখেশুনে বীতশ্রদ্ধ, সে অল্পবয়স্কা সংসার নিপুনা স্ত্রী চায়।

বিলেত যাবার আগে আমি তাকে like করতুম।···ফিরতে না ফিরতে আমাকে পাকড়াও করেছে। (১ম অঃ ১ম দৃঃ, পৃ-৯৪)।

নায়িকাদের মধ্যে মালতীর বয়স ১৫ এবং চন্দ্রবতীর বয়স ২০ বৎসর। শ্রীধব এবং শশিনাথ নিজেদের মধ্যে কনে বদল করতে চাইলো। এদের মাঝে এসে পড়লো রসমঞ্জরী বা ক্ষেপি, ললিতা, প্রভাবতি ও ক্ষেপির মা। এদের আবির্ভাবে সমস্যা জটিল হল। ভোলানাথের চেষ্টায় হাসির ফোয়ারা সমে ফিরে এল। হাবীদাসীর সংলাপ এবং গ্রাম্য আচরণ প্রহসনে বিশেষ আকর্ষণ সৃষ্টি করেছে। ভোলানাথ নামে ও কাজে ভোলা। শ্রীধর ও শশির বিয়ের আসরে আয়না হাতে ভোলার নৃত্য এবং বাঙালী ঘরের বিলেতি সাজের বিবিদের খোঁচা দেওয়া গানটি অনবদ্য।

আহা মরি কি কারখানা,
চতুরঙ্গ বিবিয়ানা, বাজা বে গাঁ!
শিরেতে সিন্দুর ছি ছি—কেবা পরে মিছি মিছি,
ছাঁটা কেশে আঁটা থর সা সা নি নি সা!
নাকে নাই নথ মুক্তা,
মুখে নাই পান দোক্তা,
বাঁকা হাসি ফাঁকা ঠোঁটে বাহা কি রে বা!
ঢাকা শান্তিপুরে ফেল,
দিলমাৎ গসলেনে, তেরে কেটে তা।
পায়ের আলতা গালে ঠোঁটে,
মল নীরব জুতার চোটে। (পৃ-১০৮)

বাঙলাদেশে পাশ্চাত্য অনুকরণের মোহে নারীদের দেশীয় পোশাক পরিচ্ছদেরও রূপান্তর ঘটছিল। ইংল্যাণ্ডে উনিশ শতকের মধ্যভাগে মহিলাদের পোশাক পরিচ্ছদের রূপান্তর দেখা দিয়েছিল। "The design of a woman's costume became progressively more sex-conscious".[৮০]

ভোলানাথের সরস বিদ্রূপটুকুর সমর্থন মিলবে প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের নিম্নে উদ্ধৃত বক্তব্যটির মধ্যে

"But undeniably the metamorphosis shows a rapid sliding down in the direction of the low neck and bare elbow about which there is

presumably some difference of opinion even in English society. The old orthodox array of a single piece of Sari is primitive and scarcely proper. But a long and stride towards the extravagance and frivolity of it, however dignified among Europeans, will not carry much dignity or propriety in Indian eyes……But the object of women's improvement in Bengal is not to turn out the fashionable woman, but the refined woman".[৮১]

'কৌতুক নাট্য'-এর 'লজ্জাশীলা' নকসাটিতে কামিনীব বিবিয়ানা সাজ নিয়ে লেখিকা বিদ্রূপ করেছেন। রুজ, পাউডার মাখা, গাউন পরার বিরুদ্ধে লেখিকার ব্যঙ্গের শলাকা বড়ই নির্মম। স্বর্ণকুমারী নারী মুক্তি বলতে বিলেতী পরগাছা চাননি। দেশীয় ঐতিহ্যের উপর গড়ে তুলতে চেয়েছেন সময়োচিত সংস্কৃত জীবন ও পরিবেশ।

'পাকচক্র' একাঙ্ক প্রহসন। প্রথম দৃশ্যেই ঘটকীর গান। ঘটকীব চরিত্র 'স্নেহলতা' এবং 'কনে বদল' হয়ে 'পাকচক্রে, পূর্ণতা লাভ করেছে। পাকচক্রের ঘটকীর মিল পাওয়া যাবে শেরিডনের 'রাইভেলস্' নাটকের মিসেস্ ম্যালাপ্রপের সঙ্গে। অন্দরের অল্প শিক্ষিতা নিরীহ সরলা মহিলাদের উপর তার বিশ্বের জেহাদ বড়ই ভয়ঙ্কর। গিন্নী যখন বলেন—'এখানে কিন্তু কর্তার ইচ্ছা কর্ম হতে দিচ্ছি না, দশটি হাজারের একটি পয়সা কম নেব না।' (পৃ-৫)। ঘটকী অত্যন্ত সপ্রতিভ। তার চঞ্চু মুখেই সব উত্তর অপেক্ষা করে। "জানেন মেয়ে আছে চার রকম—বিদুষী, রূপসী, ধনাবতী ও গুণাবতী। সচরাচর সকলে বলে থাকে বটে ধনবতী, গুণবতী এর মধ্যে কোন রকম মেয়ে আপনি চান বলুন।" (পৃ-৬)। কনে বদলের মত পাকচক্রে নাটকীয় গতি দুর্বার হয়নি। কর্তা-গিন্নীর মান-অভিমান, শশিমুখী ও চন্দ্রকান্তের মান ভঞ্জনের চেষ্টা এবং বিনোদের বিবাহ প্রভৃতি নাটকীয় জটিলতার সৃষ্টি করেছে।

প্রহসনটির মূল বিরোধ পণপ্রথা নিয়ে। গিন্নী পুত্রের বিবাহে দশ হাজার টাকা পণ চান। কর্তা উন্নতি বিধায়িনী সভাব সভাপতি। কাগজে কলমে লিখে দিয়েছেন পণ নেবেন না, দেবেনেও না।

'বৈজ্ঞানিক বর' নকসাটিতে বিজ্ঞানকে জীবনের সর্বস্তরে ব্যবহার করা যে কত হাস্যকর এবং শিক্ষার বদহজম তা তুলে ধরেছেন। বৈজ্ঞানিক বর বিয়ের রাতে সব কিছুকে ফলিত বিজ্ঞানের মাপ কাঠিতে বিচার করতে চায়। সেটা যে কতবড় উন্নত ধরনের পরিহাস, এই নকসাটি না পড়লে বোঝা যায় না। 'সৌন্দর্যজ্ঞান' ও 'তত্ত্বজ্ঞান' নকসা দুটিও ভাল।

স্বর্ণকুমারীর মধ্যে একটি পরিহাস রসিক মন ছিল। তাঁর ব্যঙ্গ কোথাও জ্বালা ও তিক্ততার সৃষ্টি করেনি বরং স্নিগ্ধ ও ক্ষমাসুন্দর। তার কৌতুক নাট্য ও প্রহসনের বিষয়বস্তু নারীশিক্ষা, বিবাহের বয়স, মনোয়ন, পণপ্রথা, নারীদের পোশাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতি। তরল পরিহাসের উপলখণ্ডের উপর দিয়ে সমকালের নানা সমস্যার তরণীকে চালিত করেছেন। বৈপরীত্য, বৈসাদৃশ্য, ভ্রান্তি অসামঞ্জস্য তার প্রহসনে বিবিক্ত হয়েছে। হাস্যরস কোথাও চরিত্রগত, কোথায় ঘটনাবিন্যাসের চাতুর্যের উপর নির্ভর করেছে। পূর্বেই বলেছি স্বর্ণকুমারীর ব্যক্তিত্বের মধ্যে একটি অনড় আভিজাত্য ছিল। স্বর্ণকুমারীর পূর্বে মহিলা লেখিকাদের মধ্যে মননের এমন শিল্পসম্মত প্রকাশ, শিল্প স্বভাবে এমন আভিজাত্য দুর্লক্ষ্য। ঠাকুর পরিবারের লেখক-লেখিকাদের রচনায় শীল ও শালীনতা অবশ্যই বর্তমান। মহর্ষির কাছ থেকেই এই বিষয়ে পাঠ নিয়েছিলেন তাঁরা। মহর্ষির আত্মজীবনীতে ১৮৫৮ সালের পর ঘটনা স্থান পেল না। শিবনাথ শাস্ত্রীকে কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন এর পরের ঘটনা লিখিতে হলে কেশবের বিরুদ্ধে লিখতে হয়।[৮২] তা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ দ্বিজেন্দ্রনাথ ও কেশব সেন মহর্ষির সমান স্নেহ ও দাক্ষিণ্যের পাত্র। স্বর্ণকুমারীও যোগেন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন—"নিজের ঘটনাবলী লেখা এখন আমার পক্ষে সম্ভব বা শোভন হইবে না, তবে, যদি আপনারা কেহ সাক্ষাৎ করিয়া কোন কোন বিষয় জানিতে চাহেন তাহা বলিতে পারি।"[৮৩] পিতা ও কন্যার মধ্যে সমজাতীয় বিনয় ও মহানুভবতা লক্ষ্য করা যাবে।

স্বর্ণকুমারী গীতিনাট্য ও নাটকও রচনা করেছিলেন। তিনি বসন্ত উৎসব (১৮৭৯), বিবাহ উৎসব (১৮৯২) এবং দেবকৌতুক (১৯০৬) প্রভৃতি গীতিনাট্য রচনা করেন। 'বসন্ত উৎসব' গীতিনাট্যক দিয়ে ঠাকুর পরিবারে গীতিনাটক রচনার সূত্রপাত। 'রাজকন্যা' (১৯১৩) কাব্য নাটকে রবীন্দ্রনাথের রাজারানী ও বিসর্জন নাটকের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তিনি আরও তিনখানি নাটক রচনা করেছিলেন—নিবেদিতা (১৯১৭), যুগান্ত কাব্য নাট্য (১৯১৮) ও দিব্যকমল (১৯৩০)।

স্বর্ণকুমারীর কবিতা ঃ

স্বর্ণকুমারী দেবী 'ভারত ও বালক' পত্রিকায় 'কবিতা ও কবি' নিবন্ধে লিখেছেন—"যে ভাব মধুর, সুন্দর আদর্শস্বরূপ, যে ভাব দ্বারা প্রকৃতির প্রাণের সহিত আমাদের প্রাণের, সসীমের সহিত অসীমের মিলন লাভ ঘটে, অন্ততঃ সেই মিলন পথে আমাদের লইয়া যাইতে যে ভাবের চেষ্টা—তাহাই কবিতার ভাব। যে কবিতায় এইরূপ ভাবের

যত অধিক্য সেই কবিতাই তত শ্রেষ্ঠ।"[৮৪] জার্মান দার্শনিক Schelling রোমান্টিক কবি চেতনার স্বরূপ ব্যাখ্যায় বলেছেন "Interpenetrative affinity between man and nature". মানব ও প্রকৃতির গূঢ় আত্মীয়তাই রোমান্টিক গীতি কবিদের সবচেয়ে বড় মূলধন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী পাঠ করলে লক্ষ্য করা যায় বহিঃপ্রকৃতি ও তাঁর অন্তঃ-প্রকৃতি দুয়ের মধ্যে একটা গভীর অদ্বয় সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছে। বিশ্বপ্রকৃতি মহর্ষির জীবনসত্য ও ব্রহ্মসত্য উপলব্ধির সহায়ক হয়েছে। বারবার তিনি প্রকৃতির কোলে শান্তির জন্য, সান্ত্বনার জন্য ছুটে গেছেন। উপনিষদের বাণী প্রকৃতির অসীম রহস্য ভেদে সহায়ক হয়েছে। কনিষ্ঠ পুত্র রবীন্দ্রনাথ এবং চতুর্থ কন্যা স্বর্ণকুমারী পিতৃদেবের এই ধ্যানের ধনখানির সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। স্বর্ণকুমারীর প্রকৃতি বর্ণনায় মহর্ষির মত রহস্য সন্ধানী দৃষ্টি দেখা যাবে। কি উপন্যাস, কি নাটক, কি কবিতা সবত্রই প্রকৃতির অতল রহস্যের গভীরে ডুব দেবার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। স্বর্ণকুমারী মনে করতেন শব্দ ও অলঙ্কার কাব্যদেহের অন্যতম সম্পদ হলেও একান্ত সম্পদ নয়। একান্ত সম্পদ হল—"কবির হৃদয় নিহিত ভাব এই যে ইহা আলোকের ন্যায় নিজেও উজ্জ্বল রূপে বিরাজ করে। এবং নিজের সংসর্গে যাহাদের পায় তাহাদেরও উজ্জ্বল করিয়া তোলে। আলোক যেমন ইথরের আন্দোলন, জগতের সহিত অন্তরের মিলন জনিত কবি হৃদয়ের যে আন্দোলন, তাহাই তাঁহার কবিতার ভাব। · সুতরাং ছন্দে বন্ধে কথা সাজাইতে পারিলেই কবি হওয়া যায় না, কবিত্ব একটী অতীন্দ্রিয় শক্তি,—যাহার এই শক্তি যত অধিক তিনিই তত উচ্চকবি, তিনিই তত অধিক পরিমাণে জগতের অন্তর্নিহিত ভাব চয়ন করিয়া—জগতের স্থায়ী উপকার করিতে সক্ষম।"[৮৫] কবি অতীন্দ্রিয় শক্তি বলতে ইঙ্গিতময়তা বুঝিয়েছেন। আধুনিক কালের গীতি কবিতার স্বভাব সম্বন্ধে স্বর্ণকুমারী যথেষ্ট সচেতন ছিলেন।

স্বর্ণকুমারী ও গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী বাংলা কাব্যে নারী জীবনের বিষাদময়তার মধ্যে রোমান্টিক আর্তি সঞ্চারিত করেছেন। প্রকৃতির রূপ ও মাধুর্য পান করার আগ্রহ ও যোগ্যতা তাঁদের উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট ছিল।

শব্দ, অলঙ্কার ও ভাষারীতি ব্যবহারে পশ্চাদমুখীনতা থাকায় গীতিকবিতার ক্ষেত্রে বিহারীলাল ও অক্ষয় চৌধুরীর থেকে স্বর্ণকুমারী বেশি দূর এগোতে পারেননি। ১৮৯৫-তে তাঁর কবিতা ও গান প্রকাশিত হয়। তার আগেই রবীন্দ্রনাথ চৈতালী পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছেন। তিনটি প্রধান ছন্দোরীতি রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে ব্যবহার করে বৈচিত্র্য সাধন করেছেন। অথচ স্বর্ণকুমারী বা গিরীন্দ্রমোহিনীর উপর তার কোন প্রভাব পড়েনি। "বিশ্লিষ্ট উচ্চারণের ছন্দে রুদ্ধদল ব্যবহারে সেই পূর্বযুগের দ্বিধা তাঁর

কবিতাতেও রয়ে গেছে।"[৮৬] শব্দ সংক্ষেপ কবিতাকে দুর্বোধ্য না করে যথার্থ করে তোলে। সর্বকালের মহৎ কবিরা স্বতন্ত্র কাব্য ভাষার সৃষ্টি করেন। স্বর্ণকুমারী প্রচলিত কাব্য ভাষাকেই আশ্রয় করেছেন।

স্বর্ণকুমারীর বহুল ব্যবহৃত শব্দ—ইথে, হেদে, হ্যাঁলো, সজনি, উথলে, বিয়াকুলামণা, উথলিত, নয়ান, বয়ান, নারিস, নেহারি, আতুর, রাজে, ভাতে, টুটে, নিরখিয়া, উদিবেক, তরাসে, রে, ছুটিয়ে, টুটিয়ে, কাঁদিনু, উজলিয়া, বরণ, ভালো যতন প্রভৃতি। শব্দ ব্যবহারে স্বর্ণকুমারী বহুল পরিমাণে, মেয়েলিপনার প্রশ্রয় দিয়েছেন। তিনি এক্ষেত্রে আবার রক্ষণশীল। শব্দ ব্যবহারে তাঁর বিশেষ একটি ঝোঁক দেখা যায়। যেমন প্রেম, প্রণয় ও ভালবাসার মধ্যে ভালবাসা শব্দটিই পছন্দ করেন। অন্তর, হৃদয়, হিয়া প্রভৃতির মধ্যে হৃদয়, আঁখি, চোখ, অক্ষি, নয়ান প্রভৃতির মধ্যে নয়ান ব্যবহারে আগ্রহ বেশি। তাই বলে অন্যগুলি যে একেবারে ব্যবহার করেননি, তা নয়।

সব মাটিতে সব ফসল হয় না। বিশেষ ফসলের জন্য মাটির বিশেষ ধরনের গুণাগুণ প্রয়োজন। কাব্যের বিশেষ ভাব প্রকাশের জন্য শব্দের সৃজন বা প্রচলিত শব্দের আভিধানিক অর্থের উর্ধ্বে স্বতন্ত্র অর্থ সন্ধান করতে হয়। স্বর্ণকুমারী ভাবের অনুরূপ ভাষার সন্ধানী হলেন না। অথচ তিনি জানতেন কাব্য কেবল প্রচলিত ভাষাশ্রয়ী নয়। কাব্যের ভাষা রূপকাশ্রয়ী।

কি গভীর বেদনা হৃদয় জ্বলিয়া যায়
কথায় প্রকাশ তাহা করিব কেমনে।
বিষাদ যন্ত্রণা ব্যথা যতই গভীর হেথা
কথাও তেমনি ক্ষুদ্র তার পরিমাণ। (সঙ্গীত শতক, পৃ-২০০)

এই ক্ষুদ্রতার পরিমাণ পূর্ণ হয় অর্থালঙ্কারের সাহায্যে। কবির কাব্যে তার বহুল ব্যবহার নেই। গীতিকবিতার জটিল মানস প্রক্রিয়ার যোগ্য ভাষার সন্ধান করেননি। উদ্ধৃতিটি তাই গদ্যময় হয়ে রইলো।" The greater the poet the more value he will wring from his medium : music, meaning, memory. simplicity and ornament, image and idea ; dramatic force and lyrical intensity, direct statement and oblique suggestion ; colour, light, power—all are distilled from his word."[৮৭]

কাব্যের এ জাতীয় তাৎপর্য, এমন শব্দশক্তি স্বর্ণকুমারীর কাব্যে লক্ষ্য করা যায় না।

নিভৃত নিকুঞ্জবাটি, বসে আছি একলাটি,
নয়নে আঁধার জাগে স্নিগ্ধ অভিরাম,

নভপটে ছায়া ছায়া স্পন্দহীন তরুকায়া
ধ্যেয়ায় একাগ্র চিত্তে কি রহস্য নাম।

নিঃসঙ্গ 'স্নিগ্ধ অভিরাম' 'ছায়া ছায়া স্পন্দহীন তরুকায়া' রহস্যময় হয়ে উঠতে পারলো না। না পারার কারণ শব্দের অঙ্গে রহস্যময়তা বা ইঙ্গিতময়তার প্রলেপ পড়েনি বলে। তেমনি আবার—

কে তারে পায়ে ঝাপে কে মরে উপেক্ষায়,
জানিতে পাবে সে কি, শুধু ভাসিয়ে নিয়ে যায়,
পাষাণ উপকূলে আছাড়ি ফেলে শেষে,
যে যায় সে যায় শুধু, স্রোতে সে বহে হেসে। (স্রোত, পৃ-১৭১)

শব্দ কবির ভাবের গভীরতাকে উপেক্ষা করে গেছে। লেখিকা যে ইঙ্গিতময়তার কথা বলেছেন তা এখানে ব্যঞ্জিত হল না। 'থাক ভোর' কবিতায় ভ্রমর নারীত্বের অবমাননা সহ্য করতে পারেনি। ভারতীয় নারীর বিবাহিত জীবনে স্বামীই একমাত্র মূলধন। স্বামী দৃষ্টির আড়াল হলে বা স্বামী অন্য নারীর প্রতি আকৃষ্ট হলে, স্ত্রী তা সহ্য করতে পারে না। প্রেম নারীর অস্তিত্বের দ্যোতক। 'যে নারী সে প্রেম ধর্ম না জানে, সে অতি দীনা।' (বলি শোন খুলে—পৃ-১৭৪)। ভালবেসে কে কবে তৃপ্ত হয়েছে, কে কবে মনের সাধ পুরে বাসনা চরিতার্থ করেছে।

সখা গো এ নহে, এ নহে অবিশ্বাস।
অপূর্ণ মনের ইচ্ছা অতৃপ্ত উচ্ছ্বাস,
তাই অশ্রু অভিমান,
তাই এ বেদনা গান,
তাই এ বুকফাটা দুরন্ত নিশ্বাস।
সখা গো এ নহে অবিশ্বাস।
তব পুণ্য প্রেমে যদি করিব সংশয়
কোথায় নির্ভর কোথা এ নিখিল ময় ?

মানব প্রকৃতি যেহেতু অপূর্ণ তার প্রেমও তাই অপূর্ণ।

মনে রেখো অসম্পূর্ণ মানব প্রকৃতি,
অপূর্ণ প্রেমেতে তার এইরূপ রীতি।
তাই সাধ দেখিবার
অভাবের অশ্রুধার,
একই কথা শুধাইতে তাই চায় নিতি।

*　　*　　*　　*

ফুটো ফুটো দলগুলি
বিষাদের তান তুলি,
একে একে পড়ে নুয়ে সরমে মরম ঢাকি,
সারাদিন পথ চেয়ে থাকি। (নহে অবিশ্বাস, পৃ-১৭৬)

'মাঘ মেলা' 'নহে অবিশ্বাস' 'আমার ঘুম ভেঙ্গেছে' 'থাক ভোর' প্রভৃতি কবিতায় কবির নারীমনের সহজ আকুতিটি ধরা পড়েছে। এ সব কবিতায় প্রাণের সুরটি ঘনীভূত হয়েছে। এ সব কবিতায় কবির শব্দ প্রয়োগের যোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। কবি আধুনিক শব্দভাণ্ডারের শরণাপন্ন হয়েছেন। কবিতাগুলিতে শিল্পীর আকুলতা ধরা দিয়েছে। শরতের হিম জ্যোৎস্নায় হারাণ স্মৃতির ছায়া কবির চারিদিকে ভিড় করে আসে।

ও ছায়া কাহার ছায়া ? ও মূরতি কার মায়া ?
চিনিতে পারিনে যেন চিনি চিনি যত করি !
আকুল ব্যাকুল প্রাণ ধরিবারে আগুয়ান,
যতই ধরিতে যাই ধীরে ধীরে যায় সরি। (শারদ জ্যোৎস্না, পৃ-১১৮)

অথবা

তেমনি রয়েছে সব তবুও কি যেন নেই।
সেই স্নেহ, সেই প্রীতি,
সেই মধুমাখা স্মৃতি,
তেমনি ফুটিয়া ফুল প্রাণ ভরা হাসিতেই,
সকলি রয়েছে যেন কি জানি তবু কি নেই। (কি যেন নেই, পৃ-১৯০)

কবি কীটসের ভাষায় এই আকুলতা ব্যাকুলতাই হল,…'majestic pain', এই চোখের জলই তো '…idle tears'। কবির স্বামী, পুত্র, বিত্ত, খ্যাতি সবই আছে, তবু যেন কি নেই। খাঁটি লিরিক কবির বেদনা। নারী জীবনের পরম প্রাপ্তি ও তৃপ্তির কথাও আছে—

তুলিয়া কুসুম হার
সঁপিলাম করে তার,
অনন্ত খুলিল আঁখি পরে,
মুহূর্তে বন্ধন চূর্ণ
অপূর্ণ হইল পূর্ণ,
স্পর্শ হল অধরে অধরে।

স্বর্ণকুমারী নারী বিষয়ে কবিতা লিখেছেন, নারী প্রসঙ্গেও কবিতা লিখেছেন। কিন্তু তাঁর কবিতায় নিছক নারীসুলভ বিশিষ্টতার প্রকাশ হয়নি। তিনি প্রেম, বিরহ সর্ববিষয়ে লিখেছেন, কিন্তু কোন একটি বিশেষ বিষয়কে বেছে নেননি, যার মুকুরে তাঁর আত্মার প্রকৃত চেহারাটি ধরা পড়বে। সর্বজনীন হবার বিপত্তি হল এই, সর্বমুখীন হবার বিফলতা হোল এই যে, একটি খণ্ডে নিজের স্বরূপ যেমন স্পষ্ট হয়, অখণ্ড পটে তেমন নয়। কবিতায় তাই স্বর্ণকুমারী সাধারণ ধর্ম পালন করেছেন, একান্ত ধর্ম নয়। অবশ্য এই রকম অভিযোগ তখনকার অপরাপর বিশিষ্ট কবিদের সম্বন্ধেও আরোপ করা যায়। মানকুমারী বসু, কখনও কখনও গিরীন্দ্রমোহিনী এই অতি উদারতায় ভুগে তাঁদের কাব্য-সৃষ্টিকে বিশিষ্ট করতে পারেননি। আমাদের সৌভাগ্য যে উপন্যাসে স্বর্ণকুমারী এই ব্যর্থতার বলি হননি।

সামাজিক উপন্যাস: কুসুমকুমারী দেবী

স্বর্ণকুমারীর 'স্নেহলতা' ভারতীতে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশকালে কুসুমকুমারীর 'স্নেহলতা' সামাজিক উপন্যাস প্রকাশিত হয়। ভারতীতে একটি ঘোষণার মাধ্যমে স্বর্ণ-কুমারী 'স্নেহলতা' নাম পরিবর্তন করে 'পালিতা' রাখেন। স্বর্ণকুমারীর 'স্নেহলতা'-র প্রথম ভাগের শিরোনাম 'স্নেহলতা বা পালিতা', দ্বিতীয় ভাগের শিরোনাম 'স্নেহলতা'। কুসুমকুমারীর 'স্নেহলতা' সে যুগের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দ্বারা প্রশংসিত। বিদ্যাসাগর গ্রন্থ পাঠে মন্তব্য করেন—"সমাজচিত্র জানিবার পক্ষে ইহা একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ।" ভূদেব মুখোপাধ্যায়: "রুচি মার্জ্জিত, উদ্দেশ্য সাধু।" হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, "এই গ্রন্থ বঙ্গভাষার অক্ষয় অলঙ্কার বিশেষ।" শিবনাথ শাস্ত্রী—"স্থানে স্থানে অশ্রুপাত করিয়াছি।"[৮৮] কুসুমকুমারী সমকালের সামাজিক সমস্যাকে উপন্যাসে স্থান দিয়েছেন কিন্তু সব সমস্যার সমাধান হয়েছে প্রেমময় হরির চরণে আত্মনিবেদনের মধ্যে।

কুসুমকুমারী উপন্যাসের স্থান নির্বাচন করেছেন শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বরাহনগর, বেলঘরিয়া ও মৃজাপুরের বাসস্থান। পরিবারগুলি ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত পরিবার। উষাবতী, মোহিনী, স্নেহলতা প্রভৃতি নারীরা পরিবার জীবনের বাইরের জগতের খোঁজ খবর রাখে। উষাবতী রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ ও ব্যাখ্যা করে পাড়ার মহিলাদের বুঝিয়ে দেন। স্বামীর সঙ্গে, বিবেকানন্দের সনাতন হিন্দুধর্ম বিষয়ে মাতুলালয়ের মত বিনিময় করেন। উপন্যাসের নায়িকা স্নেহলতা জন্মবধি মাতুলালয়ে। পারিবারিক ধ্যানধারণার মধ্যে সে বর্ধিত হয়েছে। দাদা হীরালালের বন্ধু অমৃতকে

স্নেহ ভালবাসে। অমৃত পরোপকারী ডাক্তার। অমৃত-স্নেহলতার বিবাহ নিয়ে পিতা-মাতার বিরোধ। স্নেহের মাতা তাঁর একমাত্র কন্যাকে 'অপদার্থ কুলসর্বস্ব কুলীনের হাতে' দেবেন না। পিতার উক্তি—'হুঁ', তখনই বলিয়াছিলাম মেয়েকে লেখাপড়া শিখাইবার আবশ্যক নাই। কন্যা আমায় চাকুরী করিয়া খাওয়াইবে না। হিন্দুর মেয়ের আবার পড়ার প্রয়োজন কি? এখন দেখ, কি ভয়ানক কথা—হিন্দুর মেয়ে হইয়া কিনা ইচ্ছামত বিবাহ করিতে চাহে। দুর্গা। দুর্গা। আমার জাতি কুল মান সব গেল।' (পৃ-৪)। স্নেহের পিতা বিবাহের পর থেকেই ঘরজামাই।

"স্নেহলতা কুলীন কন্যা"। স্নেহ, উষাবতী, মোহিনীদের বয়স পনেরো। বিবাহযোগ্যা নারীদের স্বামী মনোয়নের অধিকার দেবার জন্য আন্দোলনও চলছিল। পিতা যদুনাথ স্নেহের প্রেম ও স্বামী মনোনয়নকে কেবল ধিক্কার দিয়েই থামেননি। অসুস্থতার ছল করে মাতা ও কন্যাকে বিক্রমপুরে নিয়ে গিয়ে বৃদ্ধকুলীনের সঙ্গে কন্যার বিবাহ স্থির করেন। মৃত্যু ও বিবাহ দুই স্নেহের কাছে সমান। স্নেহের মৃত্যুকালে অমৃত তার সামনে উপস্থিত হলেও স্নেহ স্বামী বলে তাকে গ্রহণ করার অধিকার পায়নি। "যদিও এই উনবিংশ শতাব্দীতে স্নেহলতার জন্ম, এই উনবিংশ শতাব্দীতে তিনি শিক্ষিতা, কিন্তু—দুর্ভাগ্যই বল আর সৌভাগ্যই বল—স্নেহলতা সেরূপ শিক্ষা পান নাই, যাহাতে পিতৃ-মাতৃভক্তি হইতে তাঁহাকে দূরে ফেলিবে। তিনি আপনাকে পিতামাতার অধিকারভুক্তা বলিয়া মনে করেন।" (পৃ-১১)। দেশাচারের যূপকাষ্ঠে জীবন দিতে হল।

স্নেহ-অমৃত প্রেমকাহিনীব পাশাপাশি সুশীলকুমার ও মোহিনীর প্রেম কাহিনীটি সমান্তরাল ভাবে উপন্যাসের শেষপর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। এই কাহিনীটির মধ্যে অ্যাডভেঞ্চার আছে। সুশীলকুমার মোহিনীকে দস্যুদের হাত থেকে মুক্ত করে বিবাহ করে। মোহিনী আবার অমৃতের ভগ্নী। আশেপাশের চিরপরিচিত মানুষেরা তাঁর উপন্যাসে ভিড় করেছে। কৌলীন্যপ্রথা, বহুবিবাহ, নারীশিক্ষা, সমকালের ধর্মীয় আন্দোলনের কথা থাকলেও কুসুমকুমারী রক্ষণশীল। হিন্দুধর্মের নব জাগরণের জোয়ারে তিনি নারীর কথা ও ব্যথাকে প্রাধান্য না দিয়ে সেকালের হিন্দু নেতাদের মতকে মেনে নিয়েছেন। সে যুগে ভক্তিরসের বন্যায় ব্রাহ্মর ব্রহ্মত্ব ভেসে যাচ্ছিল। চারিদিকে গজিয়ে উঠছিল হরিসভা, আর্যসভা, সুনীতিসঞ্চারিণী সভা। শ্রীকৃষ্ণ সেনের প্রচেষ্টায় হিন্দু ধর্মের উত্থান ও প্রচারের আয়োজন চলছে।[৮৯] শশধর তর্কচূড়ামণি, অক্ষয় সরকার, এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন। হরিসভাগুলো পথে ঘাটে, গ্রামে গঞ্জে খোল করতাল সহকারে গগন বিদীর্ণ করছিল। বিবেকানন্দের সনাতন হিন্দুধর্ম, রামকৃষ্ণের কেশব-সঙ্গে কীর্তনে যোগদান বাঙলা দেশে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। কুসুমকুমারী

স্নেহলতাকে নিষ্কাম ধর্মে দীক্ষিত করেছেন। "স্নেহ আজ নূতন রাজ্যে প্রবেশ করিয়া প্রাণে মধুর মূর্তি দেখিতেছেন। অনবরত সেই সমর বাণী শুনিতেছেন—নিষ্কাম হও।" এখানেই শেষ নয়—"হরি। হরি। হরি। মধু। মধু। মধু। ভুবন ডুবিল সুধা সিন্ধুনীরে। কি দিব তুলনা, জগতে মিলেনা (পৃ-৭৩)।" এই আত্যন্তিক হরিভক্তি দ্বারা লেখিকার 'প্রেমলতা' (১৮৯২) এবং 'শান্তিলতা' (১৯০২) উপন্যাস দুটির কাহিনীও নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। খোল ও খঞ্জনির কলরোলে নায়ক-নায়িকার অন্তরের নিভৃত কামনা-বাসনা বাস্তবসম্মত রূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারেনি। সেকালের রুচির কাছে আত্ম-সমর্পণ করেছেন। অথচ পনেরো বছরের স্নেহলতার মৃত্যু হল, ষোল বছরের প্রেমলতা 'খোকার মা হল'। বার বছরের বিধবা কনক সুরেন্দ্রকে ভালবেসে জীবনে দুর্বিষহ যন্ত্রণা ভোগ করে। প্রেমলতা দেহ ও মন দিয়ে স্বামীকে ঘরে আটকাতে পারে না। স্বামী মাতাল, বাইজীর সাথে বাগান বাড়ীতে রাত কাটায়। লেখিকা অকস্মাৎ এই প্রেমলতাকে স্বামী পুত্র হারা করে "হরির সর্বব্যাপী প্রণয় ও প্রেমে" মগ্ন করে দিলেন। অথচ সমাজ এই অপরিণত বুদ্ধির বালিকাদের কাছে পরিণত নারীর কর্তব্য ও ভালবাসা দাবী করছে। "Hence the strange anomalies of artificial society-girls of sixteen who are models of manner, miracles of prudence, marvels of learning, who sneer at sentiments, at laugh, at the Juliets and Imogens ; and matrons of forty, who, when the passions should be tame and wait upon the Judgment, amaze the world and put up to confusion with their doings".[৯০]

কেবল সেকস্‌পীয়ার কেন, কোন দেশই উনিশ শতকের পূর্বে নারীর দেহ ও মনের বিকাশের উপযুক্ত সময় দিতে প্রস্তুত ছিল না। যা ছিল না সমাজে তা সাহিত্যে কি করে আসবে।

কুসুমকুমারীর 'লুৎফউন্নিসা' (১৯০৫) ঐতিহাসিক উপন্যাস। অক্ষয়কুমার মৈত্রের 'সিরাজদৌল্লা' অবলম্বনে রচিত। ভূমিকায় লেখিকা এ কথা স্বীকার করেছেন। সিরাজদৌল্লা নিয়ে প্রথম ঐতিহাসিক নাটক লেখেন গিরীশচন্দ্র ঘোষ এবং প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখেন কুসুমকুমারী দেবী। অবশ্য উপন্যাসটি লেখিকার পরিণত বয়সের রচনা। কুসুম-কুমারীর পূর্বের উপন্যাসগুলিতে শৃঙ্খলার অভাব ছিল। গিরীশচন্দ্র সিরাজদৌল্লায় স্থানগত ঐক্য রক্ষা করতে পারেন নি। উপন্যাসে স্থানগত চাঞ্চল্য কোন ক্ষতি করেনি। উপন্যাসটি ত্রিশটি পরিচ্ছেদে বিস্তৃত। গিরীশচন্দ্রের মত এই উপন্যাসে করিমের চরিত্র আছে কিন্তু পার্শ্বচরের অধিক মর্যাদা পায়নি। জহরার ভূমিকা নিয়েছে বেগম সোফিয়া।

উপন্যাসের সূচনা নাটকীয়। সিরাজ হীরাঝিলে আলিবর্দিকে আটকে টাকা আদায়ের চেষ্টা করছে। স্নেহপ্রবণ আলিবর্দি এটা তামাশা মনে করে তা উপভোগ করছেন। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে সিরাজ নেশাগ্রস্ত, উন্মত্ত। 'খাও, ঢাল-ঢাল আর খাও। ব্যস্। দিল খোস্ রাখ্‌খো।" (পৃ-১৮)। আর সন্ধান চলে খুপ্ সুরত নতুন নতুন বিবি। সিরাজের কামনার আগুনে পুড়ে মরার আগে সুন্দরী গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে সতীত্ব রক্ষা করে। সিরাজ মিয়া মিরজাফরকে নির্দেশ দেয়, 'নতুন বিবি আন। বহুত্ খপ্ সুরত, বেহেস্তের হুরি চাই।' (পৃ-১৪)। সিরাজের লালসার দৃষ্টি পড়ে গোকুল রায়ের সুন্দরী যুবতী কন্যা কমলিনীর উপর। কমলিনীকে রক্ষা করার জন্য তার ধাত্রী কমলিনীর পোশাক পরে সিরাজের নৌকায় ওঠে। মোহনলালের ভগ্নী প্রমীলা সির'জের অঙ্কশায়িনী হয়। তার গর্ভেই সিরাজের প্রথম সন্তানের জন্ম। রানী ভবানীর কন্যা, বিধবা তারাসুন্দরীর উপর সিরাজের দৃষ্টি পড়ে। প্রমীলা তার সহচরীর সাহায্যে তারাসুন্দরীকে রক্ষা করে। তারাসুন্দরী ব্রজধামে আশ্রয় নেয়। মুর্শিদাবাদের নবাব পরিবারের নৈতিক দুর্বলতার চিত্র ঐতিহাসিক সত্য। "Sherferaz Khan had to suffer in the long run for his unrestrained passion for the newly married daughter-in-law of Jagat Seth, and Sirajdaulla was also amply paid back for his lust after Tarasundari, the daughter of Rani Bhabani".[৯১]

এই কারণে নবাব পরিবারের চরিত্র ও বীরত্বের অনেকখানি জৌলুষ নষ্ট হয়ে গেছে।

হীরাঝিলে চন্দ্রালোকিত মধ্যরজনীতে সিরাজ বিরহকাতরা লুৎফার পাশে। পেয়ালা আর নারীর আকর্ষণ সিরাজ উপেক্ষা করতে পারে না। লুৎফার বেদনাকাতর মুখের দিকে তাকিয়ে সিরাজ বলে—"সকলেই জানে আমি তোমারি প্রেমে বন্দী। আর এই সব যাহা কিছু দেখ, এই সকলই তোমার সিরাজের কৌতুকী প্রাণের শুধু দুদণ্ডের পুতুল খেলা মাত্র। নিশাশেষে দলিত পুষ্পের ন্যায় এ সবই পরিত্যক্ত হইবে, কিন্তু প্রিয়তমে, একমাত্র তুমিই সিরাজের প্রাণময়ী, আজন্ম সহচরী।" (পৃ-২৭)। লুৎফাকে বিষাদ ও করুণার প্রতিমূর্তি রূপে গড়েছেন কুসুমকুমারী। ঘসেটী-হোসেন খাঁর সাথে সিরাজের বিরোধ, হোসেন খাঁ নিহত হল। সিরাজের প্রতি ঘসেটীর প্রতিহিংসা। ঘসেটী-নবাব নওজেস প্রেম। নওজেস সিরাজের বিরুদ্ধে প্রজাদের উত্তেজিত করেন। আলিবর্দির মৃত্যুর পর সিরাজ হলেন নবাব।

ইংরাজরা সন্ধি অবমাননা করলো। মীরজাফর, জগৎশেঠ, রায়দুর্লভ প্রভৃতি সিরাজের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে পলাশীর যুদ্ধে সিরাজকে পরাজিত করে। লুৎফার প্রতিপক্ষ সোফিয়া ঘসেটীর পক্ষ নিয়ে সিরাজ ও লুৎফাকে ধরিয়ে দেয়। ভুল বুঝতে পেরে

সোফিয়া পাগল হয়ে গেল। রাজনৈতিক জটিল আবর্ত অপেক্ষা এই উপন্যাসে পারিবারিক জীবনবৃত্তান্ত অধিক প্রাধান্য পেয়েছে।

কুসুমকুমারী সিরাজের পতনের জন্য দায়ী করেছেন ইংরাজের নীতিজ্ঞানহীন স্বার্থবুদ্ধিকে।

স্বদেশী আন্দোলন জাতিকে যথার্থ ইতিহাস সন্ধানে উৎসুক করেছিল। বাঙালীর বলবীর্য যেমন প্রাধান্য পেয়েছে তেমনি ইংরাজের বিরুদ্ধে ধিক্‌কারও সমভাবে উচ্চারিত হয়েছে। লেখিকা সিরাজের জীবনের যাবতীয় ঘটনাকে উপন্যাসের মধ্যে টেনে আনেননি। সমকালের ঐতিহাসিক ভাবনাই উপন্যাসটিতে প্রাধান্য পেয়েছে। "Before you study the history, study the historian. Before you study the historian, study his historical and social environment".[৯২]

উপন্যাসের ক্ষেত্রেও কথাটি সমভাবে প্রযোজ্য। এ কালে ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত করে চিত্রিত করাই ছিল বড় কথা। যুগের চাহিদা পূরণে লেখিকার কোন কার্পণ্য বা শৈথিল্য ছিল না। একদিকে সিরাজকে যেমন মদ্যপ, যৌন-আসক্তিপরায়ণ রূপে চিত্রিত করা হয়েছে তেমনি আর একদিকে তাঁকে প্রেমিক, দেশভক্ত ও প্রজাবৎসল রূপে দেখান হয়েছে। সিরাজের দোষগুলিকে সহজভাবে উপস্থাপিত হয়েছে, মনে হবে যেন পুরুষের জীবনে এগুলি সাধারণ ঘটনা মাত্র।

সাময়িক পত্রে নারীর অবদান

বিশ্বের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যাবে সব দেশেই নারীমুক্তি আন্দোলন সূচনাকালে একান্তভাবেই আঞ্চলিক। নারী-জীবনের আঞ্চলিক সমস্যাগুলিই পত্র-পত্রিকায় প্রাধান্য পেয়েছে। বাঙলাদেশে এর কোন ব্যতিক্রম দেখা যাবে না। যুগের চিন্তানায়করা পরিবার ও পারিবারিক জীবন নিয়ে যতখানি ধ্যানধারণায় রত হলেন, জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে নারীদের সম্বন্ধে ততখানি তৎপরতা দেখা যায়নি। সতীদাহ, বিধবাবিবাহ, নারীশিক্ষা, বহুবিবাহ, কৌলীন্যপ্রথা, সূতিকাগৃহ সংস্কার, সন্তানপালন প্রভৃতি বিষয়গুলি একান্তই নারীকেন্দ্রিক সমস্যা। পত্র-পত্রিকায় এই সমস্যাগুলিই আলোচিত হত। এতদিনের অনুসৃত ঐতিহ্য থেকে দূরত্ব ক্রমশই বেড়ে যেতে লাগলো। রেলওয়ের প্রসার, শিল্পের প্রসার, খনি অঞ্চলের বিস্তার সমাজের নিম্নস্তরের নারীদের কর্মের বা জীবিকার সংস্থান করে দিল। মধ্যবিত্ত সমাজের নারীরা কিন্তু এতে বিশেষ লাভবান হলেন না। অথচ এ যুগে নারীমুক্তি আন্দোলনে যে সব নারীর এগিয়ে

এলেন তাঁরা সবাই মধ্যবিত্ত পরিবারের এবং আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত। এতদিন নারীদের পক্ষে প্রবক্তা ছিল পুরুষ এবং তাদের সম্পাদিত পত্রিকা। আধুনিক শিক্ষায় নারী ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটলো পরবর্তীকালে।

ভারতের দীর্ঘ ইতিহাসে সংবাদ লেনদেনের কিছু কিছু নজির মিলবে। কিন্তু তা রাজ অভিপ্রায় পূরণের জন্য। এর সঙ্গে সাধারণ মানুষের কোনরূপ যোগাযোগ ছিল না। উনিশ শতকের ভাবমন্দাকিনীর দুরন্ত ধারাকে ধারণ করেছিল সাময়িক পত্র। বাঙালী তরুণদের তখন বিশ্বের বিচিত্র জ্ঞান ভাণ্ডার লুঠ করার দুরন্ত বাসনা। পক্ষীর মত ডানা মেলে সাগর পারের নানা দেশের সংবাদ খুটে খুটে এনে সাময়িক পত্রে সংগ্রহ করছে। শিক্ষা, ধর্ম সমাজ, রাজনীতি, নারীমুক্তি প্রভৃতি আন্দোলনের উপর পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার প্রভাব লক্ষ্য করা যাবে। উনিশ শতকে ইউরোপে এই সময় নূতন ধরনের সাংবাদিকতা দেখা দিচ্ছিল। ম্যাথু আর্নল্ডের ভাষায়—

"It is full of ability, novelty, variety, sensation, sympathy, generous instinct ; its own great fault is that it is feather-brained. It throws out assertions at a venture, because it wishes them true..."[৯৩]

ভারতবর্ষের সংবাদ পত্রগুলির চরিত্র ও স্বভাবে আর্নল্ডের উদ্ধৃতিটির সঙ্গে মিল দেখতে পাবো। ছাপাখানা কেবল সাময়িক পত্রকেই সম্ভব করেনি, নারী ও শূদ্ররাও জাতে উঠলো। এতদিন নারী এবং শূদ্রদের পুঁথি স্পর্শ বা পাঠের সুযোগ ছিল না। ইংরাজদের ছাপাখানায় বাইবেলের সাথে রামায়ণ ও মহাভারত ছাপা হতে লাগলো। পুঁথির বদলে এল ছাপা বই এবং সাময়িক পত্রিকা। পদ্যের বদলে এল যুক্তি-নির্ভর গদ্য। ঘরে ঘরে পৌঁছে যেতে লাগলো ছাপান বই ও সাময়িক পত্রিকা। প্রথম যুগের পত্র পত্রিকায় নারীদের দুরবস্থার চিত্র আঁকা হয়েছে এবং সংস্কারের জন্য পুরুষরা কলম ধরেছেন। নারীরা চিঠিপত্র মাধ্যমে তাদের অভাব অভিযোগ অত্যন্ত ক্ষীণকণ্ঠে বলার চেষ্টা করেছেন। সমাচার চন্দ্রিকা যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে নারীদের অভিযোগ এবং অশ্রুজলকে প্রকাশ করেছে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে নারীদের অন্তঃপুর শিক্ষার সাহায্যার্থে পত্রিকা প্রকাশের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। ১৮৫৪ খৃঃ প্যারিচরণ মিত্র ও রাধানাথ শিকদারের সম্পাদনায় 'মাসিক পত্রিকা' প্রকাশিত হয়। মাত্র চার বৎসর প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম সংখ্যায় পত্রিকার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বলা হল, "এই পত্রিকা সাধারণের বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের জন্য ছাপা হইতেছে, যে ভাষায় আমাদের সচরাচর কথাবার্তা হয়, তাহাতেই প্রস্তাব সকল রচনা

হইবেক।"[৯৪] উদ্দেশ্য ও প্রয়াস সাধু। কিন্তু এ পত্রিকায় নারীদের রচনা প্রকাশে কোনরূপ আগ্রহ দেখান হল না। অথচ ১৮৪৯ সাল থেকে ঈশ্বর গুপ্ত সম্পাদিত সংবাদ প্রভাকরে নারী রচনা প্রকাশিত হচ্ছিল। নারীদের রচনা প্রকাশে গুপ্তকবির আন্তরিকতা লক্ষ্যণীয়। ইয়ংবেঙ্গলদের মধ্যে নারী বচনা সম্বন্ধে কোন দ্বিধা যদিও বা থেকেও থাকে ঈশ্বর গুপ্তের ছিল না। গুপ্তকবিকে নারী-জাগৃতির ক্ষেত্রে দ্বিধাগ্রস্থ ব্যক্তিত্ব বলে যারা চালাবার চেষ্টা কবেন তাঁরা সংবাদ প্রভাকবেব পৃষ্ঠাগুলিতে নিষ্ঠার সঙ্গে চোখ বুলোলেই সব সংশয়ের নিরসন হবে। মহিলাদের জন্য মাসিক পত্রিকা প্রকাশের সংখ্যা ক্রমশই বৃদ্ধি পেতে লাগলো। এসব পত্রিকা সমাজের আভিজাত্য ও নবগঠিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মহিলাদের জন্য। পত্রিকা পাঠেব উপযোগী পাঠিকা গড়ে উঠেছে—

"The books, with which the young women's mind are chiefly engaged, are the following; Ramayana, Mahabharata, Annada Mungal, Chundi, and a few other works, especially such as treat of the incarnation of Krishna, and the attributes of Sakti or Durgah. The vernacular news papers especially the Bhaskar and Prabhakur are in great demand with them."[৯৫]

একটি পত্রিকায় প্রকাশনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সেটি হোল 'বামাবোধিনী পত্রিকা'। 'মাসিক পত্রিকা' প্রকাশেব নয় বৎসর পরে উমেশচন্দ্র দত্তের সম্পাদনায় 'বামাবোধিনী পত্রিকা' (১৮৬৩) প্রকাশিত হয়। প্রথম সংখ্যায় পত্রিকার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হল, "অন্তঃপুর মধ্যে বিদ্যালোক প্রবেশের পথ করিতে না পারিলে সর্বসাধারণের হিত সাধন হইতে পারে না।"[৯৬] পত্রিকাটির 'বামারচনাবলী' নামে একটি নির্দিষ্ট অংশে নারীদের রচনা প্রকাশিত হত। নারীশিক্ষা, বৈধব্যদশা, বাল্যবিবাহ প্রভৃতি বিষয়ে নারীদের রচনা পুরুষের চিন্তা ভাবনার প্রতিধ্বনি মাত্র। কিন্তু পুরাণের তেজস্বিনী, স্বতন্ত্রা, শিক্ষিতা নারীদের সম্বন্ধে রচনা, দেশ বিদেশের নারীদের অগ্রগতির সংবাদ দেশীয় নারীদের কৃতিত্বের সংবাদ ছাপিয়ে নারীদের মধ্যে উৎসাহ সঞ্চারে সমর্থ হয়েছিল। ১৮৬৯ দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় 'অবলাবান্ধব' প্রকাশ করেন। পত্রিকাটির উদ্দেশ্য 'স্ত্রীলোকের উপযোগিতা ও নারীশিক্ষা'। একই বৎসরে প্রকাশিত হল 'জ্যোতিরিঙ্গন'। ১৮৭০ ঢাকা থেকে প্রকাশিত হল, 'নারী শিক্ষা পত্রিকা'। নারী শিক্ষা, নারীর পারিবারিক জীবন, বৈধব্য জীবনের কর্তব্য, সন্তান পালন ইত্যাদি ছিল সাময়িক পত্রিকা ও নারীবিষয়ক পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়। নারী জাগরণের প্রাথমিক পর্যায়ে সব দেশেই নারীদের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কর্তব্য নির্দিষ্ট করে দিচ্ছে পুরুষ নিয়ন্ত্রিত সমাজ। "There

arose a vast literature of handbooks and printed guides which gave advice to the middleclass women on family happiness crystallized attitudes independent of the tradition of the aristocracy. In these manuals, a gradual improvement in women's position is discernible. They repeatedly insist that the woman must be treated as the lieutenant of her husband, sharing his confidence and trust, and not as his chattel and slave. The husband retained his powers of discipline and his authority, but there was an increased emphasis on woman's rights".[৯৭]

সমাচার চন্দ্রিকা, সম্বাদ কৌমুদী, জ্ঞানান্বেষণ, বিবিধার্থ সংগ্রহ, সর্বশুভকরি পত্রিকা, মাসিক পত্রিকা এবং সংবাদ প্রভাকর প্রভৃতি পত্রিকার জন্মভূমি নগর কলকাতা। এই কলকাতা দখল করে আছে মুৎসুদ্দী, মুনশী, বেনিয়ান, ও দেওয়ানরা অর্থাৎ মধ্যবিত্ত শ্রেণী। তাদের লক্ষ্য ছিল '··· · "To make his life a success according to mercantile ideals".[৯৮] এ সব পত্রিকায় প্রাধান্য পাচ্ছে খৃষ্টান-হিন্দুব লড়াই, সতীদাহ রোধ নিয়ে লড়াই, বিধবাবিবাহ প্রচলন নিয়ে লড়াই, নারীর স্বামী, পুত্র, আত্মীয় ও পরিবারের প্রতি কর্তব্য পভৃতি। নারীশিক্ষার আয়োজন ও তার প্রতিক্রিয়া দেখা দিচ্ছে নগর কলকাতাতে। কলকাতায় এসে জড়ো হচ্ছেন সারা বাংলার সংগ্রামী সংস্কারক, শিল্পী ও সাহিত্যিক। এদের রচিত সাহিত্যে যে রস রুচির প্রকাশ তা কিছুটা ভিন্ন স্বাদের। কেননা এ জাতীয় সাহিত্যে নাগরিক বৃত্তি প্রধান। কলকাতার অধিবাসিনী আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতা মোক্ষদাদায়িনী মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বঙ্গমহিলা' (১৮৭০) প্রকাশ আনন্দের সংবাদ হলেও বিস্ময়ের কিছু নেই। এমন ঘটনা কলকাতায় ঘটাই সম্ভব। 'বঙ্গ মহিলা' মহিলা সম্পাদিত প্রথম পাক্ষিক পত্রিকা। এবার সুযোগ ঘটবে নারীদের বিষয় নিয়ে নারীরা কি ভাবছেন, তা জানার। মোক্ষদাদায়িনী সম্পাদকীয়তে লিখলেন—"ইউরোপীয় কামিনীগণের যেরূপ স্বাধীনতা আছে, বঙ্গীয় স্ত্রীলোকদিগের ঠিক সেইরূপ স্বাধীনতা এদেশীয় কতকগুলির লোকের বড় ইচ্ছা হইয়াছে। কিন্তু বঙ্গমহিলাদের সে ইচ্ছা নাই। ইউরোপীয় ও আমেরিকান স্ত্রীজাতির যেরূপ স্বাধীনতা দেখা যায়, তাহাকে আমরা স্বেচ্ছাচারিতা বলিয়া থাকি। ······তাহাদিগকে মেয়ে বলিতে তো আমাদের সাহস কুলায় না। নম্রতা, লজ্জাশীলতাই স্ত্রীলোকদিগের প্রধান গুণ।"[৯৯] কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্মিকাদের প্রতি উপদেশে একই কথা বলেছেন। সম্পাদকীয়তে আরো বলা হল 'স্ত্রীলোকদিগের স্বত্ব প্রভৃতির সমর্থন করা ইহার উদ্দেশ্য।'[১00] সম্পাদিকা

হেমচন্দ্রের 'বাঙালীর মেয়ে' কবিতাটির জবাব দিয়ে লিখলেন 'বাঙালীর বাবু'। ১৮৭৫ সালে থাকমণি দেবীর সম্পাদনায় 'অনাথিনী' প্রকাশিত হল। 'ভারতী' পত্রিকা প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত নারী সম্পাদিত পত্রিকায় আদর্শের কথা যতখানি স্থান পেল অনুভবের কথা ততখানি নয়। প্রচলিত সমাজ শাস্ত্র বিধির বিরুদ্ধে তাদের মনে সন্দেহ জাগলো। কিন্তু কল্পনা প্রবণ হল না। এ যুগে নারীদেব কবিতার বিষয় ঋতু, ঈশ্বর, ও স্বামীপ্রেম। প্রবন্ধের বিষয় হল স্ত্রী শিক্ষা, সন্তান পালন, সতী রমণীর কর্তব্য, পারিবারিক জীবনের দায়িত্ব ইত্যাদি। এ সব পত্রিকায় যে সব কাহিনী গল্প এবং উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছিল তার নায়িকারা নাবালিকা, নিরীহ, নিবপরাধিনী এবং অশিক্ষিতা। উপন্যাসেব বিকাশ পর্বে সব দেশেই এমনটি হযেছে। "Innocence and ignorance are the virtues of young fictional heroines through out the early years of the novel's development".[১০১]

নারীরা স্বাধীনতা বলতে বুঝেছেন, ইচ্ছামত ধর্ম কর্ম কবা, অশন বসন পাওয়া, ইচ্ছা মত আত্মীয় স্বজনের গৃহে যাওয়া। পক্ষী দীর্ঘদিন পিঞ্জবে আবদ্ধ থাকলে পিঞ্জব মুক্ত করে দিলেও সে উড়তে পারে না। নীলাকাশে ডানা মেলাব শক্তি সঞ্চয়েব সময় তাকে দিতে হয়। 'স্বাধীনতা' নিবন্ধে লেখিকার বক্তব্য—"কে বলে যে বঙ্গমহিলারা পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় গৃহরূপ কারাগারে আবদ্ধ আছে? তাহারা কি আপন আপন ইচ্ছামত ধর্ম কর্ম করিতে পারেন না? ইচ্ছানুসারে অশন বসন প্রাপ্ত হন না? আত্মীয় স্বজনের বাটীতে কি গমনাগমন করিতে পাবেন না? তাঁহাদের মন কি স্বাধীন নহে? তবে তাঁহারা পরাধীনতা শৃঙ্খলে বন্দীদশায় অবস্থিতি করিতেছেন, ইহা কি প্রকারে সম্ভব পর হইতে পারে?"[১০২] শিক্ষিতা নারীদের স্বাধীনতা সম্বন্ধীয় ধারণাটি এখনও স্বচ্ছ হয়নি।

১৮৭৭ সালে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় 'ভারতী' এবং ১৮৭৮ 'হিন্দু মহিলা' প্রকাশিত হয়। 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদক মণ্ডলীতে জ্যোতিরিন্দ্র-রবীন্দ্র-অক্ষয় চৌধুরীর সঙ্গে স্বর্ণকুমারী ও শরৎকুমারীও যুক্ত ছিলেন। পত্রিকাটিব সবচেয়ে বড় প্রেরণা স্থল ছিলেন কাদম্বরী দেবী। শরৎকুমারী লিখেছেন—"মহর্ষি পরিবারের গৃহলক্ষ্মী শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নী ছিলেন এই বাঁধন।[১০৩] কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুতে দ্বিজেন্দ্রনাথ পত্রিকাটি তুলে দিতে চেয়েছিলেন। তত্ত্ববোধিনীতে বিজ্ঞাপনও প্রকাশিত হয়েছিল। স্বর্ণকুমারী দেবী 'নারীর পালন শক্তির' পরিচয় দিয়ে পত্রিকাটিকে পরিচালনা করেন। ১২৯১-তে স্বর্ণকুমারী পত্রিকাটি পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। স্বর্ণকুমারী, সরলা দেবী ও হিরন্ময়ী দেবী পত্রিকাটি বত্রিশ বৎসর পরিচালনা করেন। পত্রিকাটির বয়স ৪৬ বৎসর। পত্রিকাটির আদর্শ ব্যাখ্যায় বলা হল—'বিস্তার দুই অঙ্গ' জ্ঞানোপার্জন এবং ভাবমূর্তি।[১০৪]

নারীদের স্বাধীনচিন্তা এবং রোমান্টিক ভাবকল্পনার যথেষ্ট সুযোগ করে দিল। ১২৯৩ ভারতীর সাথে বালক যুক্ত হয়ে 'ভারতী বালক' নামে ১২৯৯ পর্যন্ত প্রকাশিত হবার পর পত্রিকাটি পূর্বনাম ভারতীতে প্রত্যাবর্তন করে। ভারতীর লেখিকারা সৌখীন ছিলেন না। ভাবতী পত্রিকা গীতিকবিতা, নিবন্ধ, সমালোচনা, গল্প, উপন্যাস প্রভৃতিতে নূতন ধারার পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছেন—"শোভাবাজারের রাজবাড়ী যেমন ভট্টাচার্যদের উৎসাহদাতা, ঠাকুববাডী তেমনি নব্য সাহিত্যের উৎসাহদাতা।" ভারতীর নবীন লেখক লেখিকাবা পববর্তী কালে সাহিত্য ক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তার করবে। ভারতী একটি স্বতন্ত্র সাহিত্য-রুচি গডে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। সৃজনশীল রচনাব ক্ষেত্রে নূতন লেখিকাদের আবির্ভাব ঘটতে লাগলো। ভারতীতে প্রকাশিত নারীদের রচনার বিষয়-বৈচিত্র্য—গল্প, উপন্যাস, কবিতা, দর্শন, ইতিহাস, ভূগোল, সঙ্গীত, চিত্রাঙ্কন, বাংলার উৎসবাদি, প্রকৃতি বিজ্ঞান, পদার্থ বিদ্যা, উদ্ভিদ বিদ্যা, শরীর বিদ্যা, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, পোশাক পবিচ্ছদ, দেশী-বিদেশী সাহিত্যের অনুবাদ, পুস্তক সমালোচনা প্রভৃতি। বঙ্গদর্শন, সংবাদ প্রভাকর ও তত্ত্ববোধিনীর মত ভারতীও সোনার জলে বাঁধাই হয়ে ঘরে ঘরে বই এব শেলফে স্থান পেল। প্রথম বর্ষের ভূমিকায় লেখা হয়েছিল—"ভাবালোচনার সময় আমরা স্বদেশীয ভাবকেই বিশেষ স্নেহ দৃষ্টিতে দেখিব।"[১০৫] ভারতীর লেখিকারা স্বদেশের মাটিতে দেশীয় আলো বাতাসের অনুকূল সংস্কৃতির ফসল ফলাতে চাইলেন। এমন কি কৃষ্ণভাবিনী দাসী বিলেতে ঘুরে এলেও দেশীয় ঐতিহ্যকে কালের উপযোগী করে ব্যাখ্যা করতে লাগলেন।

'পরিচারিকা' (১৮৭৮) প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের সম্পাদনায় প্রকাশিত হলেও প্রধান প্রেরণাদাত্রী ছিলেন কেশবচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ মোহিনী দেবী। কয়েক বৎসর পর মোহিনী দেবী সম্পাদকেব দায়িত্ব নিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর মহারানী সুচারু দেবী, রানী নিরুপমা দেবী, মণিকা দেবী পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন।

মহিলা সম্পাদিত সাময়িক পত্রিকা সম্পাদনে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। সত্যেন্দ্রনাথ সহধর্মিনী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী 'বালক' (১৮৮৫), মহর্ষির পৌত্রী হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী 'পুণ্য' (১৮৯৭), ইন্দিরা দেবী ও প্রতিভা দেবী সম্পাদিত 'আনন্দ সঙ্গীত পত্রিকা' (১৩২০) প্রকাশিত হয়। ঠাকুর পরিবারের মহিলাদের সম্পাদিত পত্রিকার আলোচ্য সূচী বহুমুখী। সেবাব্রত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টায় তাঁর দ্বিতীয় কন্যার সম্পাদনায় 'অন্তঃপুর' (১৩০৪) প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির সব রচনাই মহিলাদের। প্রথম সংখ্যার প্রস্তাবনায় বলা হল, "রমণীদিগের ও তাহার সুকুমার মতি বালক-বালিকাদিগের জন্য" প্রকাশিত।

বালক বালিকা ও বয়োপ্রাপ্ত নারীরা একই পর্যায়ভুক্ত রয়ে গেলেন। জগৎ জীবনে নারীর জানার ও বলার কথা আর শিশুদের কৌতূহল নিশ্চয়ই এক নয়। প্রথম বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যাতেও নারীদের 'বহির্জগত হইতে একটি স্বতন্ত্র' স্থানে সুরক্ষিত রাখার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। বনলতার মৃত্যুর পর ১৯১৫ খৃঃ পর্যন্ত পত্রিকাটি জীবিত ছিল। হেমন্তকুমারী চৌধুরী, কুমুদিনী মিত্র, লীলাবতী মিত্র, সুখতারা দত্ত, বিরাজমোহিনী পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন।

১২৭৭, বৈশাখ 'বঙ্গমহিলা' পত্রিকা প্রকাশ থেকে ১৩০৪ 'অন্তঃপুর' প্রকাশের সময় পর্যন্ত মহিলা সম্পাদিত পত্রিকার সংখ্যা তেরোটি। অর্থাৎ প্রতি বৎসব একটি পত্রিকার জন্ম হয়েছে। অনেক নবজাতক সূতিকাগৃহে জীবন লীলা শেষ করেছে। তাই বলে প্রয়াসের ছেদ পড়েনি।

পরবর্তীকালে 'মুকুলের' সম্পাদিকা রূপে হেমলতা দেবী, 'জাহ্নবীর' সম্পাদিকা রূপে গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, 'ভারতমহিলা'র সম্পাদিকা রূপে সরযূবালা দেবী এবং 'আন্নেসা'র সম্পাদিকা রূপে সফিয়া খাতুনকে দেখা গিয়েছিল। ডানা শুধু হিন্দু পুরনারীরাই মেলেন নি, মুসলিম পুরনারীরাও পিঞ্জরাবদ্ধ থাকতে রাজী নন, আর সাময়িক পত্র তাঁদের সেই মুক্তির অবকাশ এনে দিয়েছে।

পাদটীকা

১। History of English Literature-Arthur Compton-Rickett, P—470

২। Calcutta Review, 1887, vol.—84-85, Critical Notices, P—XXXIV

৩। বাংলা কবিতার নব জন্ম—ডঃ সুরেশচন্দ্র মৈত্র, পৃ—৪৪৪

৪। ঐ ঐ পৃ—৪৪৫

৫। বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা—শ্রীভূদেব চৌধুরী, ২য় সংস্করণ, পৃ—৫৩৭

৬। সাহিত্য সাধক চরিতমালা—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—৫৪, পৃ—১৩

৭। সাহিত্যে নারী : স্রষ্টা ও সৃষ্টি—শ্রীমতী অনুরূপা দেবী, পৃ—১৩২

৮। হৃদয়-প্রবন্ধ-প্রতিভা, গিরীন্দ্র রচনাবলী, পৃ—৫৯৯

৯। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—ডঃ সুকুমার সেন, ২য় খণ্ড, পৃ—৪৮২
ডঃ সেন উদ্ধৃতিটির পাদটীকায় বলেছেন, ('অশ্রুকণার' ভূমিকা দ্রষ্টব্য।) অশ্রুকণার ভূমিকা পাঠে জানা যায় কবি অক্ষয়কুমার বড়াল সংকলন ও সংশোধন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ দ্বারা গ্রন্থটি সংশোধিত হয়নি।

১০। বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা—শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পৃ—৪৯

১১। বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা—শ্রীভূদেব চৌধুরী, ২য় সং, পৃ—৪২৩

১২। Calcutta Review, Critical Notices, 1877, Vol-64, P—Vii

১৩। ঐ ঐ ঐ

১৪। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত—ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ৭ম প্রকাশ, পৃ—৮৬

১৫। অমৃতলাল বসুর স্মৃতিকথা, বসুমতী, বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস থেকে উদ্ধৃত।

১৬। কৈফিয়ৎ --হিরন্ময়ী দেবী, ভারতী, বৈশাখ, ১৩২৩।

১৭। বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা—শ্রীভূদেব চৌধুরী, ২য় সং, পৃ—৪২৮

১৮। Kopal-Kundala—H. A. D. Phillips, 1885, Introduction P—XXVi.

১৮ক। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনস্মৃতি—বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

১৮খ। রমেশ রচনাবলী—ইউনাইটেড পাবলিশার্স, জীবনপ্রভাত, পৃ—২৮০

১৯। রাজসিংহ—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিজ্ঞাপন।

২০। Historical Drama—The relation of Lit. and Reality-Harbert Lindenberger, 1975, P—2.

২১। Historical Drama—The Relation of Lit. and Reality-Herbert Lindenberger, 1975, P—2.

২২। বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা—ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোঃ, পৃ—২৮৪

২৩। স্বর্ণকুমারী ও বাংলা সাহিত্য—ডঃ পশুপতি শাসমল, পৃ—১৮০

২৪। ঐ ঐ পৃ—১৮৫

২৫। উষা-চিন্তা—শ্রীমতী স্বর্ণময়ী গুপ্তা, ১২৯৫, পৃ—৪৮

২৬। ঐ ঐ ঐ পৃ—২৮

২৭। সাহিত্যে নারী : স্রষ্টা ও সৃষ্টি—অনুরূপা দেবী, ১৯৪৯, পৃ—৪১৬, পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

২৮। The Fictional Technique of Scott Fitzgerald—James E. Muller, P—3

২৯। The Theory of the Novel in England 1850-1870—Richard Stang, P—24.

৩০। বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস—ডঃ সুকুমার সেন, ২য় খণ্ড, ৫ম সং, পৃ—২৪৩

৩১। বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা—শ্রীভূদেব চৌধুরী, পৃ—৩৭৭

৩২। Calcutta Review, 1917, Sixty years of English Education —M. Bhattacharyya, P—88.

৩৩, ৩৪, ৩৫। Hindu Marriage Custom—An Important meeting announced the "Hindu Marriage Customs" took place in the Hall of the Late Maharaja Kamal Krishna Bahadur on Sunday, the 6th Aug, 1887, at 5 p. m. P—63, 67.

৩৬। বাংলা নাটকের বিবর্তন—ডঃ সুরেশচন্দ্র মৈত্র, পৃ—৫২৯

৩৭। Quoted from Rev. Long's Hand Book of Bengal Misson in connection with the Church of England Calcutta Ladies Societies for Native Female Education, 1847, P-410.

৩৮। বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা—ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ—২৮৭

৩৯। Calcutta Christian Observer, Dec, 1852, Christian Brahmin Lady, P—568

সংবাদটি, সংবাদ প্রভাকরেও ছাপা হয়েছিল। ১লা বৈশাখ, ১২৬০, পৃ—২৭

৪০। উষাচিন্তা—স্বর্ণময়ী গুপ্তা, ১২৯৭, পৃ—১৩৫

৪১। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস—ডঃ সুকুমার সেন, ২য় খণ্ড, পৃ—২৪১

৪২। বাংলা সাহিত্যে গদ্য— ঐ পৃ—১০৯

৪৩। Calcutta Review, April. 1904, Vol-118, P—125; The Emancipation of Women in Bengal—P. C. Mazumder.

৪৪। Calcutta Review, 1895, Vol.-101, P—30

৪৫। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবনচরিত—হেমলতা দেবী, ১৩২৭, পৃ—১৩৮-৩৯

৪৬। ভারতী, শ্রাবণ, ১৩১৬, অন্তঃপুর, পৃ—২২৩-২২৫

৪৭। বক্তৃতা স্তবক—শিবনাথ শাস্ত্রী, ১৮৮৮, পৃ—১৭

৪৮। ললনা-সুহৃদ—শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্তী, ১২৯৪, পৃ—৯
৪৯। প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩১৮, ব্রাহ্মসমাজের সার্থকতা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃ—৪৬-৫০
৫০। Feminine Attitude in the 19th Century—Dr. X. Willett, 1935, P—137.
৫১। সরল বাঙ্গালা অভিধান—সুবলচন্দ্র মিত্র সংকলিত, ৮ম সং, পৃ—১০৫৬
৫২। ভারতী, পৌষ, ১২৯৭, সমাজ ও সমাজ সংস্কার—কৃষ্ণভামিনী দাসী, পৃ—৫০১
৫২ক। ভারতী, পৌষ, ১২৯৭, সমাজ ও সমাজ সংস্কার—কৃষ্ণভামিনী দাসী, পৃ—৫০১
৫৩। The Novel and the Modern World—David Diaches, Phonenix Books, P—1.
৫৪। Woman's Work and Woman's Culture—J. Butlor, London, 1869, Introduction P—XXV.
৫৫। Heman's Female Instructor এর আলোচ্য সূচী The art of Reading and writing, Love and courtship, choice of husband, Rules of conversation, Female Dress, Domestic economy, Behaviour in company, attitude to life. ইত্যাদি। শিবনাথ শাস্ত্রীর 'গৃহধর্ম' গ্রন্থের আলোচ্য সূচী—পরিবার, বিবাহ, রমণীর অধিকার, পতি-পত্নীর সম্বন্ধ, সন্তান পালন, স্বদেশের প্রতি কর্তব্য, প্রতিবেশীর প্রতি কর্তব্য, পারিবারিক উপাসনা, রমণীর পোষাক, জনক-জননী, বন্ধু ও বন্ধুতা। 'বক্তৃতা স্তবকের আলোচ্য সূচী—মনোনয়ন, 'ভালবাসা', 'অবরোধ', 'স্ত্রী-শিক্ষা' ইত্যাদি। দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'হিন্দুধর্ম' ১ম ও ২য় ভাগ, কলিকাতা হিন্দু মহাসভা কর্তৃক প্রকাশিত দ্রষ্টব্য।
৫৬। The woman movement—Edited by Prof. G. R. Klton.
৫৭। ঐ ঐ
৫৮। নব্যভারত, সপ্তদশ খণ্ড, ৫ম সংখ্যা ভাদ্র ১৩০৬, পৃ—২৬১
৫৯। স্বর্ণকুমারী ও বাংলা সাহিত্য—ডঃ পশুপতি শাসমল, পৃ—২৫৯
৬০। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস—ডঃ সুকুমার সেন, পৃ—২২৫
৬১। আনন্দমঠ—সাহিত্য পরিষদ্ সং, ভূমিকা ডঃ যদুনাথ সরকার।

৬২। রবীন্দ্র সৃষ্টি সমীক্ষা—ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ— ৪৫৬
৬৩। ভারতী ও বালক, আশ্বিন ১২৯৬, নব্যবঙ্গের আন্দোলন—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃ—৩৪৬
৬৪। যজ্ঞভঙ্গ—প্রিয়নাথ গুহ, ১৩১৪, পৃ—১০৮
৬৫। ঐ ঐ ঐ পৃ—১০২
৬৬। ঐ ঐ ঐ পৃ—১০৫
৬৭। ঐ ঐ ঐ পৃ—১০৫
৬৮। জাতীয় আন্দোলনে বঙ্গনারী—যোগেশচন্দ্র বাগল, পৃ—৪
৬৯। ভারতী ও বালক, ভাদ্র ১২৯৭, মহাযজ্ঞের নিমন্ত্রণ—উদাসীন, পৃ—২৮৮-২৯৭
৭০। নব্যভারত, ভাদ্র ১৩০৬, অবলাসমিতি, পৃ—২৬
৭১। নব্যভারত, সপ্তদশ খণ্ড, ৫ম সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৯৬, পৃ—২৬
৭২। The Nineteenth Century, July 1891, The wild women—as politician —E Lymn Linton, P—79.
৭৩। The Development of Indian National Congress 1892 1909.
৭৪। Pansy Chaya Ghosh, M. A., Ph. D., London, 1960, P—183.
৭৫। গল্প প্রবন্ধ মঞ্জুষা—স্বর্ণকুমারী দেবী, পৃ—২৫২, বসুমতী সাহিত্য মন্দির গ্রন্থাবলী সিরিজ।
৭৬। স্বর্ণকুমারী ও বাংলা সাহিত্য—ডঃ পশুপতি শাসমল, পৃ—১২
৭৭। কালীপূজায় বলিদান ও বর্তমানে তাহার উপযোগিতা—সরলা দেবী, পৃ—১২
৭৮। রবীন্দ্র-সৃষ্টি সমীক্ষা—শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ— ৪১৭
৭৯। বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা—ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ—২৮৩
৮০। Feminine Attitude in the 19th century—Dr. C. Wilhett, London, P—197.
৮১। Calcutta Review, 1904, Vol. 118; The emancipation of women in Bengal—P. C. Mazumder, P—128.
৮২। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র—শিবনাথ শাস্ত্রী, পৃ—২৭
৮৩। পঞ্চপুষ্প—৫ম বর্ষ, ১৩৩৯, ১ম সংখ্যা, পৃ—৫২১-৫২৩
৮৪। ভারতী ও বালক, ১২৯৫, পৃ—২৫৭

৮৫। ভারতী ও বালক. ১২৯৫, পৃ—২৫৭
৮৬। আধুনিক বাংলা ছন্দ—ডঃ নীলরতন সেন, পৃ—১৯৭
৮৭। Poetry—Elizabeth Drew, P—74.
৮৮। 'স্নেহলতা' উপন্যাসের পরিশিষ্টে উদ্ধৃত।
৮৯। হিন্দু ধর্মের আন্দোলন ও সংস্কার—দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ১৩০০, পৃ—১১-.২
৯০। Characteristics of women—Mrs. Jameson, 1870, P—13-
৯১। Position of women in Bengal in the Mid-Eighteenth century—K. K. Dutta, Calcutta Review, 1930, Oct., Vol. 37, P—18
৯২। What is History—E. H. Carr.
৯৩। The Nineteenth century, May, 1887.
৯৪। বাংলা সাময়িক পত্র (১৮১৮-৬৮)—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ—১৩৫
৯৫। Calcutta Review, 1949, Vol-II, Miscellaneous Notices P—XXiii
৯৬। বামাবোধিনী পত্রিকা, ১২৭০, ভাদ্র।
৯৭। Woman in Man-Made world—The family and cultural change-Bernhard.—J. Stern., P—14.
৯৮। ঐ ঐ ঐ
৯৯। সাময়িক পত্র সম্পাদনায় বঙ্গনারী—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ—২
১০০। ঐ ঐ
১০১। The Female Imagination—Patricia Meyer Spacks, London George Allen & Unwin Ltd , 1972, P—113.
১০২। সাময়িক পত্র সম্পাদনায় বঙ্গনারী—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ—৩
১০৩। ঐ ঐ পৃ—৫
১০৪। বাংলা সাময়িক পত্র (২য় খণ্ড)—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ—২৩
১০৫। ঐ ঐ

॥ পঞ্চম অধ্যায় ॥

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য, কবি মানসিকতার জন্ম। কাব্য বিষয় সমাজ থেকে সরে এসে ব্যক্তিকে আশ্রয় করেছে। কবি নিজের হৃদয় এবং প্রকৃতি-লোকে একেশ্বর হয়ে পড়লেন। মধ্যযুগের প্রথাসর্বস্বতাকে অতিক্রম করে মহিলা কবিরা লজ্জার অবগুণ্ঠন এবং প্রচলিত সামাজিক সংস্কার অবহেলা করে আত্মকথনে সাহসী হয়েছেন। এই নিষ্ক্রমণ স্বাভাবিক ঘটনা রূপেই গণ্য করতে হবে। দীর্ঘকাল ধরে শিক্ষার প্রসার ও নানা আন্দোলনে সেই জাগরণ সমাপ্ত হল। এবার থেকে আত্মনিষ্ঠ কাব্য ভাবনায় নির্ভেজাল নারীমনের নানা সম্পদ আহৃত হবে। কাব্যের বিষয়বস্তু দেশ কালে পালটায় না, পালটায় কবির দৃষ্টিভঙ্গি। এ যুগে কবিতে কবিতে পার্থক্য বিষয়বস্তুতে যতখানি তারচেয়ে অনেক বেশি স্বতন্ত্র হৃদয়াবেগে ও ব্যক্তি মানসিকতায়। মহিলা কবিদের সামাজিক ও পারিবারিক পরিবেশ, শিক্ষা ও নানাবিধ সমস্যা বিচিত্র অভিজ্ঞতার অধিকারিণী করে তুলেছে। এই অভিজ্ঞতা সব সময় পুরুষের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলবে না। অথচ মহিলাদের স্বতন্ত্র ভাষা শৈলীও গঠিত হয়নি। এই ভাষা মেয়েলী হতে হবে এমন নয়। কিন্তু নারীর অনুভবের ভাষা হতে হবে। নারীর অভিজ্ঞতা প্রকাশের পথ-প্রস্তুতিতে অগ্রণীর ভূমিকা নিয়েছিলেন স্বর্ণকুমারী, গিরীন্দ্রমোহিনী, কামিনী রায়, মানকুমারী, লজ্জাবতী, সরলাদেবী, হিরন্ময়ী দেবী ও সরোজকুমারী। এঁদের যৌথ চেষ্টায় মহিলা রচিত কাব্যের স্বতন্ত্র রূপ খানিকটা তৈরী হয়ে গেল।

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে আলোচিত মহিলা সাহিত্যিকদের সাহিত্য সমালোচনায় তাদের জীবনকে নির্ভর করা সম্ভব হয়নি। কেননা তা ছিল দুর্লভ এবং প্রায় ক্ষেত্রেই অপ্রাসাঙ্গিক। এতদিন মহিলা কবিরা স্বামী প্রেম, বৈধব্যজীবন, মৃত স্বামীর স্তুতি, অপত্যস্নেহ, প্রচলিত ঢং-এ প্রকৃতি বিষয়ক কবিতা লিখতেই অভ্যস্ত ছিলেন। রচনার পরিমাণের দিক থেকে বিচার করলে ব্যতিক্রম সামান্যই। সমাজশাসন ও আত্মশাসনের ফলে কবি হৃদয়ের বাতায়ন সব সময় মুক্ত হতে পারেনি। মহিলা কবিদের বিবাহ হয়েছে দশ থেকে তের বৎসরের মধ্যে। স্বামীগৃহে পুত্র কন্যা ও পরিজনের সেবার পর কাব্যচর্চা। এরই মধ্যে কামিনী রায়, মানকুমারী, লজ্জাবতী, প্রমীলা নাগ ও সরোজ-কুমারী যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। স্বর্ণকুমারী, গিরীন্দ্রমোহিনী ও কুসুমকুমারী অসংখ্য দাস-দাসী পরিবৃতা হয়ে থাকতেন। আর্থিক স্বচ্ছলতা এবং স্বামী ও পরিবারের

আনুকূল্যে এঁদের প্রতিভার বিকাশ। স্বর্ণকুমারী ঠাকুর পরিবারের কন্যা। স্বামী জানকী ঘোষাল জমিদার তনয় এবং ব্যবসায়ী। গিরীন্দ্রমোহিনী লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিত্তশালী দত্তকুলের বধূ। স্বামী আধুনিক ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত। কুসুমকুমারী লাখোটিয়া জমিদারের স্ত্রী। দৈনন্দিন সাংসারিক ক্রিয়া কর্মে তাঁদের ডাক পড়তো খুবই কম। তাদের জীবনের বিরাট একটা অংশ জুড়ে থাকতো অবকাশ।

উনিশ শতকের শেষপাদ থেকে বিংশ শতকের প্রথমপাদ পর্যন্ত সামাজিক আদর্শ ও চাহিদাকে কেন্দ্রে রেখে বিকশিত হচ্ছিল বৌদ্ধিক, কাল্পনিক ও আত্মিক ভাবনাগুলো। এযুগের চিন্তাবিদ্‌রা সামায়িক ও সংবাদপত্রে ভুরি ভুরি প্রবন্ধ ও সমালোচনা লিখছেন জীবনযাপন ও জীবনধারণের উপায় সম্বন্ধে। কালের রূপান্তর নির্ভর করে সমভাবে শিল্পভাবনা ও জনজীবনের উপর। একে অপরের পরিপুরক। শিল্পভাবনার প্রগতি কিন্তু তখনও জনজীবনে শক্তি সঞ্চার করতে পারছে না। অনুভব আছে, নৈতিক সমর্থনও আছে, কিন্তু সামাজিক ক্রিয়া নেই। একবাক্যে সবাই বলছেন বিধবার দুঃখ দুর হওয়া উচিত, কৌলীন্য প্রথার কোন মানে হয়না, নারী শিক্ষার প্রসার বাঞ্ছনীয়, আর্থিক স্বাধীনতা ব্যতীত নারীর পরিপুর্ণ মুক্তি সম্ভব নয়। তবুও বিধবাবিবাহ হচ্ছে না, বহুবিবাহ বিদ্যমান, বাল্যবিবাহের ফলে নারীশিক্ষা ব্যাপক হতে পারছে না। প্রকৃতপক্ষে এটা পরীক্ষা নিরীক্ষার কাল বলেই, সংশয় ও দ্বিধারও কাল।

চণ্ডীচরণ সেনের কন্যা কামিনী সেন (রায়), রাজনারায়ণ কন্যা লজ্জাবতী, মধুসূদন দত্তের ভ্রাতুষ্পুত্রী বাল্‌-বিধবা মানকুমারী, সরোজকুমারী, হিরন্ময়ী, সরলা দেবী, অনুরূপা দেবী প্রভৃতির আবির্ভাব বাংলা সাহিত্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

কামিনী রায় ছাত্রী জীবনে যথেষ্ট কৃতিত্বের অধিকারিণী। ১৮৮৬ সালে সংস্কৃতে অনার্স সহ উত্তীর্ণ হয়ে বেথুন বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রীর পদে নিযুক্ত হন। গণিত, দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর কৌতুহল অসীম। ১৮৮৯ সালে তাঁর 'আলো ও ছায়া' কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ এবং ১৮৯৪ সালে সিভিলিয়ান কেদারনাথ রায়ের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। তখন কামিনী রায়ের বয়স ত্রিশ। সে সময় তের থেকে পনের বৎস বয়সে বাংলার মেয়েরা পুত্রকন্যার জননী হতেন। ত্রিশ বৎসর বয়সে শ্বশ্রুঠাকুরানীর ভূমিকা নিতেন। পদোচিত গাম্ভীর্য বয়সোচিত না হলেও এটাই ছিল সামাজিক বিধি। কামিনী রায়ের জীবনে কামনা, বাসনা, প্রেম, জীবনের লক্ষ্য এবং ভাবনা পরিণত হবার সুযোগ পেয়েছিল। কামিনী রায়ের কাব্যে নারীর স্বাধিকারের কথা আছে। শুধু প্রেমিকা, জননী বা কন্যা রূপের প্রশস্তি নেই।

মনীষী রাজনারায়ণের কনিষ্ঠা কন্যা লজ্জাবতী বসু আজীবন কুমারী ছিলেন।

পিতার সঙ্গে মেদিনীপুরে জীবনের অধিকাংশ বছরগুলো কেটেছে। পিতার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে তাঁর শিক্ষা দীক্ষা। ব্রাহ্ম রাজনারায়ণ কিন্তু হিন্দু রাজনারায়ণও ছিলেন। সামাজিক বিধিবধান তাঁর পক্ষে সব সময় অবহেলা করা সম্ভব ছিল না। লজ্জাবতী সেই সামাজিক কাঠামোর মধ্যে কুমারীজীবন যাপন করেছেন। ঘটনাটি নিশ্চয়ই বিস্ময়কর। কামিনী রায় ও লজ্জাবতী কুমারী জীবনে আত্ম-আবিষ্কারে রত হয়েছেন। কামিনী রায় অকস্মাৎ নিজেকে অবিষ্কার করে ফেলেন—

নিভৃত হৃদয় কক্ষে ধীরে ধীরে অবতরি
নিরখি আবাক্ হয়ে রই।
এই আমি —— এই আমি ?
হায়! হায়! এই আমি ? (দুঃখ পথে, আলো ও ছায়া)

কামিনী রায়ের কাব্যে প্রথম নারী মনের প্রকাশ। উপন্যাসে নারী মন তেমন প্রকাশ পায়নি। কামিনী রায়ের মারফৎ উপন্যাসে তার প্রকাশ ঘটল। সর্ব প্রথম লজ্জাবতী নিজেকে এবং নিজের কামনা, বাসনা ও পিপাসাকে জানতে চেয়েছেন—

থাম থাম হেথা হতে যাও, যাও সবে চলে
আমারে শুনিতে দাও আপনার কথা
ভুলায়ে রেখোনা মোরে শতকথা বলে
আমারে বুঝিতে দাও আপনার ব্যথা।
বদ্ধ হতে তোমাদের শত কোলাহলে
বধির পরাণ কিছু শুনিতে না পায়।
বাহিরে প্রাণের ডাক কেঁদে যায় চলে
নিরুদ্ধ বাসনা কাঁদি করে হায় হায়।

এই হোল নারীর হৃদয় উদ্‌ঘাটনের একান্ত প্রয়াস। কবি এখানেই থামেননি—

আমার আমিত্ব আমি দিবনা ডুবিতে।[১]

কামিনী রায় ও লজ্জাবতী বসুর কুমারী জীবনে প্রেম, দয়িত, কামনা বাসনা নিয়ে কবিতার অভাব নেই। দুই কবিই কুমারী জীবনে পূর্বরাগের কথা না বলে অনুরাগ ও বিরহ বেদনার কথা বলেছেন। কামিনী রায় কুমারী জীবনের রহস্যের কথা 'পঞ্চক' পর্যায়ের একটি কবিতায় ব্যক্ত করেছেন।

আধেক হৃদয় তার সংসারের তীরে,
আধেক নিয়ত দূর সুরপুরে রয়।
নিরাশা, পিপাসা কভু আধেকের ঘিরে,

আধ্ তার ভুলিবার টলিবার নয়—
সেই তার কুমারী হৃদয়।

*　　*　　*　　*

আমার—আমার কভু হইবার নয়
সেই তার কুমারী হৃদয়।

প্রেম নিয়ে কামিনী রায়ের অনেকগুলি কবিতা আছে। কবির কাছে ভালবাসা—"ভালবাসা জীবনের মধু, ভালবাসা নয়নের আলো।" এই প্রেম যখন কুমারী জীবনে আসে—

হৃদয়ের অন্তঃপুরে, নব বধূটির মত,
ভালবাসা মৃদু পদে করে বিচরণ,
পশিলে আপন কানে আপনার মৃদুগীত,
সরমে আকুল হয়ে মরে সে তখন,
আপনার ছায়া দেখি দূরে দূরে সরি যায়,
অযুতে অযুত ফুল ফুটে তার পায় পায়।

কুমারীর লজ্জিত সশঙ্কিত প্রেম প্রচলিত প্রেম ভাবনার মধ্যে ভিন্নতর স্বাদ এনে দিল। প্রেম-সর্বস্ব নারী জীবন—

প্রণয় সে আত্মার চেতন,
জীবনের জনম নূতন,
মরণের মরণ হেথায়।

নারী পুরুষের কাছে কোন অঙ্গীকার ব্যতীতই 'ভীতি ভাবনাহীন আত্ম বিসর্জ্জন' দেয়। অথচ এ সমাজের কাছে নারী ব্যক্তিত্বের কোন মুল্য নেই। সে পণ্যের মত কেনাবেচার বস্তুতে পরিণত হয়েছে।

শুধু দেহখানি লাগি
যা কিছু নারীর মুল্য, সেই দেহ দেখি
আসে ক্রেতা, বীর্য্যশুল্কা লয়ে যাবে কিনে
শুধু দেহ বলে, নাহি করিবে জিজ্ঞাসা
আছে কিনা আছে হিয়া, থাকিলে
কাহারে চাহে, রুচি তার রূপে, কিবা বিত্তে
কিবা শাস্ত্র জ্ঞানে, কিবা খেলাইতে

শিশু সাথে। হৃদয় বিশ্বস্ত কিনা
কে চাহে জানিতে ? (অম্বা, পৃ-৫৫)।

এ নারী আত্মসচেতন। 'প্রাণপূর্ণ, প্রাণপ্লাবি, অমেয়' প্রেমের পরিবর্তে পায় উপেক্ষা। ভালবাসার বিনিময়ে সে সমাজে কলঙ্কিনী (এই তো কলঙ্ক মম)। এখনও নারীর মনোনয়নের স্বাধীনতা নেই, ভালবাসা স্বৈরিণী বৃত্তি বলে ঘৃণিত, সামাজিক মর্যাদা রোমান্টিক কাব্যে যতখানি প্রকাশিত বাস্তব জীবনে তার সন্ধান নেই। পুরুষ রচিত গীতিকাব্যে নারী প্রায় দেবীর বিগ্রহ নিয়েছে। নারী তো পুরুষ কবির হৃদয়ের দর্পণ। তাতেই পুরুষ তার কল্পিত জীবনকে প্রতিফলিত করতে চায়। অর্থাৎ সে যা হতে চায়, পেতে চায়। এখানে নারীর কোন ভূমিকা নেই। তার ভূমিকা শুধু হবার পুরুষের বাসনা পূরণের। কামিনী রায়ের কিছু কবিতায় পুরুষ, পুরুষের প্রেম, পুরুষের স্বভাব প্রভৃতি সম্বন্ধে নারীর নিজস্ব বক্তব্য উপস্থাপিত হয়েছে। নারীর কাছে পুরুষের প্রেম—

পুরুষের প্রেম সেও পুরুষের মত
সবল, সহিষ্ণু, ধীর, উদার নির্ভীক
মস্তক উন্নত, চক্ষু প্রভাময় স্বতঃ,
—(অযোগ্য ও যোগ্য প্রেম, পৃ-১৩৪)

কিন্তু 'জটিল পুরুষ চিত্ত'। আকর্ষণ ক্ষণস্থায়ী। সর্বদাই বহির্মুখীন। স্বভাবের মধ্যেই রয়েছে সহজাত বিতৃষ্ণা। ভারতবর্ষের আদর্শ পুরুষ তাই মহাদেব।

তবে যদি নিত্যদৃষ্টি, নিত্য সহবাস
চক্ষে এনে দেয় তৃপ্তি, হৃদয়ে বিরাগ,
আমি তার কি করিব ? আমি বারমাস
তোমার পিঞ্জরের পাখি, ওহে মহাভাস।

নারীর কাছে পুরুষ ও পুরুষের প্রেম যে কত বড় তা 'পরীক্ষা' কবিতায় ব্যক্ত হয়েছে।

তোমার অভাব, সুখের অভাব
প্রাণের অভাব যেন।

ভারতে অন্নপূর্ণা আদর্শ নারীর প্রতীক। নারীরা স্বাভাবিক ভাবেই ঘরমুখো। সংসারই নারীর আত্মপ্রকাশের প্রধান ক্ষেত্র। প্রেম, স্নেহ মমতা নিয়ে সে সংসারের কাছে পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করে। প্রেমিকের চারপাশে নিজের স্বপ্ন সাধের বলয় রেখা টেনে উর্ণনাভের মত তন্তুজাল সৃষ্টি করে নিজে জড়িয়ে পড়ে। এ তার মৃত্যু নয়

জন্মান্তর। নারীর চরম সার্থকতা বধূরূপে, সহধর্মিণী রূপে পুরুষের পাশে আত্ম-প্রকাশের মধ্যে।

আমিও যে পেয়েছি দাঁড়াতে সে
আলোতে কোন শুভক্ষণে,
সেইটুকু নারী জীবনের সফলতা জানিতেছি মনে।

বাংলায় প্রচলিত একটা প্রবাদ আছে, নারীর বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না। 'ভিখারিনী' কবিতায় নারী নিজেই তার এই অক্ষমতার কথা বলেছেন—

জানিনে তো এত যে, এত যে কঠিন
প্রাণ নিয়ে প্রাণ টেনে আনা,
'দাও কিছু'—নারিনু কহিতে,
শিখি নাই চাহিবার ভাষা
ভাল হল, গিয়ে ভিক্ষে নিতে
যা আছিল সব দিয়ে আসা।

—(ভিখারিনী, পৃ-১২)

নারীর ভাষা তো কেবল শব্দ নয়, চোখের জলও। পুরুষ নারীর মুখের ভাষা অনুধাবন করতে পারে, পারে না চোখের জলের ভাষা। তাই নারীকেই তার অশ্রুর রহস্য উদ্‌ঘাটন করে দিতে হয়।

হাত মোর বাঁধা তব হাতে,
শ্রান্ত শির তব স্কন্ধোপরি,
জানিনা এ সুস্নিগ্ধ সন্ধ্যাতে
অশ্রু যেন ওঠে আঁখি ভরি।
দুঃখ নয়, ইহা দুঃখ নয়,
এইটুকু জানিও নিশ্চয়।

নারী-জীবন যতই বুদ্ধি গ্রাহ্য হচ্ছে, যতই আত্মসচেতন হয়ে উঠেছে ততই নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ছে এবং একটি শূন্যতাবোধের জন্য করুণ ও বিষাদের সুর পেয়ে বসছে। নারী সত্তার জাগরণ ঘটছে কিন্তু প্রকাশের সহজ সরল পথ নেই। বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে সমাজ, বিধি-বিধান, পুরুষের আধিপত্য এবং তার লজ্জা। আজ আর সে দেহের গরবে গরবিনী নয়, মনের বাসনা পিপাসায় নিঃসঙ্গ। তার চাওয়া-পাওয়ার স্বাধীনতা নেই। তাই

তার মন বিষাদ ও ক্লান্ত বেদনার সুরে সাধা। "কথার অতীত বিষাদ কথায় বুঝাব কত।" ঠাকুরমাকে নাত্‌নি বলে—

জায়া মাতা হতে সবে পারি কিনা পারি,
সর্বাগ্রে আমরা নারী, সর্বশেষে নারী।

কবি নারীর অখণ্ড রূপের স্বীকৃতি চেয়েছেন। জায়া, জননী, প্রেয়সী, কন্যা প্রভৃতি নারীর খণ্ডিত প্রকাশ।

কবির আক্ষেপ আছে, অভিযোগ আছে, সামাজিক নির্যাতনের কথাও বলেছেন, পরাধীনতার যন্ত্রণাও তাঁকে বিচলিত করেছে। কিন্তু কোথাও তিনি জ্বালাময়ী ভাষায় আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত ঘটাননি। কোথাও অধৈর্য নেই—সর্বংসহা ধরিত্রীর মত আপন বক্ষ পেতে যেমন নিজ জীবনের শোককে গ্রহণ করেছেন তেমনি গ্রহণ করেছেন জাতীয় জীবনের যন্ত্রণাকেও। দেশী-বিদেশী সাহিত্য পাঠ করলেও তিনি ছিলেন আদর্শ ভারতীয় নারী। সতী সাবিত্রী দময়ন্তী তাঁর জীবনের আদর্শ। আদর্শ নাবী আর সার্থক কবি এক কথা নয়। সমাজের চোখে আদর্শ নারী হতে যেয়ে কবি-জীবন অবহেলিত হল। নাত বৌ বলে,—

আসল কথাটি এই—পুরুষ যা চায়
নারী তাই হতে পারে, তাই হয়ে যায়।

কামিনী রায় নিজ জীবনেও তাই হয়েছিলেন। বিবাহের পর তিনি দীর্ঘদিন কবিতা লেখেননি। বান্ধবীদের অভিযোগের উত্তরে স্বামী ও সন্তানদের দেখিয়ে বলেছিলেন—"এইগুলিই আমার জীবন্ত কবিতা"।[২] তিনি বিবাহিত জীবনে স্বামী-সেবা, গৃহকর্ম ও সন্তান পালনকেই আর দশজন গৃহিণীর মত বিবাহিত জীবনের আদর্শ বলে গ্রহণ করেছেন।

'আলো ও ছায়া' কাব্যগ্রন্থের অনাহুত, চিন্ময় প্রতি, নববর্ষে, কোন বালিকার প্রতি, প্রভৃতি কবিতায় মাতৃত্বের বেদনাই প্রধান। 'গুঞ্জন' কাব্যগ্রন্থের ভাষা শিশু ও শিশুর মায়ের ভাষা। 'অশোক সঙ্গীত'-এ শোকার্ত মাতৃহৃদয়ের বাৎসল্য রসই প্রধান।

রবীন্দ্রনাথের পরে এত বড় গীতিকবিতার প্রতিভা বিরল। সমালোচকের ভাষায় 'Her (Kamini Roy) place among Bengali lyric poets is perhaps next to Rabindranath'.[৩]

শিল্পী হিসাবে রবীন্দ্রনাথের কলাকুশলতার সঙ্গে কামিনী রায়ের তুলনা যথাযথ হবে না। বরং নারী কবি রূপে তিনি নারীজীবনের রহস্যকে কতখানি ধরে দিয়েছেন তাই বিচার্য বিষয় হলে তাঁকে বুঝতে সহজ হবে। 'কথা কব সহজ ভাষাতে' এই ছিল তাঁর

লক্ষ্য। তাঁর বর্ণিত বিষয়, ভাষা ও ছন্দের মধ্যে গরমিল নেই। তিনি সংস্কৃতের কৃতি ছাত্রী, দেশী-বিদেশী কাব্য সাহিত্যের আগ্রহী পাঠিকা ছিলেন। বৌদ্ধিক চর্চার মত বিদ্যা, রুচি ও সামর্থ্য তাঁর ছিল। ব্রজেন্দ্রনাথ শীল কামিনী রায়ের কবি খ্যাতির কারণ নির্দেশ করেছেন—"...the subtle intellectual analysis and womanly delicacy and refinement of culture, that constitute the soul of Miss Sen's Poetry.[৪]

পয়ার, ত্রিপদী প্রভৃতি প্রচলিত ছন্দবন্ধের প্রতি তাঁর স্বাভাবিক আনুগত্য ছিল। মহিলা কবিরা সবাই পয়ারের ধারাস্রোতে গা ভাসিয়েছেন। পয়ার তো গদ্যেরই ছান্দিক রূপ। নারীদের কাব্যভাষা প্রচলিত গৃহস্থ্যজনের শালীন মৌখিক ভাষার কাছাকাছি। তদ্ভব ও দেশজ শব্দ ব্যবহারে তাদের দক্ষতা অবশ্যই স্বীকার করতে হয়।

'দাসী' পত্রিকায় চিত্তরঞ্জন দাসের 'মালঞ্চ' কাব্য গ্রন্থের সমালোচনায় বলা হল— "গ্রন্থখানি অনেকটা 'আলো ও ছায়া'-র ছাঁচে ঢালা, তথাপি তাহাতে যেন 'আলো ও ছায়া'-র সজীবতা ও ভাবের জীবন্ত উচ্ছ্বাস নাই।"[৫] কামিনী রায়ের ছাঁচে কাব্য রচনার উৎসাহ সে যুগে দেখা দিয়েছিল।

সরোজকুমারী দেবী

১৮৯৪ সালে রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' এবং সরোজকুমারী দেবীর 'হাসি ও অশ্রু' কাব্যগ্রন্থদ্বয় প্রকাশিত হয়। ১৮৮৯ কামিনী রায়ের 'আলো ও ছায়া' গ্রন্থের সমালোচনায় বলা হল, 'রবীন্দ্রনাথ বর্তমান যুগের প্রবর্তয়িতা'।[৬] রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী রোমাণ্টিক গীতিকবিদের, রবীন্দ্রনাথের ভাব সাম্রাজ্যের কাছে বশ্যতা স্বীকার করেই বসতি স্থাপন করতে হয়েছে। অধুনাকালের সমালোচক 'সোনার তরী' এবং 'হাসি ও অশ্রু' কাব্যগ্রন্থ দুটির মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন।[৭] 'মানসী' ও 'সোনার তরী' কাব্যের সবচেয়ে, বড় কথা মানবজগৎ ও নিসর্গজগৎ দুই মিলে কবির মধ্যে বিশ্ব-চেতনার জাগরণ ঘটিয়েছে। এ উপলব্ধি সরোজকুমারীর জীবন ব্যাপী সাধনায় প্রকাশ পায় নি। সরোজকুমারীর স্বামীসঙ্গসুখের মধ্যেও বহিঃপ্রকৃতির শ্রাবণধারা কবিকে আপন হারা করেছে। একলা বিজনে ঝরে ঝরে পড়ছে কবির অসংখ্য আশা। 'অবশ আঁখি' কাতর হয় নয়ন জলে।

সুদূর দূরে মধুর সুরে
কে ঐ গেল গো গাহিয়া ?

তাহার তানে আমার প্রাণে
জড়ায়ে গেল সহসা।

* * *

এমন ধারা পাগল পারা
বল কে করে আমারে ?

সুদূরের আহ্বান কবি বারবার শুনেছেন এবং স্বাধীন মুক্ত প্রাণের আকুতি জানিয়েছেন। সমাজ ও পরিবারের আদর্শ লঙ্ঘন করা সম্ভব হয়নি। কবি-ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সমাজ-আদর্শের বিরোধ দেখা দিয়েছে।

চারিদিকে ঘেরা এবে যেন কারাগার.
বন্দী করে রেখেছে আমায়। (কারাগার, পৃ-২৫)।
সংসার ফিরিছে পিছে শিকল লইয়া, (জীবন প্রভাত, ৪১)।
যত আমি ছুটে যাই পিছু পিছু ধায়
জেগে যেন দিতেছে পাহারা,
পারে না পরাণ আর বহিতে গো হায়।
তারি মাঝে হয়ে আত্মহারা। (ঐ, পৃ-৪১-৪২)
সংসার মন্থন করি উঠিতেছে বিষ। (আশীর্বাদ, পৃ-৬২)

'দূর হতে' 'প্রবাসে' 'অতৃপ্তি' 'বনলতা' প্রভৃতি কবিতায় একই ভাব ব্যক্ত হয়েছে। 'স্বার্থভরা এ নিখিলে' কবি মুক্তি চেয়েছেন।

একবার যদি কভু খোলা পাই হায়
চলে যাব হেরিতে জগৎ। (কারাগার, পৃ-২৮)

কবি অজানা, অদেখা, অচেনা, বৃহৎ জগতের আকর্ষণ অনুভব করেছেন। বিবাহ পরবর্তী জীবনে নিষ্ঠার সঙ্গে দেশী-বিদেশী সাহিত্যের পাঠ নিয়েছেন। "……রোমান্টিক কাব্যের সাথে তাঁর পরিচয় ছিল নিবিড়। উপরন্তু রবীন্দ্রকাব্যের ফুটন্ত মদিরা তিনি আকণ্ঠ পান করেছিলেন।"[৮] কবিব্যক্তিত্ব সমাজ-সংসারের নানা বিধিবিধান, স্নেহ-প্রেমের ডোরে বাঁধা। সরোজকুমারীর কাব্যে পূর্ববর্তী মহিলা কবিদের থেকে ভাবনা, মানসিকতা ও অভিরুচিগত পার্থক্য দেখা গেল। নারীব্যক্তিত্বের পূর্ণ জাগরণ ঘটলো। সতী, সাবিত্রী, রুদ্রপীড়, অম্বা প্রভৃতি পৌরাণিক জীবনাদর্শ আর প্রয়োজন হচ্ছে না। তবে এই ব্যক্তিত্বের জাগরণ সমাজ-সংসারের উর্ধ্বে নয়। বরং সমাজ-সংসারে আবদ্ধ নারীর মুক্তির বাসনা এবং ব্যর্থতার বেদনাই বড় কথা। রোমান্টিকতা বিষয়ের উপর নির্ভরশীল নয়, একটি স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গী। "The personality of the writer has

a characterestic place in it…".[৯] প্রেম, প্রকৃতি, ঈশ্বর সবই ব্যক্তি ভাবনার আলোকে রঞ্জিত হল। এই রঞ্জনের ভাষাও ব্যক্তিগত। সরোজকুমারীর কবিতায় কাহিনীর লেশ মাত্র নেই। কবি জীবনের নানা ভাবনার ফসল এরা। তবুও এরা স্বতন্ত্র নয়। ব্যক্তিত্বের সূত্রে মালিকা রূপে গ্রথিত। সরোজকুমারীর এমন কোন কবিতা নেই যেখানে দু ফোঁটা অশ্রু না বর্ষিত হয়েছে। দয়িতের জন্য করুণ গীত অথবা ক্রন্দন তাঁর একাধিক কবিতায় শুনতে পাওয়া যায়।

'কে কাঁদে আমারে চাহি আজি এ সন্ধ্যায়' (কার প্রেম)
'উথলি শ্রাবণ বারি না জানি চাহিছে কারে' (ছায়া)
'কে ওই গেল গো গাহিয়া' (গীতধ্বনি)
'কারে মনে পড়ে আর চোখে জল আসে' (বর্ষা)
'একবার চেয়ে যাও মোর মুখ পানে' (চেয়ে যাও)
'সেও যদি চলে যায় এই পথ দিয়ে' (ভুল)

'কে' বা 'সে' কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি নয়। এখানে কবির দয়িত যেমন অনির্দিষ্ট বিরহ ভাবনাও অনির্দেশ্য। গভীর মিলনের দৃশ্য অঙ্কনে কবি সমান পারদর্শিনী। 'ভালবাসা' কবিতায়—

কাছাকাছি থেকে তবু অচেনা দু'জনে,
বুঝি নাই কেহ কারো হৃদয়ের ভাষা,
একদিন ঘুমঘোরে নয়নে নয়নে,
মুহূর্তের পরিচয়, মিলন সহসা। (পৃ-৯১)

ও রাঙা অধর দুটি, লাজ বাঁধ গেছে টুটি,
কি মোহেতে মুগ্ধ নয়ন,
আপনাতে গেছি ভুলে, চাও গো মুখানি তুলে,
ধর সখি দুইটি চুম্বন। (দুটি চুম্বন, পৃ-১৩৯)

সুধীরে বহিতেছিল বসন্ত সমীর,
চুমি চুমি কুসুমের লাজ মাখা মুখে,
কি জানি কিসের সুখে তটিনী অধীর,
মধুর চাঁদের আলো উছলে সে বুকে। (সমর্পণ, পৃ-১৯)

'কে যেন গেল গো হায়
দিয়ে গেল একটি চুম্বন। (সন্ধ্যার তারা, পৃ-৩-৪)

বকুল, আমার হৃদয়, বাসনা, কে ? আমার জীবন, তবে কেন, কার প্রেম, পরিচয়, গীতধ্বনি, কথা, চলে গেল প্রভৃতি কবিতায় মিলনের চিত্র আছে। কিন্তু এ মিলনের পরিণতি 'কি ঘোর অভাব রয়ে গেল প্রাণে' (নীরবে)। ভোগে, সম্ভোগে, কামনায়, আকাঙ্ক্ষায় এ ঘোর কাটেনি। তাই কবির মুড্‌টি সর্বদাই ভাবালুতায় আলস্যে, নির্জনতার নিঃসঙ্গ বেদনায়, শূন্যতার অশ্রুভারে, অজানা চাওয়া পাওয়ায় 'কুল হারা দিক হারা'। কবির বেদনা যেমন সমাজ বা পরিবার জীবনের শাশ্বত ললনাব বেদনা নয়, এ অশ্রুও তেমন প্রচলিত বেদনার জানাশোনা ব্যথার অভিব্যক্তি নয়। 'Too much Shelly—criticism has been biography in disguise'.[১০]

এ মন্তব্য রোমান্টিক গীতিকবিদের সকলের ক্ষেত্রেই সত্য।

প্রকাশের শোভনতায়, প্রেম এবং কবি অস্তিত্বেব অভিন্নতায়, আত্মনিবেদনের প্রতীক্ষায় এবং সমগ্র কবিতায় নারীজনোচিত কোমলতায় চিনিয়ে দিতে ভুল করে না, এগুলি নাবীর রচনা। সবোজকুমারীর কবিতায় নারীর কণ্ঠে নারী হৃদয় রহস্যের গোপন দ্বারগুলো বহুলাংশে উন্মুক্ত হয়ে গেল।

'বাসর' কবিতায় প্রথম পরশেব চিত্র—

কি সে মোহময় শীতল পরশ,
কখন দুইটি করে ধরে ছিল কর,
নবীন হরষে মাখা কেমন হরষ,
কাঁপিয়া উঠিয়াছিল এ হৃদয় তার। (পৃ-১০৩)

প্রথম মিলনেব চিত্র—

সরমে পড়িছে নুয়ে দুইটি নয়ন,
শিহরি উঠিছে হৃদি সে কর-পরশে।
কুসুম-সুবাসে ভবা বিচিত্র শয্যায়
কম্পিত হৃদয় আজ লাজে মরে যায়। (ফুলশয্যা, পৃ-১০৫)

নীরবে, শুভদৃষ্টি, এই থাক, জ্যোৎস্না, আলিঙ্গন প্রভৃতি কবিতায় ভাব যেখানে প্রকৃতিকে আশ্রয় করে নি সেখানে কবি, হৃদয়ের রহস্য প্রকাশ করতে পারেন নি, করলেও তা সার্থক হয় নি। নারীজনোচিত লাজ, কুণ্ঠা, সঙ্কোচ প্রভৃতি আছে, নেই নারীর হৃদয়রহস্যের সংবাদটি। যেখানে প্রকৃতি সহোদরা, সেখানে কবির ভাবপ্রকাশ অনবদ্য হয়েছে।

বরষার অশ্রুজলে যুঁইটি একেলা ভিজে,
জ্যোৎস্না জড়ায় তারে হেসে। (জ্যোৎস্না, পৃ-১০)

ফুলের মেয়ে অবাক হয়ে,
চায় গো মুখ তুলে।
নয়ন জল সে টলমল
শিশির হয়ে দুলে। (চলে গেল, পৃ-৪৪-৪৫)

বিজন গভীর রাতে রোগীর হাসির মত,
একটি চাঁদের কর খেলা করে অবিরত।
কেবল একটি গাছে দুইটি বকুল,
দুজনার প্রেমে দোঁহে রয়েছে বিভুল। (বকুল, পৃ-৬)

রবীন্দ্রনাথের মানসী কাব্যগ্রন্থের শব্দভাণ্ডার দ্বারা সরোজকুমারী বিশেষভাবে প্রভাবিত। আকুল, ব্যাকুল, বিজন, অবশ, মগন, আঁখি, উদাস, আকুল, আকুল হিয়া, আকুল মরম, সন্ধ্যার বিজনে, একেলা বিজনে, বিজন গভীরে, অবশ আঁখি, অবশ প্রাণ, অলস হৃদয়, অলস ব্যথা, নীরবে কাতরে, আপনা মগন, অন্ধকার পরাণ, পরাণ আঁধার, বাসনা হৃদয়, মলিন নয়ন, তৃষিত নয়ন, নয়ন জল, বাসনা গরল, দারুণ তৃষা ইত্যাদি। এ জাতীয় শব্দ কবিরা অন্তর্লোকবিহারের অভিজ্ঞতা বর্ণনায় ব্যবহার করে থাকেন। কাব্যের ভাষা তো অলংকার। গীতিকবিতা শব্দের ধ্বনির চেয়ে অর্থকেই প্রাধান্য দেয়। আত্মনিষ্ঠ অনুভূতি প্রকাশের জন্য ধ্বনির চেয়ে অর্থের ব্যঞ্জনার উপর নির্ভর করতে হয় বেশি। সরোজকুমারীর কাব্যে প্রভুত্ব করেছে অর্থালঙ্কার।

নতুন কোন প্রসঙ্গের তিনি অবতারণা করেন নি, তিনি কামিনী রায় বা স্বর্ণকুমারী দেবীর ছায়া অনুসরণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের মানসীর নারীর উক্তি, বধূ, ব্যক্ত প্রেম, গুপ্তপ্রেম প্রভৃতি কবিতার বক্তব্য, ভাষা ও ছন্দ সুষমার বিশিষ্ট সীমারেখাকে সম্মান করেই লেখনী পরিচালনা করেছেন।

মানকুমারী বসু

মানকুমারী মধুসূদনের ভ্রাতুষ্পুত্রী। দশ বৎসর বয়সে তার বিবাহ হয়। সতের বৎসর বয়সে কন্যা লাভ এবং সাড়ে আঠারো বৎসরে বিধবা হন। বিধবা রমণীর জীবন-সমস্যা আদৌ তাঁকে বিচলিত করেছিল কিনা তার ইতিহাস কবি যেমন নিজের জীবনীতে উল্লেখ করেননি তেমনি কাব্যেও তার বিশেষ কোন ছাপ নেই। স্বামীর মৃত্যুর পর তার জীবনপ্রবাহ সম্বন্ধে কবির উক্তি—"গুরুজনের সেবা, শিশুপালন অথবা সংসারের কাজকর্ম করিয়া আমার হৃদয়ের তৃপ্তি হইল না। বাকী জীবনটা কি

করিয়া কাটাইব, তাহাই আমার চিন্তার বিষয় হইল। ভগবান এ অধম সন্তানকে যে বিদ্যানুরাগ ও একটু কবিত্ব শক্তি দিয়াছিলেন, তাহাই অনুশীলন কবিতে প্রবৃত্ত হইলাম।[১১] ইতিপূর্বেই স্বামীর প্রচেষ্টায় 'সংবাদ প্রভাকরে' কবির বীররসাত্মক অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত 'পুরন্দরের প্রতি ইন্দুবালা' কবিতাটি প্রকাশিত হয়। সম্পাদক পাদটীকায় লিখেছিলেন, "ইঁহার গলায় আমরা প্রশংসার শতনরী হাব পরাইলাম। চর্চা থাকিলে ইঁহার মধুময়ী লেখনী কালে অমৃত প্রসব কবিবে।" তখন কবির বয়স চোদ্দ। তিনি তাঁর কাব্য-স্বভাব সম্বন্ধে বলেছেন—"আমার মন উত্তেজিত হইলে আমার একটি কবিতা হইত।"[১২] স্বামীর মৃত্যুতে তাঁর চিত্তের প্রবল উত্তেজনার প্রথম উচ্ছ্বাস 'প্রিয় প্রসঙ্গ বা হারানো প্রণয়' (১৮৮৪)। রচনা হিসাবে হয়তো এর মূল্য খুবই কম কিন্তু কবির মানসিক কয়েকটি অবস্থা সত্যই মনোরম। কয়েকটি উদাহরণ—

(ক) "যখন তাঁহার নিকট যাইতাম, চুড়ী আঁটিয়া মল খুলিয়া চাবি ধবিযা যাইতাম—পাছে কেও জানিতে পারে এই ভয়ে কত সাবধান হইতাম। তবু যে মা এ কি পোড়া মন, ঐ যে চুড়ী বাজিল, ঐ যে চাবি নড়িল, ঐ পায়েব শব্দ হইল, ঐ দরজা খট্ খট্ করিয়া উঠিল এই মনে করিতাম।"—দুর্গোৎসব, পৃ-৮

(খ) "যখন আমার স্বভাবের বিষয় সম্পূর্ণ বর্ণনা করিয়া কহিতেন, তখন যে কত সুখে সুখী হইতাম, লজ্জা মাখা কেমন কেমন সুখ, এমন নাই এমন নাই সেই যে কেমন সুখ, সেই সুখের জন্য কাঁদি মা।"—দুর্গোৎসব, পৃ-৮

(গ) "দেশ কাল পাত্র সকল তাতেই ভেদ আছে। কান্নারও আবার ইতর বিশেষ আছে।"—তুমি কোথায় ? পৃ-২৮

(ঘ) এই যে আমি মুখ দেখিতেছি। এই মুখ, এই হতভাগ্য মুখ একদিন সৌভাগ্য পূর্ণ ছিল। এই মুখের কত আদর ছিল, মুখের কত মূল্য ছিল। এই মুখ না দেখিলে একজন বড় কষ্ট পাইতেন, সেই মুখ দেখিলেই আহ্লাদে পূর্ণ হইতেন।"

—মুকুরে মুখ, পৃ-৬৩

পিঞ্জরের বিহগী, অরণ্য রোদন প্রভৃতি থেকেও উদ্ধৃত করা যেত। উদ্ধৃতিগুলি সন্তবিধবার মনের কতকগুলি সংবাদ বহন করছে মাত্র। এই সংবাদগুলি অকৃত্রিম। মানকুমারী বিশ্বাস করতেন, 'সতী কি কখনো বিধবা হয়?' তাই যৌবনে বিধবা হলেও পঞ্চইন্দ্রিয় ও ষড়রিপুর দংশন জ্বালা তাঁর কাব্যে নেই। সরল সহজ গার্হস্থ্য জীবনের সুখদুঃখ, ছোট ছোট কথা, ছোট ছোট উপেক্ষিত বেদনা কবি বড়ই সহানুভূতির সাথে চিত্রিত করেছেন। বাঙালী যৌথ হিন্দু পরিবারের বিবাহিতা নারী জীবনের

প্রত্যক্ষ সুখদুঃখ অনুভবই তাঁর কবিতার বিষয়। যথার্থ প্রেমমূলক কবিতা তিনি লেখেন নি। তাঁর কবিতায় প্রেমের প্রতপ্ত আবেগ, যৌবনের অতৃপ্তির জ্বালা নেই। প্রেমের আদর্শগত রূপই এঁকেছেন। উদ্‌ভ্রান্ত, মৃত্যুসুহৃদ, মিলনচিত্র প্রভৃতি কবিতায় তত্ত্বের কথা যতখানি প্রাধান্য পেয়েছে ব্যক্তির আত্মকথন ততখানিই উপেক্ষিত।

সে যেন যোগিনী মত
ধেয়ানে রয়েছে রত,
নিষ্কাম, নিষ্ক্রিয় এই মহাসাধনায়
নলিনীর ভালবাসা শুনে হাসি পায়।—উদ্‌ভ্রান্ত, কনকাঞ্জলি।

সে যে কি পরম লাভ,
অচিন্ত্য, অব্যক্ত ভাব
ফোটে না ভাষার মুখে
কলিকাটি তার,
মরমে অমৃত যোগ
আত্মারাম উপভোগ
অনবস্থ, অতীন্দ্রিয়
সর্ব-অর্থ সার।' (মিলন চিত্র, বিভূতি, পৃ-৯)

'বিভূতি কাব্য' ১৯২৪ সালে প্রকাশিত হয়। বৈধব্যজীবনকে নিয়ে রচিত কবিতাগুলিতে সহজ সরল বাল্‌বিধবার ব্যক্তিগত জীবনের কথা অপেক্ষা পরপারে দয়িতের সঙ্গে মিলনের বাসনা বড় হয়ে উঠেছে। এ কাব্য নারীর সংসারাশ্রমের অপূর্ণতার কথায় ভরা। 'জিজ্ঞাসা', 'এই কি জীবন'? 'নিশাশেষে', 'চাহিত না আর', 'রাজ-রানী', 'বউ-কথা-কও', 'পাথী', 'আশ্বস্ত' প্রভৃতি কবিতায় কবি মরণের পারের 'সোনার জীবন'-এর প্রতীক্ষার কথা বলেছেন। 'সুয়ারানী' কবিতাটি কবির আত্মকথন।

কে আমি—অজানা নারী, অচেনা হৃদয়,
জানি নাক ভালবাসা,
ছিল না কামনা আশা
শিখিনি প্রেমের লীলা—প্রাণ বিনিময়,
আমারে আপনি খুঁজি
দেবীর আদরে পূজি
কেন নিলে মন্ত্র পড়ি নির্মম হৃদয়।

বালিকা হৃদয়ে প্রেমের উন্মেষ হয়নি। বিবাহিত জীবন অপেক্ষা তার কাম্য—

আমি চাহি মার কোল
ভাই বোন তুচ্ছ গোল—
আমি চাহি ক্ষেমী, পুঁটী, ঘোষেদের বীনা।
চাহি সে দুপুর বেলা
লুকাইয়া তাস খেলা,
পান খাই, গান গাই—ঠিক হয় কিনা—
আমি চাহি সেই সব, বিয়ে তো চাহিনা। (দুয়ারানী, বিভূতি, পৃ-১২২)

বাল্য বিবাহের পরিণতি এই অসহনীয় বৈধব্যজীবন। এখন সম্বল—"কি যে ব্যথা, কি যে জ্বালা, নাহি তার ভাষা।"

মানকুমারীর কবিতায় গার্হস্থ্যরস আকর্ষণীয় ভাবে পরিবেশিত হয়েছে। গৃহের প্রাঙ্গনে কেবল আপন সন্তান ও আত্মীয়দের মুখই ভীড় করেনি—কাঙালী, ভিখারিণী, সমাজ-উপেক্ষিতারাও উপস্থিত।

বাঙালীর শান্ত নীড়ে নবজাতকের সাদর অভ্যর্থনা যে কত আনন্দের, আশার এবং উৎসাহের ব্যাপার—এ যে কতবড় আশাপূরণ তা আমরা বাঙালী মাত্রেই জানি।

চিরদিন অতৃপ্ত হিয়ায়
ধরা বুঝি ছিল তোর তরে,
সাধ আশা পথ চেয়ে ছিল
তোর লাগি অতৃপ্ত অন্তরে।

(অভ্যর্থনা, কাব্যকুসুমাঞ্জলি, পৃ-৮০)

পথ ভুলে যে এ সংসার আলো করতে আসে, সেই তো আবার অকালে মায়া কাটিয়ে চলে যায়। যে ছিল আনন্দের উৎস সেই তখন বেদনার কারণ। 'অতিথি' কবিতায় এই ভাবটি ব্যক্ত হয়েছে। কবি কন্যা 'প্রিয়বালা'-র নামে কবিতাটিতে কবির ব্যক্তিগত বোধের পরিচয় পাই।

মায়ের মন কারণে অকারণে শঙ্কা কাতর।

মনটা যেন শিউরে উঠে,
প্রাণটা যেন বেরোয় কেঁপে,
তাইতো তোরে এমন করে
বুকের পরে ধরি চেপে। (প্রিয়বালা, পৃ-৪৪)

সংসারের জ্বালা যন্ত্রণায় মা মৃত্যু কামনা করে। কিন্তু সন্তানের কথা ভেবে বলেন—

মরমে মরিয়া যাই মরণ শরণ চাই
অমনি আঁচল টেনে হাসে বোকা মেয়ে,
মরিতেও ভুলি প্রিয়। তোরি মুখ চেয়ে,
অনলে পুড়িব তবু মরে কায নেই,
ননীর পুতুলটুকু কারে দিয়ে যাই? (সাধের মেয়ে, পৃ-১৭৪)

কবির 'ভাঙা ঘরের রাঙা বুলবুল' সব কেড়ে নিয়ে যায়। তার দুরন্তপনার কাছে হার মেনেই মাতৃ হৃদয়ের আনন্দ।

নিল নিদ্রা নিল স্মৃতি
নিল সে কবিতা গীতি,
নিতি লয় লক্ষ চুমা, ছিঁড়ি লয় চুল,
দারুণ দুরন্তপনা
শুনে না করিলে মানা। (বুলবুল, বিভূতি, পৃ-৫৫)

সন্তানের কাছে মায়েরা পরাজিত হয়ে আনন্দ পায়। 'আমার ভ্রমর' ও 'আমার সাথী' কবিতা দুটিতে জননী কবির স্নেহাশীর্বাদ, বাঙলার সকল সন্তানের শিরে বর্ষিত হয়েছে। 'দুর্গাপূজা' কবিতায় পরবাসী পুত্রের জন্য জননীর আশঙ্কা ও ব্যাকুলতার চিত্রটি একান্তই বাস্তব। 'সোনার সাথী' কাব্যগ্রন্থটি শিশুদের ভাষায় লিখেছেন শিশুদের মনের কথা। মা ব্যতীত এ ভাষা আর কেউ বোঝে না। শিশুর সব মান অভিমান মাকে নিয়ে। সংসারের নানাপ্রসঙ্গ এমন কি গৃহপালিত জীবজন্তুও তাঁর কাব্যে স্থান পেয়েছে। (রাগ, বিড়ালের ঝগড়া প্রভৃতি)।

কবি মানকুমারীর মধ্যে ছিল সর্বব্যাপী সহানুভূতি। বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত পরিবারের বাস্তব রূপটিই এখানে স্পষ্ট হয়েছে, অবশ্য সংস্কার আন্দোলনের সমর্থনসূচক কবিতাও তিনি লিখেছেন, যেমন—দুঃস্থ, আতুর, দরিদ্র, নির্যাতিত কুলীনকন্যা, বালবিধবা, দুঃখিনী মায়ের ছেলে ও পতিতাদের সম্বন্ধে লেখনী ধারণ করেছেন। মহিলা কবিদের সচরাচর ব্যবহৃত বিষয় মূলতঃ তাঁরও কাব্য বিষয়। অভাগিনী, প্রতিশোধ কবিতা দুটি বালবিধবাদের কথা বলেছেন। বালিকার বৈধব্য বেশ দেখে কবি লেখেন—

কারে গো সাজাস ভাই। মুক্ত সন্ন্যাসিনী?
না বাঁধিতে হাতে হাত,
আগে হবিষ্যান্ন ভাত,
না হতে সম্রাজ্ঞী আগে পথ ভিখারিণী,

কে তোরা হৃদয় হারা,
কি বলিলি ধ্রুবতারা,
পাখীরে পড়ালি কেন হয়ে কৃষ্ণবাণী ? (পৃ-১৮৫)

পিতামাতা পুণ্যের লোভে আট বছরের বালিকাকে গৌরীদান করেছিলেন। চামেলীর বালিকা সুলভ আচরণের বর্ণনাটি বাস্তব। কবি বিদ্যাসাগর প্রদর্শিত পথে চামেলীর বিধবাবিবাহ দেন। তর্কচূড়ামণিরা তাদের জাতিচ্যুত করলো। গ্রামে তারা একঘরে। কিন্তু পিতামাতা কন্যার সুখে সুখী। মানকুমারী বাল্‌বিধবার বিবাহের পক্ষেই মত পোষণ করতেন। কামিনী রায়, লজ্জাবতী, হিরন্ময়ী, সরোজকুমারীদের দৃষ্টিতে সামাজিক এসব ব্যাধি ধরা দেয়নি। 'ঘটকালি' কবিতাটি কুলীনকন্যাদের নিয়ে লেখা। পতিতোদ্ধার আন্দোলন নিয়ে লেখা 'পতিতোদ্ধার' কবিতাটি। কবির ভাব ও ভাষা অত্যন্ত স্পষ্ট। কোনরূপ ভাবাবেগ বা ভাষার অস্বচ্ছতা নেই।

যে ডোবে সে ডুবে যায়, আমাদের ঘরে
কথনো সে পায়না আশ্রয়,
আমাদেরি ঘর বাড়ী আমাদেরি তরে,
যে পড়ে তাহার ঠাঁই নাই। (পতিতোদ্ধার, পৃ-১৭৯)

সমাজের অধিকাংশ মানুষ "সুখের সাধক" "আত্মসুখ দাস"। সতীত্ব নারীর অমূল্য সম্পদ। নারীত্ব তার চেয়েও মূল্যবান। সমাজের বিধিবিধান জীবনের স্বাভাবিক বিকাশের পথে বাধা সৃষ্টির জন্য নয়—জীবনের স্বাভাবিক বিকাশের জন্য।

চন্দ্রনাথ বসু মানকুমারীর কাব্য পাঠে অনেক দিনের পর একটি খাঁটি মনের (মনটি নারীর) সন্ধান পেয়েছেন। রাজনারায়ণ বসু তাঁর কবিতা মুখস্ত করতেন। নবীনচন্দ্র মানকুমারীর কবিতায় 'সরল রমণীহৃদয়ের কবিতামৃত প্রবাহিত' হতে দেখেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, "বাঙ্গালাটুকু খাঁটি বাঙ্গালা। উক্তিও আন্তরিক।"[১৩] আলোচ্য পর্বে অন্যান্য মহিলা কবিদের সঙ্গে মানকুমারীর মূল পার্থক্য তাঁর ভাষায়। মানকুমারীর তায় ব্যবহৃত প্রবচনমূলক বাক্য এবং বাগ্‌ধারার ব্যবহার।—

কপাল পোড়া,	মায়ের পেটে জন্ম.	সোনার চাঁদ,
কার হায় পৌষ মাস	মাথা খাও,	ভাঙ্গে বুক
কার হায় সর্বনাশ,	চক্ষুঃশূল	ষোল আনা,
রূপ আলো করা,	বুক চেরা ধন,	ছাই ভষ্ম.
ছোট খাট হৃদয়ে,	মাথার কিরে (শপথ)	আঁচল ধরা,
কার খাও কার পর	কপালের ভোগ	সতীনের ঘর,

মরার উপরে পরে সহস্র খাঁড়া,	আঁচলের ধন,	কাঁঙালের ধন,
একাল সে কাল নয়,	মার মাথা খাও,	কলিজা পরাণ,
বুকে বিষ পসরা,	পায়ে ঠেলা,	বুক পেতে,
শত পাকে বেঁধেছ,	আসলে কুড়ে,	কোণের বৌ,
বাজ পড়ে পুড়ে গেছে,	সোনার দেহ,	কপালে ছাই,
সেই ফুলবন,	কচি মেয়ে বুড়ো বর,	বিবিয়ানা,
দারুণ আগুন জ্বলে,	পোড়া বুক ফেটে যায়,	সৃষ্টিছাড়া,
জলধি শুকায়ে যায়		
কপালে বিগুন	অন্ধের হাতের নড়ি,	ফেলি জলে,
আমার মাথার কিরে,	মরমে মরিয়া যাই,	গলগ্রহ,
কোল তার হয়ে গেছে	মার কোল খালি,	ভাঙবুক,
খালি,	সোহাগের ধন,	কাড়াকাড়ি,
বুকে জ্বলে চিতার অনল,	ভূতের বোঝা,	খেতে মাথা,
আপন ভোলা,	জন্মের শোধ,	হাড় ভাঙ্গা,
		লক্ষ্মী ছাড়া,

প্রচলন ও বাগ্‌ধারা জাতীয় সম্পদ। এগুলির মধ্য দিয়ে জাতীয় অভিজ্ঞতারই অভিব্যক্তি। প্রধানতঃ নারীরাই এই প্রবচন ও বাগধারার স্রষ্টা ও ধারক। যাদুধন, ঢের, ছেঁড়া, খুদ, খেপায়, বাছা, বলাই জাগজাগ, বিছায় (বৃশ্চিক) চোকে (চোখে), অভাগী ছাই, নিরেট, কচিমুখ, পোড়ামুখ, রাঙামুখ, চাঁদপণা, প্রাণচিরে, বুকফেটে, রুখুরুখু, আধমরা, আগুন ঢালা, দারুণ, গালাগালি, ভোঁতা, এটুকুনি, এটাসেটা, ঢঙ, রোক্ (রোগ), মরচে, খেলেছুটে, বুড়ীমাগী, বছরাদি, সোক (শোক), সেয়ানা মেয়ে, তেড়ি, আঁচরান।

মানকুমারী কথা বলার ভঙ্গীটিও কবিতার মধ্যে ধরার চেষ্টা করেছেন।

চাঁদের সোনার মুখে দুধ মাখামাখি,	"কে রে তুই এলোচুল
ছেড়ে দে আমারে আমি অধম বালাই,	কচি মেয়ে বেলফুল।"
জ্বালায়ে জ্বলন্ত চিতা বুকের উপর,	"হায়রে কপাল পোড়া,
মুখে হাসি বুকে প্রেম সুখে ভরা ঘর,	কি আগুন বুক যোড়া"
ঘর বর দেখে শুনে লও	"মুখোমুখি পোড়া মুখি
ওর গন্ধে মরে ভূত। পালায় যমের দূত,	চোখে চোখে চায়"

কপালে যোটেনি বিয়ে
ঝুলে ভরা ফুল,
উহুহুরে বাপধন। ভেঙ্গেচুরে গেল মন।
তুই আঁচলের হীরা, মাথাখোড়া বুক চেরা।
মায়ে তোর বড় টান। মায়ে মাথা তোরি প্রাণ,
পোড়া ছাই পাঁশ,

বুকে লাগে ডর
রাক্ষুসে মেয়ে,
জন্ম এয়োতি হোক্,
দাঁড়া ভাই শুকতারা
তাই বলি বিষ খাও
ষোল কলা। ইত্যাদি।

নিম্নলিখিত শব্দদ্বিত্ব নারীপুরুষ নির্বিশেষে ব্যবহৃত হলেও বিশেষ করে নারীদের কণ্ঠেই বেশি শোনা যায়।

ডগমগ, কুটিকুটি, পলে পলে, আঁধার আঁধার, ভুলে ভুলে, সুখ সুখ, থাক্ থাক্ থাক্, দর দর, হাড়ে হাড়ে, আঁচলে আঁচলে, টুপটুপ, ঝম্‌ঝম্ আয় আয়, বুকে বুকে, থোপা থোপা, কলকল, তরতর, ধকধক, হায় হায়, মুখোমুখি, যায় যায়, মরমে মরমে, স্বন স্বন, ফোঁটা ফোঁটা, ছোঁয়াছুঁয়ি, পাতে পাতে, কচিকচি, আধ আধ, দেখাদেখি প্রভৃতি।

বহু কবিতায় মনের অসহনীয় জ্বালা, যন্ত্রণা ও বিরক্তি প্রকাশে যন্ত্রণা সূচক অব্যয়ের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

ছিছি, হায়, লহু, হুহু, আহা, ওরে, ওযে, মা, ছাই, উঃ, হায় হায় প্রভৃতি। ভাষা ও আঙ্গিক অবিচ্ছেদ্য। ভাষাই তো লেখক ও পাঠকের মধ্যে একমাত্র যোগসূত্র। গৃহাঙ্গনের চারপাশে যে সব প্রবাদ প্রবচন, শব্দ সচরাচব ব্যবহৃত হয় কবি তাদের কাব্য ভাষার মর্যাদা দিয়ে কেবল দ্যোতনাই বৃদ্ধি করেন নি, কবিতার ভাষাকেও সমৃদ্ধ করেছেন। মহিলা কবিরা বুঝেছিলেন তাঁদের জীবন ও কাব্যের প্রকৃত স্থান ও বিষয় সমাজ-সংসার। নিরাভরণ, শান্ত ও সংযত ভাষায় তারা সাহিত্য রচনা করেছেন। মানকুমারীর কাব্যের বিষয় যেমন গৃহাঙ্গন-উদ্ভূত, কবিতার ডিক্‌সনও তাই। তিনি তার রূপান্তর ঘটাতে পারেন নি। এক কথায় মানকুমারী কাব্য বিষয়ের মধ্যে গৃহজীবন অতিশয় প্রত্যক্ষ। নানা বিশিষ্টতায় ভাষাও খুবই প্রত্যক্ষ।

লজ্জাবতী বসু ও প্রমীলা নাগ

'মানসী' (১৮৯১) কাব্য গ্রন্থ প্রকাশের পূর্বেই গীতি কবিতায় রোমান্টিক প্রেম-ভাবণার স্ফুরণ ঘটে গেছে। এই প্রেম ব্যক্তির চোদ্দপোয়া দেহ অতিক্রম করে নৈর্ব্যক্তিক স্তরে উন্নীত হয়েছে।

"পূর্বেকার কবিদিগের প্রেম ব্যক্তিগত ছিল। হাত-পা-নাক-মুখ-চোখ অবল হঃ না

করিয়া যে ভালবাসা থাকিতে পারে, ইহা তাহাদের কল্পনার অতীত ছিল। ···এখনকার কবিরা বলিতেছেন প্রেমে তৃপ্তি নাই, সে অতৃপ্ত নিরাশার অতৃপ্তি নহে, অভাবের অতৃপ্তি, তাঁহারা কাহাকে ভালবাসিবেন খুঁজিয়া পান না। অথচ হৃদয়ে ভালবাসার অভাব নাই। ····এমনতর প্রেম পূর্বেকার কবিদের ছিল না, এমনতর প্রেম সাধারণ লোকে বুঝে না।"[১৪] কামিনী রায়, সরোজকুমারী, লজ্জাবতী ও প্রমীলা নাগের কবিতায় জগৎ জীবনের ঘটনা ব্যতীত বড় হয়ে উঠেছে কবিদের বিলাপ এবং আত্মকথন। কামিনী রায়, মানকুমারীর হাতে গীতিকবিতায় সমাজ, পরিবার, জীবন ও নারীর নানা সমস্যা ও দেশ কালের কথা বড় হয়ে উঠেছে। বস্তুর ভারে ভাবের ডানা সম্পূর্ণ প্রসারিত হতে পারেনি। লজ্জাবতী, সরোজকুমারী, প্রমীলা নাগ ও হিরন্ময়ীর প্রত্যক্ষ বস্তুর জগতে তাদের প্রতিষ্ঠা কিন্তু কাব্যে অপ্রত্যক্ষ জগতের কথাই বড় হয়ে উঠেছে। "বস্তুর জগতে আমাদের কার্যক্ষেত্র, ও সেই ভাবের জগৎ আমাদের হৃদয়ের বিহার ভূমি। যে ভাষায় আমরা কথা কই, সে ভাষা আমরা কবিতায় ব্যবহার করি না।" ভাবের জগৎ, কবির কল্পনার জগৎ। কামিনী রায় ও মানকুমারী বসুর প্রকৃতি, প্রেম ও ঈশ্বর ভাবনা সমাজ গত। কামিনী রায়ের কবিতায় ব্যক্তিগত ভাবের দোলা লাগলেও কবির আদর্শপ্রীতি প্রাধান্য পেয়েছে। ব্যক্তির গণ্ডী অতিক্রম করে বৃহৎ সমাজ সিন্ধুতে মেশবার আকুতিই প্রধান। কবিতার শেষে নীতিকথা ও তত্ত্বকথার সংযোজন করেছেন। যা কাব্যদেহে কেবল অবান্তরই নয় একান্তই পীড়াদায়ক। বিশেষ করে গীতিকবিতার ক্ষেত্রে। গীতিকবিতা আধুনিকা। সে বসনে, অলংকরণে মধ্যযুগীয় রুচিবিকারকে প্রশ্রয় দেবে না। সে সাজবে সমাজবিধির নিয়মে নয়। আপন ইচ্ছা ও মনের চাহিদায়,—ব্যক্তিত্ব ব্যঞ্জিত রূপে।

আমাদের দেশে মহিলা লেখিকাদের সমালোচনায় কে কতটা আদর্শনারী, পতিপরায়ণা হলেন তারই প্রশংসা করা হয়। কে কতদূর যথার্থ কবি হয়েছেন সে খোঁজ করা হয় না। সরোজকুমারী ও প্রমীলা নাগের দাম্পত্যজীবনের আদর্শপ্রীতির কথাই বলা হল। সরোজকুমারী সম্বন্ধে যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মন্তব্য করলেন—"তাঁহার পতিদেবতার মধুর প্রেম মিলনে স্বপ্নময় ও সুখময় ছিল।"[১৫]

প্রমীলা নাগের কাব্য আলোচনায় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন— "আদর্শ হিন্দু নারীর ন্যায় স্বামীকে তিনি অন্তরের অন্তরতম স্থলে গ্রহণ করিয়াছেন।"[১৬] "প্রমীলার দাম্পত্য জীবন সুখময় ছিল, স্বামীর অনাবিল প্রণয়ে তাঁহার হৃদয় কানায় কানায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। গার্হস্থ্যজীবন এই বঙ্গ কুলবধূর কাব্যসাধনার পরিপন্থী না হইয়া বরং অনুকূলই হইয়াছিল।[১৭] রাজনারায়ণের কনিষ্ঠা কন্যা লজ্জাবতী

বসু "আজীবন কৌমার্যব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন।" এ সব তথ্য তাঁদের কবি সিদ্ধির পক্ষে কতটা প্রয়োজন তা আমাদের বোধগম্য হয় না।

লজ্জাবতীর কবিতায় কুমারীজীবনের বিস্ময়, জীবনে চাওয়া পাওয়ার 'অসম্পূর্ণ কাহিনী' আকুলতা এবং আবেগে আবিষ্ট একটি মনের পরিচয় পাওয়া যায়। তার কবিতায় প্রেম-বৈচিত্র্য নেই, নেই মানস-প্রতিক্রিয়াজনিত নানা আকর্ষণ-বিকর্ষণ। তৃষ্ণা, অতৃপ্তি, কামনা, বাসনা, প্রেমের পুলক, আকুলতা, অভাব, দোঁহাকার, নিশিযাত্রা, প্রেমবাণী, মরুময় জীবন, ক্ষণিক বসন্ত, ক্ষণিকের যৌবন, স্মৃতির বিষাদ সুর, মধুময় কাহিনী প্রভৃতি শব্দগুলি কবির আকাঙ্ক্ষা, কামনা-বাসনার সংবাদ যেমন বহন করে তেমনি একটি বিষাদ করুণ সুর ধ্বনিত হয়। জগৎ ও জীবনের প্রতি আসক্তি অন্য মহিলা কবিদের চাইতে কম ছিল না।

কেন এ অতৃপ্তি ঊর্মি হৃদি পারাবারে,
উথলিয়া কূলে কূলে করিছে রোদন,
কি অভাব আকুলতা, কেন তৃষাতরে,
চাহিছে সাধিতে সদা কোন সে সাধন? (অতৃপ্তি)

নিঃসঙ্গ জীবনে কবি শুনতে পান—

সহসা কে ডাকি মোরে উঠিল সুদূরে
স্তব্ধ ম্লান সন্ধ্যাটির আধব্যস্ত স্বরে। (কে ডাকে)

স্মৃতির বেদনায় কবি অবসন্ন। হৃদয়তন্ত্রীতে বেজে ওঠে 'স্মৃতির বিষাদ সুর'। 'যাচনা' কবিতায় কবি জীবন ও জগতের কাছে প্রার্থনা করেছেন—

থেকো, দীপ্ত যৌবনের রহস্যের মত,
মোর দুকূল ভরিয়া থমকি,
ফুটো, ধরনী যেমন জাগেগো বসন্তে
নিজ পূর্ণতায় চমকি।
* * * *
প্রেমের প্রথম পুলক মতন
ওগো, চিরদিন এসো স্মরণে।—(যাচনায়)

যত শূন্য পথে চায় আঁখি মম
তত ভরে অশ্রুজলে।

যত ভুলিবারে চায় হায় সেই
অবিজ্ঞাত অতিথিরে,
দুঃস্বপ্ন মত দীর্ঘশ্বাস তায়
কাঁদি তত কাছে ফিরে। (অজ্ঞাত অতিথি)

কত সাধ, কত আশা,
অস্ফুট নীরব ভাষা,
ফুটিয়া উঠিত কত দৃষ্টি আকাঙ্ক্ষার। (কেমনে ?)

নূতন বলিয়া কেন আজি মনে হয়
বিশুষ্ক এ কাননের শুষ্ক ফুলচয় ?
বুঝেছি তুমি গো, প্রেম, অম্লান ধূলায়
আলোকিতে আসিয়াছ, দীপ্ত মহিমায়। (কে ?)

উদ্ধৃতিগুলির মূল সুর প্রেমের ব্যর্থতাজনিত বিষাদ। তবু কবি পথ চেয়ে থাকেন, স্বপ্নে শিহরণ জাগে, না-পাওয়ার বেদনায় যৌবনের স্বপ্নসাধ ম্লান হয়ে যায়। কবি শান্ত এবং স্থিরভাবে জীবনের সমস্যাকে উপলব্ধি করেছেন। কবি সমাধান চাননি বা ব্যর্থতার গ্লানি অনুভব করেননি।

কামিনী রায় (তখন সেন ছিলেন) ও লজ্জাবতী বসু সম্ভবতঃ প্রেমার্থিনী রূপে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন। আমাদের তখনকার প্রগতিকামী সমাজে এ সব কথা ব্যক্ত করা ন্যায়সঙ্গত বা ধর্মসঙ্গত ছিল না। প্রেমে পড়াই যেখানে অপরাধ সেখানে অকৃতার্থ প্রেমের প্রসঙ্গ সাহিত্যে কি করে স্থান পাবে ? বিশেষ করে একজন মহিলার লেখনী থেকে। সত্যগোপন শুধু বাস্তবজীবনে নয়, কাব্যজীবনেও ঘটেছে। সামাজিক ঔচিত্যবোধ তাঁদের বাক্‌শক্তি হরণ করেছে। নারীমনের বহু সূক্ষ্ম অকৃত্রিম কথা নানাপ্রকার আদর্শবাদী বুলির আড়ালে চাপা পড়ে গেছে। সামাজিক শৃঙ্খল শুধু তাঁদের অবরুদ্ধ করে রাখেনি, কাব্যকেও অবরুদ্ধ করে রেখেছে। তবে কাব্যের সেই শৃঙ্খলিত আত্মার কান্না আজ পর্যন্ত অশ্রুত রয়ে গেছে।

অনুরূপা দেবী

অনুরূপা দেবীর সাহিত্যের মূল্যায়ণ করতে গিয়ে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মন্তব্য করেছেন—"তাঁর রচনায় মধ্যে নারীহস্তের স্পর্শ নির্ভুল ভাবে নির্দেশ করা

কঠিন—সাধারণতঃ তাঁহার মন্তব্যের প্রাচুর্য ও বিশ্লেষণের গুরুত্ব পুরুষের পাণ্ডিত্য পরুষ আলোচনার কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। তথাপি তাঁহার উপন্যাসের মধ্যে কতকগুলি দৃশ্য রচয়িত্রীর নারীসুলভ কমনীয়তার নিদর্শন।" অনুরূপা ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পৌত্রী। পিতামহের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনাদর্শ তাঁর কাছে কেবল আদর্শ নয় অবশ্য অনুসরণীয়। 'পোষ্যপুত্র' উপন্যাসে শান্তি শিবানীকে অবসর মুহূর্তে ভূদেববাবুর 'পারিবারিক প্রবন্ধ' পড়তে দিয়ে বলেছে, "বাবা বলেন, পারিবারিক প্রবন্ধ আমাদের দ্বিতীয় মনু।" অন্যান্য উপন্যাস, প্রবন্ধ ও সাহিত্য সভার নানা আলোচনায় ভূদেব প্রসঙ্গ বারবার উত্থাপিত হয়েছে। ভূদেবের সামাজিক ও পারিবারিক তত্ত্বগুলির ভাষ্যকারের ভূমিকা অনুরূপা গ্রহণ করেছেন। ভূদেবের 'পারিবারিক প্রবন্ধে'র নিম্নলিখিত সূত্রগুলি সামনে থাকলে অনুরূপা দেবীর জীবনদর্শন বুঝতে সুবিধা হবে।

১। অধিক বয়সে বিবাহ সাধারণতঃ চিরস্থায়ী প্রণয়ের উৎপাদক হইতে পারে না। (১ম সং, পৃ-৪-৫)।

২। দাম্পত্য প্রেমই সংসারী জীবনের পক্ষে সকল প্রেম অপেক্ষা অধিক প্রগাঢ়। (পৃ-৬)

৩। সতীধর্ম যথার্থ নিষ্কাম ধর্ম উহার কোন স্থলে কোন প্রকার স্বার্থের লেশমাত্র থাকে না। (পৃ-২৭)

৪। যে কাজে স্বামী পূজা নাই, সেরূপ কাজ সতীর মনেই আসে না। (পৃ-২৯)

৫। যে পুরুষ এক আপনাতে এবং আপনার এক পত্নীত্বে অনেকত্বের সমাবেশ করিতে না পারেন, তিনি পবিত্র প্রণয় বীজের যথাযোগ্য পোষণে অশক্ত। তাঁহার বৃক্ষের মূলেই কীট লাগিয়া থাকে—গাছটী কখন যথোচিত রূপে বাড়িতে পায় না এবং পরিণাম হয়তো বিতৃষ্ণারূপ ফলোৎপাদন করে। (পৃ-১০৬)

'চিরকৌমার' 'জ্ঞাতিত্ব' 'দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ' 'সন্তান পালন' 'শিক্ষাভিত্তি' প্রভৃতি নিবন্ধগুলির সূত্র অনুরূপার উপন্যাসের কাহিনী, ঘটনা ও চরিত্র নিয়ন্ত্রণ করেছে। ভূদেব-রাজনারায়ণকে কেন্দ্র করে নব্য হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান ঘটেছিল। এবং দেশীয় আচারবিধির অধঃপতনে পত্রপত্রিকায় সাবধান বাণী উচ্চারিত হচ্ছিল। "হিন্দু সমাজ ইহার প্রতিকার করুন, নতুবা মহা বিভ্রাট ঘটিবে।"[১৮] অক্ষয় সরকার, শশধর তর্ক-চূড়ামণি ও বঙ্কিমের প্রভাবের কাল সূচিত হয়েছে। ১৮৮২-১৮৮৬ সালের মধ্যে বঙ্কিমের ত্রয়ী উপন্যাস আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরানী ও সীতারাম প্রকাশিত হয়েছে। নিষ্কাম ধর্ম ও লোকহিতৈষণার বাণী সমাজজীবনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে।

অথচ ইংরাজী শিক্ষা বালক-বালিকা নির্বিশেষে দেশময় ছড়িয়ে পড়েছে। 'নবজীবন' হিন্দু ধর্মের মধ্যে নবজীবন সঞ্চার বাসনায় খুবই সোচ্চার। "আমাদের হিন্দুসমাজ অধঃপাতে গিয়েছে। হিন্দুসমাজে প্রকৃত ধর্মভাব লোপ পাইয়াছে, হিন্দুসমাজের অবস্থা দেখিয়া প্রাণ কাঁদিয়া থাকে, আমাদের ভিতর বৈষয়িক সভ্যতা নাই—এবং আধ্যাত্মিক সভ্যতার জীর্ণ শীর্ণ মৃতপ্রায় দেহটা আছে। আমাদের সমাজের বন্ধন নাই,—বন্ধন আলগা হইয়া পড়িয়াছে, আইস সকলে মিলিয়া মিশিয়া বন্ধন দৃঢ় করিবার চেষ্টা করি।"[১৯] পাশ্চাত্য সাহিত্য ও সভ্যতাব প্রভাবে ভারতীয় সমাজ ও পরিবারের ক্ষেত্রে পুবাতন মূল্যবোধগুলি পারত্যক্ত হচ্ছিল। প্রেম পারিবারিক জীবনের কেন্দ্রীয় ভাব। বিদেশীয় প্রেম-ভাবনা ভারতীয় প্রেম-ভাবনায় অনুপ্রবেশ করছিল। হিন্দু ধর্মের সংস্কারকরা এই প্রেমকে বিজাতীয় বলে চিহ্নিত করলেন এবং ভারতীয় পুরাণ-কথিত প্রেমের উজ্জীবন চাইলেন। "ভালবাসা পার্থিব পদার্থ নহে, স্বর্গের অমূল্য রত্ন। নিঃস্বার্থ ভালবাসা যাঁহার হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়াছে, জগতে তিনিই সৌভাগ্যবান। সর্বত্যাগী শিবই একবার নিঃস্বার্থ ভালবাসিয়াছিলেন। বঙ্গীয় যুবকের অদৃষ্টপ্রসাদাৎ ভারতের অপূর্ব কৌশলময় ধর্মবিবাহে সেই ভালবাসা নিহিত রহিয়াছে। হিন্দুর সংসারাশ্রমে ধর্মের অভাবনীয় কারণসূত্রে সেই অমৃতময় ভালবাসার বীজ, বঙ্গীয় যুবক সহধর্মিণীকে নিরতিশয় ভালবাসেন। সেইজন্য বাঙ্গালীর স্ত্রীই সুন্দরী।"[২০] ১২৯৩ সালের নবজীবনে 'মহাহিন্দু সমিতি' স্থাপনের প্রয়াসের কথা বলা হল। এই গাল-ভরা কথা যখন বর্ষিত হচ্ছে এবং বাহবা পাচ্ছে, তখনকার কলকাতা সম্বন্ধে শিবনাথ শাস্ত্রী বলেছেন, কলকাতা নরকস্বরূপ হয়েছে। কলকাতায় বেশ্যার সংখ্যা বাড়ছে। সেই বেশ্যার সহবাস অবশ্যই অনেক এই শিবসদৃশ হিন্দু স্বামী প্রবরেরাই করছেন। মফঃস্বল শহরের অবস্থাও কিছু পুণ্যময় ছিল না। দেওয়ান কার্তিকচন্দ্র রায়ের আত্ম-চরিতে বর্ণিত কৃষ্ণনগরের সমাজচিত্র মোটামুটি এ ব্যাপারে 'রিপ্রেজেনটেটিভ' চিত্র বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

এই ভাবজোয়ারের হাত থেকে স্বর্ণকুমারীও আত্মরক্ষা করতে পারেননি। অনুরূপা ও নিরুপমা দেবী নারী দৃষ্টিকোণ থেকে এই আদর্শকে সাহিত্যে গ্রহণ করলেন। অনুরূপা দেবী সম্পন্ন বর্ণহিন্দুর রক্ষণশীল মনোভাবকেই সাহিত্যে ফুটিয়ে তুলেছেন।

ভূদেব-অনুরূপার মধুর সম্পর্কটি নাতনির বহু উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। তাঁর উপন্যাসে নাতি-নাতনি, ঠাকুরদাদা, ঠাকুমা, দিদিমা, দাদামশাই প্রভৃতিকে নিয়ে একটি পরিহাসোচ্ছল চিত্র পাওয়া যায়। ভূদেবের ক্রোড়ে বসেই তাঁর বাল্যশিক্ষা।

তাঁর মানসগঠনে ভূদেবের প্রভাব দীর্ঘপ্রসৃত ছায়ার মত অবস্থান করেছে। শিল্পী-জনোচিত পর্যবেক্ষণ শক্তি তাঁর ছিল, অভিজ্ঞতাও তিনি অর্জন করেছিলেন, সহানুভূতির অভাব ছিল না। এসব সত্ত্বেও পিতামহ-প্রদর্শিত আদর্শ তাঁর শিল্পী-জীবনকে মহৎ ও সুন্দর করে গড়ে তুলতে সাহায্য করেনি। আদর্শ পেয়েছেন কিন্তু শিল্পী-চেতনা খণ্ডিত হয়েছে। তাঁর নায়ক-নায়িকাদের জীবন চালিত হয়েছে এক বাঁধা সড়কে। জীবন বিচিত্র পথগামী। সে পথ কখনও ঋজু কখনও সর্পিল। ফলে বহু রচনা আদর্শের ভারে ন্যুব্জপৃষ্ঠ হয়ে পড়েছে। তিনি 'দ্বিতীয় মনু' ভূদেবের ভাষ্যকার হতে যেয়ে শিল্পের হন্তারক হয়েছেন। আদর্শের তর্জনী সংকেতে বাস্তব সংসার ভূমি থেকে উত্থিত চরিত্র এবং কাহিনী অকস্মাৎ নাটকীয় ভাবে গতি পরিবর্তন করে। এই পরিবর্তনের পরিণতি শাস্ত্রীয় তাৎপর্যে জীবনকে স্থাপন করা। অনুরূপার 'বাগদত্তা' উপন্যাসের কমলার জীবন আর নিরুপমার 'অন্নপূর্ণার মন্দির'-এর সতীর জীবন কাহিনী মূলতঃ জীবনবোধের ভিন্নতারই পরিচায়ক। বাগদত্তার চরিত্রগুলি ঘিরে অপ্রয়োজনীয় ভাবে নেমে আসে ধর্ম, ভক্তি, পাতিব্রত্য, নাস্তিকতা, গঙ্গাজলি, গার্হস্থ্য ধর্মের আদর্শ, চতুবর্ণের সার্থকতা, রাঢ়ী-বারেন্দ্র বিবাহ সমস্যা, সতীত্ব, আদর্শ বৈধব্যজীবন, আধুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে হিন্দু শাস্ত্রের ব্যাখ্যা, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের বিরোধ এবং প্রাচ্য দর্শনের শ্রেষ্ঠত্বের মতবাদ, বংশের পবিত্রতা, কৌমার্যব্রতের সার্থকতা প্রভৃতি। কূটতর্কের আঁধিয়ায় উপন্যাসের আমেজ নষ্ট হয়ে গেছে। তাঁর 'মা' এই গোলক ধাঁধায় পা দেয়নি। সেখানে তিনি সমাজ, পরিবার, ব্যক্তিকে তাদের নিজস্ব সমস্যার মধ্যেই আবৃত রেখেছেন। এইটি একমাত্র উপন্যাস যেখানে বিষয়বস্তু, পরিবেশ এবং চরিত্র কিছুটা স্বাভাবিকভাবে বিকশিত হবার সুযোগ পেয়েছে।

'মা' উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদে তিনি লিখেছেন—"আজকালকার কালে কোন্ শিক্ষিত যুবকের যে দুই সংসার হইতে পারে, এ কথাটা বিশ্বাসযোগ্যই নয়। হয়ত ইতিমধ্যেই কেহ কেহ এই কথা শুনিয়া চমকাইয়া উঠিবেন। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে জন্মগ্রহণ করিয়াও সে বেচারার এই রূপই ললাটলিপি।" ললাটলিপির জন্য অরবিন্দের দুই সংসার। প্রথম স্ত্রী মনোরমা তার নিজের মনোনীত। দ্বিতীয় স্ত্রী ব্রজরাণীধনী পিতৃবন্ধুর কন্যা, পিতৃ-মনোনীত। অরবিন্দের পিতা মনোরমাকে পরিত্যাগ করে পুত্রকে বুঝিয়ে দিলেন, বিবাহ পুত্রের ইচ্ছামত হলেও, পুত্রবধূকে ঘরে রাখা না রাখা তাঁর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। মনোরমার পিতা দীননাথ মিত্র কন্যার অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার সংবাদ পত্র যোগে মৃত্যুঞ্জয় বসুকে জানালে তিনি সে পত্র গ্রহণ না করে ফিরিয়ে দেন। পৌত্রলাভের সংবাদ পেয়েও হৃদয়হীন ও অর্থপিশাচ মৃত্যুঞ্জয় পৌত্র এবং পুত্রবধূকে গ্রহণ

করেননি। মনোরমা এবং পুত্র অজিত বর্ধমানে বৃদ্ধা মাতামহীর নিকট পরিত্যক্ত হল। মৃত্যুঞ্জয় বসুর মৃত্যুর পর কাহিনীর দ্বিতীয়াংশের সূত্রপাত।

'মা' হল আমাদের রাম-সীতা কাহিনীর আধুনিক ভাষ্য। উপন্যাসটির পরিচ্ছদের ললাটে গঙ্গামৃত্তিকার ছাপের মত রঘুবংশ, ভট্টি, উত্তররামচরিত, রামায়ণম্, যোগবাশিষ্ট রামায়ণ, অভিজ্ঞান শকুন্তলম্, মালতীমাধব, গীতা প্রভৃতি থেকে উদ্ধৃতি সংযোজিত হয়েছে। উদ্ধৃতিগুলির প্রভাব উপন্যাসে লক্ষ্য করা যাবে। দশরথ, মাতা কৌশল্যা, রামচন্দ্র, সীতা এবং লবকুশের প্রসঙ্গ নানাভাবে এসেছে। অরবিন্দের চরিত্র চিত্রনে কখন রামচন্দ্র কখন দশরথ, মনোরমার চরিত্রের সঙ্গে সীতা ও কৌশল্যার, অজিতের চরিত্রের সঙ্গে কুশের এবং বর্ধমানে অবস্থানের সঙ্গে আশ্রমবাস তুলিত হয়েছে।

পুরোনো গৃহভৃত্য রাখালের উক্তি—"আহা আমার সোনার কুশী এবার অযোধ্যার রাজা হবেন। মা জানকী আমার অরণ্য ত্যাজ্য করে নিজের রাজ্যিপাটে ফিরে যাবেন" (পৃ-১৩)। অজিত আবেগকম্পিতকণ্ঠে আবৃত্তি করে 'পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম' ইত্যাদি শ্লোকটি। মনোরমা আবৃত্তি শুনে পুত্রকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে ভাবে, "তাহার প্রাণান্ত শিক্ষা ব্যর্থ হয় নাই। সে তাহার দেবতা চিনিয়াছে।" এ যেন বাল্মীকি আশ্রমে সীতার লব-কুশকে পিতৃভক্তি শিক্ষাদান। পুরাণের পুনর্বাসন এখানেই শেষ হল না। মনোরমা সম্বন্ধে শরতের মন্তব্য :— "বর্ধমানে যেয়ে আজ দেবী দেখে এলাম গো,—আমার তীর্থ করা হয়ে গেল। কালীঘাটের দেবীর শুনেছি, কোথায় নাকি একটা সিন্দুক বন্ধকরা কড়ে আঙুল আছে, আর এ দেবী যে আমার রক্তেমাংসে গড়া জ্যান্তদেহ নিয়ে সহস্র অভাবের মাঝখানে অটল হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তবুও সেই তেমনিতরই পতিপ্রাণা, সত্যিকারের সতী" (পৃ-৬৯)। "ওগো না না, সীতা-দেবীরও মনে একটু অভিমান ছিল, এর যে তাও নেই গো।"

অজিতের চোখে তার মায়ের ছবি তো বাঙালী মায়ের চিরন্তন ছবি। জননী জানকীর প্রতিভাসমাত্র।

রামকথার বিভিন্ন অনুসঙ্গ তিনি বারবার ব্যবহার করেছেন। তাঁর উদ্দেশ্যটি কি তা পাঠক অনুমান করতে পারেন। রামায়ণ ও মহাভারত প্রসঙ্গ তিনি অন্যান্য উপন্যাসেও একাধিকবার ব্যবহার করেছেন।

মনোরমা ও অরবিন্দের দাম্পত্যসম্পর্ক মাত্র এক বৎসরের। মনোরমা এই স্মৃতিকেই কপালের উজ্জ্বল সিন্দুর বিন্দুর মতই হৃদয় আকাশে উজ্জ্বল করে রেখেছেন। "আর স্বামী প্রেম? —বৈকুণ্ঠবাসিনী নারায়ণীরও ভাগ্যে ঠিক এমনটি ঘটিয়াছে কিনা, এ বিষয়ে এই মুগ্ধা নারীটির মধ্যে আজও বিষম দ্বন্দ্ব রহিয়া গিয়াছে।" (পৃ-২৯)।

অনুরূপা দেবী মনোরমার জীবনের অতীত দিন গুলির পরিচয় দিতে গিয়ে যে সব মুহূর্ত এবং ঘটনাগুলি নির্বাচন করেছেন তার মধ্যে বাঙালী ঘরের মাধুর্য যেমন ধরা পড়েছে তেমনি লেখিকার নারী মনটির স্পর্শও সুলভ। বিবাহের পর কোন এক গ্রীষ্মাবকাশে অরবিন্দ পিতাপুত্রের পরীক্ষার জন্য তার স্বতন্ত্র থাকার ব্যবস্থা করেছেন। দাম্পত্যজীবনের প্রথম দুর্নিবার আকর্ষণে অরবিন্দ কখন পান-সুপারি কখন বা মাথা ধরার অজুহাতে অন্দরে প্রবেশ, অসুস্থতার ভাণ করে শরতের বিছানায় শুয়ে মনোরমাকে ডেকে দিতে বলা, শরতের সঙ্গে ঘর বদল করে দু'জনে রাত কাটিয়ে সকালে স্থান পরিবর্তন বা দুপুরে গৃহিণীর নিদ্রার অবকাশে চুরি করে তাদেব মিলনের দৃশ্য রচনায় অনুরূপা যথেষ্ট দক্ষতা দেখিয়েছেন। পরীক্ষায় অরবিন্দ কৃতকার্য হল না। শাশুড়ী বললেন বৌ অপয়া, কর্তা বললেন ছোটোলোকের মেয়েকে দুব করে দাও। মনোরমা কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো। অরবিন্দ তাকে বুকের মাঝে টেনে নিয়ে চোখের জল মোছাতে লাগলো এবং লঘু অথচ আন্তরিক সংলাপের দ্বারা অকৃত-কার্যের গুরুত্বটা লঘু করার চেষ্টা করলো।

"হাসি এবং কান্না এ দুই বিস্মৃতি হইয়া গিয়া ঘোর লজ্জায় আকর্ণ ললাট আরক্ত করিয়া তুলিয়া অরবিন্দের সেই বিপন্না বধূটি তাহারই কোলের মধ্যে অসহায় ভাবে নিজেকে লুটাইয়া দিয়া দুইহাতে তাহাকে চাপিয়া ধরিল। লজ্জার তাড়নায় সবেগে তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল—ছি, ছি, ছি, কি যে তুমি, যা তা সব কথা বল", (পৃ-৩৭)। এমন লঘু, ঘনিষ্ঠ ছবি মহিলা লেখিকাদের পক্ষেই রচনা সম্ভব। দেহ ও মনের এই প্রসন্নতা, ভাবাবেগের এমন অকৃত্রিম প্রকাশ বাংলা উপন্যাসে খুব বেশি নেই। নারীর লজ্জা, অনুরাগ এবং আত্মসমর্পণের এমন নিবিড় চিত্র, অনুরূপার আব কোন উপন্যাসে সহজ লভ্য নয়।

মহিলামহলের চিত্রাঙ্কনে অনুরূপা সিদ্ধহস্ত। মনোরমার অন্তঃসত্তা হওয়ার সংবাদ পাড়ার মহিলামহলে ছড়িয়ে পড়লে বাড়ুয্যে-ঘোষ-বোস গৃহিণীরা এসে মিত্তির বাড়ী জড়ো হল। মনোরমার শ্বশুরবাড়ী যাবার খবর শুনে তাদের প্রতিক্রিয়া :—

বাড়ুয্যে গৃহিণী—"সে কি মনোরমা, তুমি কি খুকী? এ মাসে কি ওকে শ্বশুর-বাড়ী যেতে আছে? এটা যে জোড়া মাস পড়লো। তুমি কি রকম মা গা? এতদিনে কিছু জানতেই পারনি? আমার প্রথম থেকেই সন্দেহ,—ওকে কতদিন জিজ্ঞেস করেছি—তা মেয়ে শুধু হাসে, বলে না ত কিছু।" দুর্গাসুন্দরী আনন্দের মধ্যেও ঈষৎ চিন্তান্বিত হয়ে পড়লেন। "তা হলে তো ও মাসেও ওর যাওয়া হবে না দিদি,—জ্যেষ্ঠ বউ জষ্টিমাসে তো যাবার যোই নেই।—"

ঘোষজায়া কহিলেন—"আষাঢ়ে আট মাস হবে, 'আটে কাঠ চড়া' তো একেবারেই নিষেধ। তাহলে সেই শ্রাবণ মাসেই যাবে তখন। আর না হয় এইখানেই সাধটাধ খেয়ে একেবারেই বেটা কোলে নিয়েই শ্বশুরকে দেখাতে যাবে, সেই ভাল মনোরমা, তাই করো মা—কিপটে শ্বশুর মিনসে যেমন চশমখোর, তেমনি একটু জব্দ হোক। বেটার বিয়ে দিয়ে বৌ নিয়ে গিয়ে অবধি এক হাঁড়ি মুড়ির মোয়া দিয়েও কখনও কুটুমের মর্যাদা রাখলো না,—এখন পৌত্তুর হলে তো আর তেল সন্দেশ বন্ধ করতে পারবে না বাপু, যতই হোক্।" (পৃ-৪৩)।

উদ্ধৃত অংশটুকু একান্তই মেয়েলি। নারীদের এই আলোচনায় যেমন বিস্ময়, কৌতুক ও কৌতূহলের প্রকাশ ঘটেছে তেমনি মেয়েলি আচার, সংস্কার, কথাবলার ভঙ্গিটিও যথাযথভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। এ সব পুরুষের জানার কথা নয়। তাই তাদের রচিত সাহিত্যে এমন করে এগুলি উপস্থাপিত হবে না।

মৃত্যুঞ্জয় বসুর মৃত্যুর পর সবাই মনে করলো এবার মনোরমা ও অজিত তাদের নিজেদের বাড়ী ফিরে যাবে এবং এ সংবাদ সমস্ত পাড়ায় ছড়িয়ে পড়লো। গ্রামের 'বাবাঠাকুরটি'র ভোজের জন্য বাগ্দী বুড়ি একপোন কইমাছ, গদায়ের মা গরম মুড়ি হামিদ নিজেদের বাগানের কাঁচা আনারস দিয়ে যায়। ঘোষ ও চাটুজ্যে-গৃহিণী এ সংবাদ শোনার পর মুখে নিয়ে ঢুকলেন—"এমন সময় যাওয়া যে, মেয়েটাকে একটা দিন দুটো মাছ ভাত খাইয়ে পাঠাব, তার যোটি হল না। আহা বাছা। এতদিন পরে নিজের ঘরে যাবে,—তা না একটু সিন্দূর ছোঁয়ান,—যেন মা ভগবতী তপস্যাকরা বেশ নিয়েই যেতে হবে। মাগীর উচিত ছিল মিন্সের অন্তর্জলের সময়ও অন্ততঃ বউকে নিয়ে যাওয়া তা হলে ত আর এমন সন্ন্যাসবেশে মেয়ে পাঠাতে হতো না" (পৃ-১৪)। মহিলাদের বৈশিষ্ট্যই হল একটি প্রসঙ্গ নিয়ে তাদের আসা। কথায় কথায়, নানাপ্রসঙ্গের মধ্যে আসলটি হারিয়ে ফেলা। রান্নাবান্না, বেশবাস, পরচর্চা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে ঘরকন্নার কথায় চলে যান। রান্নার একটা বড় ফিরিস্তি দিলেন ঘোষ-গৃহিণী—"এই বেশ করে হাতবাছা করে নিয়ে চারটি সোনামুগের ডাল রাঁধলুম, আর উচ্ছে দিয়ে আলু দিয়ে আর ছোলা ভিজে দিয়ে ভাজাভাজা করে চচ্চড়ি, কুমড়ো, ডেঙ্গোডাঁটা আর ঝিঙে দিয়ে একটা ডাল্না, হ্যাঁ, তাতে দুটো কাঁঠালবীচিও দিয়েছিলুম ভাই। আর দেখ একমালা নারকেল ছিল, তাই একটু কুরে দিলুম, আর খানিকটা ভেঙ্গে বেশ বড় বড় করে ভাজলুম। তা খেতে বড় মন্দ হয়নি। বেশ মাখামাখা ঝোল ঝোল হয়েছিল। কুমড়োটুকুও দিব্যি মিষ্টি ছিল কিনা—বড্ড 'তার' হয়েছিল। হ্যাঁ, এইতো গেল

নিরিমিষ। মাছের হোল গে চিংড়ি মাছ দিয়ে আলু পটল দিয়ে ডালনা। আর বড় বড় বাটা এনেছিল তারই ঝাল। আর জানই তো কর্তার আমাদের মাছের টক্ টুকুন নৈলে ভাতের গরাস মুখেই ওঠে না। কি করি চুনোচানা মাছের মিষ্টি দিয়ে অম্বল একটু করতেই হয়।······বৌমা পোয়াতি মানুষ, তার আবার মাছের জিনিস মুখে ভাল লাগে না, ঐ অম্বলটুকু দিয়েই যা ভাত খায়" (পৃ-১৪)। বিধবাদের রান্নার ফিরিস্তি—"পোড়া বিধবার আবার খাওয়া। একটা শাক, চচ্চড়ি দুখানা ভাজা, একটু ডাল, এক ফোঁটা অম্বল, নাউয়ের ঘণ্টই হোক, নয়তো একটু সুকতুনিই হোক, এই হলেই ভেসে গেল" (পৃ-১৪)। গৃহস্থালির বিশদ বিবরণ উপন্যাসে গার্হস্থ্যরসের সৃষ্টি করেছে।

শরতের কন্যা অসীমার বিবাহ উপলক্ষে কনের সাজসজ্জা ও গহনার তালিকা :— মধ্যবিত্তের পরিবারের—পার্শীশাড়ী, সেমিজ, পেটিকোট, সাদাজামা ইত্যাদি। "সিউলি পোতের বেনারসী,—নৈলে সচরাচর বালুচরের একখানা চেলি, পায়ে চার গাছা দমদম কি সজনে পাকের মল, কণ্ঠমালা, কি খুব হলেতো, ঐ যা বলেছিস্— পাঁচনলী আর পৈঁচে যবদানা মরদানা পলাকাঠি—এরই মধ্যে একটা কিছু। কড়ির ঝাঁপি, সিন্দুর চুবড়ি, চেলি নথ, মাটা তাবিজ। এক গাছা নোয়া আর একটি ফাঁদি নথ দিতেন গরীবরা" (পৃ-৭৬)। ধনীদের কুলবধূদের গহনার তালিকা :— মাথায় সীতাপাটি, কানে ঢেঁড়ি ঝুমকো, চৌদানি, পিঠে পিঠ ঝাঁপা। বাজু, জশম, বাউটি, পায়ে গুঞ্জরী পঞ্চম, বাঁকা মল, চরণ পদ্ম, পাঁইজোর। 'বাগদত্তা'-তে আরও কয়েকটি গহনার নাম পাওয়া যায়। রূপার পৈছা, সোনার পাঁচনর, ঝাঁপটা, পানকাঁটার ঘুমুর, জাটা তাবিজ, ফারফোরের অনন্ত ইত্যাদি। কিন্তু সমাজের উচ্চমহলে একসঙ্গে এত গহনা পরার রেওয়াজ ছিল না। পরলে মেয়েরা মুখ টেপাটিপি করে হাসতো আর বলতো "এ কি গো। এরা সোনার বেনে নাকি?" (পৃ-৭৬)। কুলীন বৃদ্ধা, সেকালের বিয়ের পরিচ্ছদের একটা তালিকা দিয়েছেন।

বিয়ে বাড়ীর তত্ত্ব চিরকালই মেয়েদের সমালোচনার বিষয়। বাঙালী ঘরে এটা অতি সাধারণ ব্যাপার। শরতের মেয়ের বিয়ের তত্ত্ব দেখে একজন মহিলা ঠোঁট উল্টে মন্তব্য করলেন—"অমন থালা সাজিয়ে তত্ত্ব করা আমরা পারিনে। একখানা করে খগী থালে ফাঁক ফাঁক করে সাজিয়েছে দেখনা,—তাই নিয়ে একটা করে লোক, এ খালি লোক বিদেয় করিয়ে কুটুম্বের কাছে দান আদায় করা। মা গো এমন ফিন্ ফিনে ক্ষীরের ছাঁচ তুলে কি করে গা। দেখ দেখ পটুলার শাশুড়ীর হাতের তারিফ আছে। ফুঁ

দিলে ঘুড়ি হয়ে আকাশে উড়ে যায়। 'আলোচনার শেষ সিদ্ধান্ত'-কোনটারই শ্রী নেই।" (পৃ-৭৬)। এই তত্ত্ব ও পণের বলি হয়েছিলেন দীননাথ মিত্র।

বাঙলাদেশের মহিলাদের মধ্যে স্বামীবশ এবং পুত্রবতী হবার জন্য নানাপ্রকার অশাস্ত্রীয় অনাচারপূর্ণ অনুষ্ঠান দেখা যায়। পুণ্যিপুকুর ব্রত করে 'বাগ্‌দত্তা' উপন্যাসে গৌরী মহাদেবের মত বর কামনা করেছে। 'মা' উপন্যাসে ব্রজরাণী সতীনের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য ব্রত করে সতীনের রক্তে আলতা পরতে চেয়েছে। বিবাহের পর ব্রজরাণী স্বামীকে বশ করার জন্য তুকৃতাক্ করেছে। ব্রজের পুত্র না হাওয়ায় বাড়ীতে আগন্তুক মহিলা ও পাড়াপড়শীরা উপযাচক হয়ে বলে, বউকে ওষুধ খাওয়াও, মাদুলী পরাও। 'বিস্মৃত স্মৃতি' গল্পে মন্দাকিনীর শাশুড়ী ঠাকুর-দেবতার পূজা দেওয়া, ফকিরের ঔষধ খাওয়ান, মন্ত্র, কবচ, মাদুলী করিয়েও কোন ফল না পেয়ে পুত্র বিপিনকে বলেছেন, 'বিপিন তুই আবার বিয়ে কর' (পৃ-৪২১)। উষা ষোল বৎসরে পা দেওয়া থেকেই শাশুড়ী দেবদেবীর মানৎ করতে আরম্ভ করেছেন। ব্যর্থ হয়ে উষার ঊর্দ্ধতন ও অধস্তন ব্যক্তিদের ভদ্রতা বর্জিত বিশেষণে সম্বোধন করে পুত্রকে ডেকে বলেন —"শোন মণে। যদি বছরের মধ্যে বউমা বেটা কোলে করে নিয়ে না বসে, তো আসছে বোশেখে তোর আবার বিয়ে না দিয়ে জলগ্রহণ করবো না। বৌবাজারের মিত্তির বাড়ী নিয়ে এল কিনা একটা বাঁজা তালগাছ। ও মা, এ কি ডোম-ডোকলার ঘর পেয়েছে গা যে সাহেববিবির মতন স্বাধীন হয়ে বেড়াবে মনে করেছে? ছেলে আমার চাই-ই-চাই। সে আমি বলে দিচ্ছি" (পৃ-৫৯)। উষার মা মেয়ের মুখে সব শুনে ঝি এর কথা মত কোড়লা সিদ্ধেশ্বরী তলায় ব্রজ ও উষাকে পাঠিয়ে ঔষধ খাওয়ান এবং মাদুলী ধারণ করান। উষার সাত আট মাস পরে সাধ ভক্ষণ হল। তাহার পরদিন সে (ব্রজরাণী) মাদুলীটি খুলিয়া ফেলিল (পৃ-৬৯)।

সতীন সম্বন্ধে সেকালের মেয়েদের ধারণা এবং সতীনে-পড়া মেয়েদের মানসিক চিত্র অনুরূপা সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করেছেন। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী প্রথম পক্ষের স্ত্রীর জীবিতাবস্থায় সহধর্মিণীর পদে উন্নীত হতে পারে না। মেয়েলি আচার অনুষ্ঠানে বিধবাদের মত তারাও অস্পৃশ্য। সতীনরাও তাদের অধিকার এবং পদমর্যাদা ছাড়বে কেন? ঠান্‌দিদি তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী। প্রায়ই তিনি ছড়া কেটে বলেন—"এক ঘরে সোয়ামির স্ত্রী পাতে বসে খায়, দোজ বরে সোয়ামীর স্ত্রী সাথে বসে খায়, আর তেজ বরে সোয়ামীর স্ত্রী কাঁধে চড়ে যায়" (পৃ-৬৩)। ব্রজের স্বামী দোজ বরে, সতীনের হাতে পড়ার জন্য শরতের কন্যা অসীমার বিয়েতে পিড়িতে আলপনা দিতে গিয়ে ব্রজ অপমানিত হল। "সতীনে-পড়া মেয়ে তুমি, মঙ্গলকর্মে তোমার হাত দেওয়াই বা কেন

বাছা?" (পৃ-৬৬)। সধবা নারীদের যেটি গর্বের বস্তু হল সামাজিক মঙ্গলকর্মে অংশ গ্রহণ তা থেকে ব্রজ চিবদিন বঞ্চিত থাকবে।

ব্রজবানীর এখন সবচেয়ে বড় মানসিক যন্ত্রণা তার বন্ধ্যা দশা। "বাঁজার মুখ দেখতে নেই", "আটকুড়ীর মুখ দেখতে নেই—" এ সব কথা ব্রজের কেবল জানা নয়, অপরের মুখে শোনাও। অসীমার বিয়েতে অজিতকে দেখাব পর থেকে তার মাতৃত্বেব বেদনা অসহনীয় হয়ে উঠেছে। এই বেদনা এক জটিল·মানসিক প্রক্রিয়ার পথ বেছে নিয়েছে। নারীর সপত্নী বিদ্বেষ, পারিবারিক উৎসবে তাব অংশ গ্রহণে অক্ষমতা হেতু মনোবেদনা, বন্ধ্যা নারীর সন্তানকামনা এ সব প্রসঙ্গ অনুরূপা ভালই ফুটিয়েছেন। কাক-জ্যোৎস্নায় দেখা প্রকৃতির সৌন্দর্য আছে কিন্তু সেখানে বস্তুব স্বাতন্ত্র্য বড়ই কম। দিবালোকের সূর্যকবোজ্জ্বল আলোকে বস্তুব বিশেষত্ব, সৌন্দর্য এবং স্বাতন্ত্র্য আর এক বস্তু। ব্রজ-রাণীর সপত্নী যন্ত্রণা আর বঙ্কিমের ভ্রমর, সূর্যমুখী ও সাগবেব যন্ত্রণা এক নয়।

অজিতকে দেখার পব ব্রজর মনের ভৌগোলিক সীমানা প্রসারিত হয়েছে। অজিতকে দেখার পর তাব মনেব অবস্থা "ছেলেটি ছুটি পদ্মের কুঁড়ির মত নতচোখ সুধীরের উপর তুলিয়া, প্রশ্নকর্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া একটুখানি কুণ্ঠার হাসি হাসিল। মুগ্ধা ব্রজরানীর মনে হইল, গুমোট রাত্রির জমাট অন্ধকার ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া পলকের মধ্যে যেন দিনের আলো হিবন্ময়ী উষা মূর্তিতে প্রকটিত হইয়া উঠিল। সেই হাসির আলোর ছোপান, পাতলা রাঙা ঠোঁট ছুখানির মধু নিঙড়াইয়া নিজের তৃষিত অন্তরে ভরিয়া লইবার জন্য মন তাহার মাতাল হইয়া উঠিলেও, সে উদ্দাম আকাঙ্ক্ষাকে সে কষ্টে রোধ করিল। এ বয়সের ছেলে সচরাচব যে বয়সে হিন্দু ঘরের মেয়ে, বড় হয়, মা হয়, সে বয়সে হইলে, তাহার যে না হইতে পারিত, তা নয়,····· উঃ। ছেলে না হওয়ার এত বুভুক্ষা।" (পৃ-৭৮)। ব্রজরানীর মাতৃত্ব রূপ পদ্মটি অজিতকে দেখে দল মুক্ত হচ্ছে।

পদ্মের কুঁড়ির মত চোখ, টুকটুকে রাঙা ঠোঁট ব্রজরানীর মাতৃহৃদয়কে মোহময় করে তুললো। তার করুণ কাতরোক্তি—"পেটে তাহাব সন্তান জন্মায় নাই, স্বামী তাহার নিজের নয়। মেয়েমানুষের এর বাড়া পোড়া কপাল আর কি হইতে পারে।"

সমাজ ও পরিবারে সম্মানের মুকুট তো মনোরমার শিরে শোভা পাচ্ছে। ব্রজ কেবল কতকগুলি গহনার পীড়ন সহ্য করার জন্যেই জন্মেছে। প্রত্যেকবার পূজা এবং ভাইফোঁটায় শরৎ অজিতকে কাপড় পাঠাতো। এখন সে দায় এসে বর্তেছে ব্রজরাণীতে। স্বামী এ ব্যাপারে উদাসীন। ব্রজ উষাকে ক্ষোভের সঙ্গে বলে—"আমি কোন সুবাদে পাঠাতে যাবো?"

"—খুব বড় সুবাদেই। তুই বরঞ্চ মা।"

"ব্রজরানী এমনি করিয়া চমকাইয়া উঠিয়া লোভাতুর ব্যাকুল চক্ষে উষার মুখের দিকে চাহিল যে, সে দৃষ্টিতে মস্তবড় একটা কিছু আছে—কিন্তু সেটা যে কি, তাহার কল্পনা পর্যন্ত করিতে না পারায় উষা উহাকে ভুল করিয়া ফেলিয়া বিচলিত হইয়া পড়িল।" নারীর হৃদয় তন্ত্রীর ঠিক জায়গায় আঘাত লাগলে তা যে কত দ্রুত সঞ্চারী হয় এবং মাতৃত্বের স্থলে বিদ্রূপ যে কত ব্যথার, কত যন্ত্রণার তা নারী ব্যতীত বোঝা যায় না। ব্রজ অনেক চেষ্টা করেও স্বাভাবিক হতে পারেনি।

অজিত চোরের মত পিতার চরণে ভক্তিঅশ্রু নিবেদন করে পালিয়ে যায়। সবাই ভাবলো চোর। ব্রজ যে মনেপ্রাণে অজিতের মা হয়ে গেছে। তাই সে বুঝলো—"ঐ পিতার পুত্র তো সে। দুর্দম ভালবাসার সমান ওজনে দুর্জয় অভিমান যে উহারা বুকের মধ্যে পুষিয়া লইয়া সমস্ত জীবনটাই তুচ্ছ ক্রীড়নকের মত অনায়াসে অবহেলায় অপব্যয় করিয়া ফেলতে পারে।" অরবিন্দ সব সম্পত্তি ব্রজের নামে উইল করে দিলে, চক্ষের জলে বুক ভাসিয়ে মনে মনে বলে, "আমিও তো মা।" স্বামীর পায়ের তলায় মুখ লুকিয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। বর্ধমানে পৌছে সে অজিতকে বলে—"একবারটি আমায় তুমি মা বলে ডাক। তোমার মুখে ঐ নাম শোনবার জন্যে সেই তোমায় প্রথম দেখার দিন থেকে আজ এই সাত বৎসর ধরে আমি যে পাগল হয়ে বেড়িয়েছি।" অনুরূপা দেবীর এই সব ছবি নিতান্তই বাঙালী মধ্যবিত্তের এক বিশেষ যুগের ছবি। এর মধ্যে ভাবুকতা নেই, আছে ভাবালুতা।

বাঙালী ঘরে সমবয়সী ননদ-ভাজের মধ্যে একটি মধুর সখিত্ব থাকে। ননদেরা প্রায় ক্ষেত্রেই ভাজের হয়ে দৌত্য করে এবং তা গৃহের শত সমালোচনা এবং অপ্রীতিকর ঘটনা থেকে রক্ষা করে। ব্রজ, উষা এবং শরৎ মনোরমা সম্পর্কটি বড়ই মধুর। এখানে ব্রজরানী ও উষার, ননদ ও ভাজের সংলাপের কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হল—

ব্রজ—কবতুরি ভাই। সতীনে পড়ার মত অধর্ম মেয়ে মানুষের আর কি আছে বল দেখি।

উষা—তা তো বটেই। বগী-বিন্দির মত চব্বিশ ঘণ্টা সতীনের সঙ্গে লড়তে হচ্ছে, অধর্ম না।

ব্রজ—ঠিক তাই রে ভাই। ঐ আবাগী দুটোর মতই দিনরাত মনের মধ্যে সতীনের সঙ্গে ঝগড়া চলছে, সে তোরা শুনতে না পাস্, আমার নিজের কান যে ঝালাপালা হয়ে গেল। না ভাই ছোট। সত্যি বলছি তোকে—সতীনের ওপর যারা মেয়ে দেয়, তাদের মত মেয়ের শত্রু আর এ পৃথিবীতে কেউ নেই। তোদের ভাই বেশ, কোন জ্বালা পোহাতে হয় না।

উষা—হিংসে হচ্ছে নাকি ? বড্ড পছন্দ হয় তো নিয়ে নে না ?
ব্রজ—বদ্‌লে নিস্‌তো রাজি আছি।
উষা—যাঃ। পোড়াবমুখীর মুখে আগুন জ্বেলে দিতে হয়।

—তা না হলে তার লাভটা কি হলো? ইংরাজীতে যে বলে ভাজনা খোলা থেকে আগুনে পড়া—তাই হবে নাকি ? কেন, দাদা কি মন্দ।

—তুই মর।

—বেশ মজা আর কি। আমি মরি আর আমার সতীন এসে ঘরকন্না করুক।

—সতীনের হিংসেয় মরবিনে ? আহা যদি সত্যি সত্যি মরণ আসে তাকে ঠেকাবি কেমন করে বৌদি ? সত্যি ভাই, তা হলে কি করবি, তাই বল না ?

—তা সে তখন দেখা যাবে। তুই ভাই অমন কথাগুলো থামকা বলিসনে ছোট। শুনলে যেন প্রাণ উড়ে যায়। কথায় বলে 'স্বোয়ামী যমকে দেওয়া যায়, তবু সতীনকে দেওয়া যায় না।'—সে আমি ভাই দিতে পারবো না, ভূত হয়েও আগ্‌লে বেড়াব।

উষা ঈষৎ শিহরিয়া ভ্রাতৃজায়ার ঈর্ষাবিকৃত মুখের দিকে চাহিল।—মা গো এমন কথা তোর মুখ থেকে বেরুলো কি করে ? সত্যি কি সতীনের উপর অতই হিংসে হয় ?

* * * *

উষা একটি ক্ষুদ্র নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, ছোট করিয়া বলিল, 'কে জানে ভাই।' "ব্রজ একটি নিশ্বাস ফেলিল, সে নিশ্বাসটা ননন্দা অপেক্ষা অনেক দীর্ঘ ও তপ্ত।"

(পৃ ২৭-২৮)।

উদ্ধৃত অংশটিতে দুজনের কথা বলার সুর, উচ্চারণ, শব্দ প্রয়োগের বৈশিষ্ট্য, দেহভঙ্গী সব কিছুই চলচ্চিত্রের মত ফুটে ওঠে। লঘু রসিকতা থেকে জ্বালা এবং জ্বালা থেকে দীর্ঘ নিশ্বাসে উত্তরণের ইতিবৃত্ত এখানে না দিলেও নারী হৃদয়ের প্রবণতাগুলি বুঝতে কোন কষ্ট হয় না।

'বাগ্‌দত্তা' উপন্যাসে বাল্যসঙ্গী সত্যের সঙ্গে গৌরীর বিবাহ স্থির হলে লেখিকা কিশোরী গৌরীর মনে একটি ক্ষুদ্র চিত্র এঁকেছেন—"এ কি রকম ? সত্যদা আমার ও মা, এ যে বড় বিশ্রী। ছি, ছি, না—সে ভাল না, বরকে তো সবাই লজ্জা করে, ঘোমটা দেয়—আমি মরে গেলেও তা পারবো না। ও সব করতেই আমার লজ্জা করবে—আর হাসি পাবে, কি যে ওরা সব ঠিক করেন। মাসিমাকে গিয়া বলিল—"বিয়ে না হলেই ত হয় মাসিমা,—হয় না ?" বিন্ধ্য হাসিয়া কহিলেন—'তা কি হয় রে পাগলি ? হিন্দুর ঘরে বিয়ে না হলে যে হয় না।' গৌরীর পক্ষে আর কিছু বলা কঠিন হইয়া উঠিল, শুধু বলিল,—'ধেৎ'।

'চক্র' উপন্যাসে বিনয়-উর্মিলা স্বামী স্ত্রী। অপরিণত বয়সে তাদের বিবাহ হয়েছে। তাদের সম্পর্কটি ভাই বোনের মত। দিনরাত ঝগড়া মারামারি লেগেই আছে। গৃহিণী মৃদু ভৎর্সনা বা আদরে কোন পক্ষকে আয়ত্তে আনতে হয়। শাশুড়ী পুত্রবধূকে তিরস্কার করে বলেন—"পিটোপিটির মত দিনরাত খুন্সুটি করলেই কি স্বামীকে খুশী করা যায়? একটু যত্ন আত্তিও কি করতে পারিসনে ছাই? মেয়েমানুষের একটু গায়ে পড়া হতে হয়। দেখছিস্ তো ও একটা আপনা ভোলা পাগল ছেলে।" উর্মিলা তার বিবাহিত সমবয়সীদের কাছে শুনেছে তারা রাতে এক ডাবা পান নিয়ে স্বামীর কাছে যায়। সারারাত পান খায় আর গল্প করে। উর্মিলা ঠিক করলো আজ রাতে সেও সেজেগুজে পান নিয়ে স্বামীর ঘরে যাবে। 'গরীবের মেয়ে' উপন্যাসে নীলিমা—সুশীলের রান্না ঘরে চা খাওয়া, নীলিমার মনের সংকোচ, কামনা এবং লজ্জা সব মিলিয়ে উপন্যাসে একটি ঘরোয়া পরিবেশ রচনা করেছেন। মায়ের শয্যা পার্শ্বে সুশীল নীলিমার অবস্থান 'বাগদত্তা'-র সত্য-কমলা, কমলা-মনীষ, পুকুর ঘাটে, কমলা-সরোজিনী, সত্য গৌরী প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দৃশ্যগুলির মধ্যে নারী মনের অনেক সম্পদ লুকিয়ে আছে।

॥ ২ ॥

অনুরূপা ও নিরুপমা দেবীর আবির্ভাবের বহু পূর্বেই বাংলাদেশে তথা ভারতবর্ষে হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান এবং সামাজিক অগ্রগতির দিক থেকে পশ্চাদ্‌অপসরণ সূচিত হয়েছিল। ব্রাহ্মসমাজে যুক্তি ও ভক্তির বিরোধে শিবনাথ শাস্ত্রীর নেতৃত্বে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, সমাজ সংস্কারের পথকে গ্রহণ করলো। অচিরকালে বিজয়কৃষ্ণ, বিপিনচন্দ্র প্রভৃতি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের ও ভক্তিবাদের উৎসাহী প্রচারক হয়ে পড়লেন। বাংলা সাহিত্যে ভক্তিবাদ, প্রথানুগত্য, পুরাণ ও রূপকথার প্রতি আকর্ষণ, জাতি ও বর্ণের মহত্ত্ব কীর্তন বড় হয়ে উঠলো। সমসাময়িক কালের উপন্যাসে রাজনৈতিক ও সামাজিক ঘটনার উল্লেখ থাকলেও হিন্দুয়ানির প্রসঙ্গই প্রাধান্য পেয়েছে। কালের বদল ঘটেছে। ১৩১৮ সালে রবীন্দ্রনাথ প্রবাসী পত্রিকায় লিখলেন—"ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ থেকে এই যে আঘাত দেবার কাজ, একটা সমে এসে উত্তীর্ণ হয়েছে। হিন্দুসমাজ নিজের সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছে—হিন্দুসমাজ নানা দিক দিয়ে নিজের ভিতরকার নিত্যতম এবং মহত্তম সত্যকে উপলব্ধি করবার জন্য চেষ্টা করতে প্রবৃত্ত হয়েছে।"[২১] রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধেই বললেন ব্রাহ্মসমাজের কাজ শেষ হয়ে গেছে। এই 'নিত্যতম এবং মহত্তম সত্য উপলব্ধির' কালে অনুরূপা ও নিরুপমা দেবীর আবির্ভাব। নিরুপমা দেবীর সাহিত্যজীবনকে, আশ্রয় করেছে আদর্শ।

অনুরূপায় আদর্শকে আশ্রয় করেছে জীবন। অনুরূপায় নারী সাধ্যের কথা বড় নয়। বড় তাব সাধনাব কথা। নিরুপমা দেবীর উপন্যাসে কাহিনী গ্রন্থনে, ঘটনা সংস্থাপনে, চিত্র ও চরিত্র ব্যাখ্যানে রমণীজনোচিত ভাবটি বিদ্যমান। মনের অতলে ডুব দেবার ক্ষমতা এবং মনের রহস্য উদ্‌ঘাটনে ব্যঙ্গবিদ্রূপ, চোখের জলএবং ক্ষোভেব উত্তাপ একান্তই চরিত্র ও ঘটনাগত। অনুরূপা দেবীর উপন্যাস ঘটনাবহুল। অবিশ্বাস্য ঐন্দ্রজালিক উপায়ে কাহিনীব রূপান্তব ঘটিয়েছেন। আকস্মিক চমক তাঁর প্রায় সব উপন্যাসেই আছে।

উপন্যাস পাঠে প্লট অনুধাবনে স্মৃতি এবং বুদ্ধির একান্ত প্রয়োজন। বহুক্ষেত্রে অনুরূপা দেবী পাঠকের প্রতি সুবিচার করতে সক্ষম হন নি। নায়ক নায়িকাদের চার পাশে এমন একটি ভাবাবেগের বলয়রেখা নির্মাণ করেন, যার জন্যে নায়ক-নায়িকারা সাধারণ জীবনভূমিতে চলাফেরা করতে করতে অকস্মাৎ উর্ধ্বলোককে আশ্রয় করে। যার অপর নাম আদর্শবাদ। তিনি পিতামহের মত হিন্দুধর্মের সনাতন ভাবধারাগুলির উজ্জীবনের মধ্য দিয়ে আদর্শ হিন্দুসমাজকে চেয়েছিলেন। আক্ষেপ করে বলেছিলেন— "আজিকার সমাজচিত্রে সীতা আর নারী জাতির আদর্শভূতা নহেন। যাঁরা সমাজ চিত্রের আদর্শ নায়িকা তাঁদের কথা আর এক সঙ্গে নাই উচ্চারণ করিলাম? রামচন্দ্র এ যুগে একান্তই অবোধ্য। দশরথ তো অপবিজ্ঞাতই। আর ভরতেব মত নির্বোধ এ যুগে কেহ জন্মগ্রহণ করিতে পারে কিনা সন্দেহস্থল। কালচক্র নিয়তই আবর্তিত হইতেছে, ভারতীয় সমাজচিত্রের এই হীনাদর্শ কখনই চিরস্থায়ী হইবে না। সুস্থ সবল দেহ মন পাইলেই আবার আমরা এ দেশে শৌর্যে বীর্যে, ত্যাগে মহত্ত্বে মহিমাময় রূপে রামায়ণের আদর্শকেই প্রত্যেক্ষ করিতে পাইব।"[২২] হিন্দুসমাজের আচরণবিধি ও সমাজনীতির বাইরে তিনি এক পা-ও এগোননি। তাঁর নায়ক-নায়িকারা ভারতের ঐতিহ্যের বাহক। 'মন্ত্রশক্তি'-র নায়িকা বাণী মৃতপ্রায় স্বামীকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলে—"এ নূতন জন্মে মৃত্যুর কাছে তোমায় ভিক্ষে করে ফিরিয়ে নিয়ে তোমায় আমি আমার করবো। পারব না? কেন পারব না? সাবিত্রী তার মৃত স্বামীকে বাঁচিয়ে ছিলেন। আর আমি পারব না? কেন আমি কি সতী স্ত্রী নই? না—আমার শরীরে আমার সতীলক্ষ্মী পুণ্যবতী মা ঠাকুরমার রক্ত বইছে না?"

১৯২৯ সালের মধ্যে ভারতের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেছে। উচ্চশিক্ষার প্রতি আগ্রহ বেড়ে গেছে। শিক্ষিত যুবকরা শিক্ষা-সমাপ্তির পূর্বে এবং চাকুরী লাভের পূর্বে বাল্যবিবাহে আর আগ্রহী নয়। স্বামী স্ত্রীর বয়সের মধ্যকার পার্থক্যটুকু তারা পছন্দ করছে না। যৌথ পরিবারে ভাঙন ধরেছে। ছোট পরিবারের সব দায়িত্বই তো এবার থেকে বধূকে নিতে হবে।

বালিকা হলে চলবে কেন? শিক্ষিত ছেলেরা শিক্ষিত পাত্রীদের পছন্দ করতে লাগলো। হিন্দু বালিকারা উচ্চশিক্ষার দিকে ঝুঁকে পড়লো। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য শিক্ষিত মহিলারা অধিকসংখ্যায় চাকুরী পাচ্ছে।[২৩] ইংরাজী শিক্ষা ও ইংরাজী সাহিত্যের প্রভাবে বাংলা সাহিত্যেও রূপান্তর ঘটেছে। অনুরূপা দেবী এই পরিবর্তনকে বিজাতীয় বলে আখ্যা দিয়েছেন। নারীপুরুষের সম্পর্ক ক্রমশঃ স্বাভাবিক হচ্ছে। অনুরূপা দেবী সমালোচনা করে বললেন—"দেখিতে পাই, গৃহকন্যা ও কুলবধূগণও লাজলজ্জায় ধর্মে কর্মে জলাঞ্জলি প্রদানপূর্বক ঘরসংসার আত্মীয়বন্ধু সব ভুলিয়া, পাশের বাড়ীর দরজায় জানলায় ছাদের আনাচে কানাচের দিকে কটাক্ষ সন্ধানে ব্যাপৃত আছেন। কদাচিত একটি পুরুষের সহিত চোখাচোখি হইলেই তাঁহাদের বুকের রক্ত আনন্দের তালে তালে নাচিয়া দুলিয়া লাফাইয়া ফেনাইয়া উঠিতেছে।"[২৪] সাহিত্যে অবৈধ প্রেম, জাতিপাঁতির অবসান, বিধবার প্রণয়, বিবাহ বিচ্ছেদ, পত্যন্তর গ্রহণ, কুলটা রমণী সংসর্গ প্রভৃতিকে আধুনিক সাহিত্যে ও সংস্কৃতির অপহ্নব ঘটেছে। "এ দেশের এই আদর্শ টুকু যাহারা খর্ব করিতেছে, তাহারা তাহার মহাশত্রু। যে দেশে বিধবাবিবাহ, সধবার বিবাহ বিচ্ছেদ ও পত্যন্তর গ্রহণ আইন ও নীতিবিরুদ্ধ, সে দেশে এ শিক্ষার বিষ তরল তরুণচিত্তে ঢালিয়া দিবার চেষ্টা কেন? নভেল কি এ নহিলে জমে না,—না সমাজ-সংস্কার হয় না।"[২৫]

'মা' উপন্যাসে অজিতকে সব সন্দেহ দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব জয় করে ব্রজরানীর চরণে মাথা ঠেকিয়ে বলতে হয় 'মা'। বেথুনে পড়া ব্রজরানীকে মনোরমার সান্নিধ্যে এসে উপলব্ধি করতে হল পাতিব্রত্যে কোন সন্দেহ, ইচ্ছা ও দ্বিধার অবকাশ নেই। 'বাগদত্তা'-য় কমলা শচীর মৃত্যুর পর বুঝলো স্বামীপ্রেমে অচলা থাকার নাম সতীত্ব—স্বামীর অনুধ্যানই বৈধব্য এবং নারী জীবনের পবিত্রতা। মনীষ জন্মান্তরে তাকে পাবার বাসনা জানালে কমলা বলে—"না না, এজগতে নয়। অন্য কোন জগতের কোনখানেই যেন কখন আর দেখা না হয়, শুধু এইটুকু আশীর্বাদ করে যান।" 'গরীবের মেয়ে'-তে নীলিমার জীবনে কত না ঘটনা প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে ঘটে গেল। নীলিমা খৃষ্টান হল, আবার হিন্দু হবার জন্য ভারত সেবা সঙ্গে যোগ দেবার পূর্বে সুশীলের কাছে এল একটা সিন্দুর কৌটা নিয়ে। সুশীলকে কৌটা খুলে বলে—"এই থেকে একটু সিন্দুর আমার সিঁথেয় পরিয়ে দাও।" নীলিমা- সুশীলের স্ত্রীরূপে আর ঘর করার অবকাশ পেল না। আজ তার জীবনের ব্রত—"হিন্দুমেয়েদের ধর্মশিক্ষা দেবার জন্য আমি প্রাণপাত করবো। যারা আমার মত অবস্থাচক্রে পড়ে সমাজ থেকে দূরে সরে গেছে, তাদের ফেরবার পথ দেবার জন্য একটা স্থান তো চাই।" অর্ধেক বিবাহ করে সুশীল

পালিয়ে এসেছিল। নীলিমার সিঁথিতে সিন্দুর পরিয়ে বিবাহ পূর্ণ হল। এ বিবাহে তাদের দুজনের মুক্তি না হলেও হিন্দুয়ানির স্থিতি হল। সুলেখা সুশীলকে বলেছে সে জন্মজন্মান্তর তার জন্যে অপেক্ষা করবে। সুশীল ও অরবিন্দের দ্বিতীয় বিবাহে লেখিকার আপত্তি নেই। 'বাগদত্তা'-য় কাশীতে গঙ্গাজলি অবস্থায় শায়িত উমাকান্তের সাধ্বী স্ত্রী স্বামীর পায়ে মাথা রেখে পরম তৃপ্তির হাসি হেসে বললেন—'দেবতা জানি না, ধর্ম জানি না, শুধু তোমায় জানি। ও পদসেবার অধিকার যেন আমায় হারাতে না হয়, আশীর্বাদ করো—কত দোষ অপরাধ করেছি, ভুলে যাও।" স্বামী শান্ত কণ্ঠে বলেন—"সতীলোক প্রাপ্ত হও।" 'মা' উপন্যাসের শেষে ব্রজরানীর দু'হাত ধরে মনোরমা বলে—'এবার আমরা দুটি বোনে পাশাপাশি বসে যে তাঁর দুই চরণের সেবা করবো ঠিক্ করে রেখেছি।" 'মন্ত্রশক্তি'-তে বাণীর সাধনা আর সাবিত্রীর সাধনার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। 'সতী নারীর সপ্রেমমুখ',[২৬] ব্যতীত অনুরূপার আগ্রহ সীমিত। উল্কার নায়িকা তড়িতা উচ্চশিক্ষিতা। সে পাউডার রুজ মাখে, টানা টানা সুরে কথা বলে, কেদারায় গা এলিয়ে বসে, হিল তোলা জুতো পায়ে দিয়ে সামনে ঝুঁকে চলার মধ্যে উগ্র আধুনিকতার প্রকাশ। কিন্তু হৃদয়ে ঘুমিয়ে ছিল বাঙালী ঘরের নিষ্ঠাবতী হিন্দু রমণী। দাম্পত্য জীবনের সংকটে খোলস ছাড়া সাপের মত আসল হিন্দুয়ানী বেরিয়ে এসেছে। তড়িতা শুনলো তার স্বামী লক্ষ্মীর প্রতি আসক্ত। কেশব শিরোমণির পত্র, গহনা ও বেনারসীর সাক্ষ্য প্রমাণ দেখে বলেছে—"ভুল সবারি হতে পারে। তুমি ত তাকে তেমন করে চেননি ভাই, আমি আমার দেবতাকে যেমন করে চিনেছি। তিনি কখন তাঁর এ দাসীকে না জানিয়েই তাকে ঠেলতে পারেন? যদিই ধরো—যদিই গরীব বলে, অনাথা বলে, লক্ষ্মীকে তাঁর চরণে স্থান দিতে সাধই হয়ে থাকতো,—তাহলে নিশ্চয়ই তিনি সে ইচ্ছা তাঁর দাসীকে জানাতেও কুণ্ঠাবোধ করতেন না। তিনি জানেন, তাঁর একবিন্দু সাধ পূর্ণ করতে তাঁর তড়িৎ নিজের বুক পেতে দেবে, সে তো কিছুতেই না বলবে না।" এ জাতীয় মানসিকতা এবং স্বামীর প্রতি এমন বিশ্বাস প্রকৃতপক্ষে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের অনুশাসন থেকে উদ্ভূত হয়েছে। তড়িতেরা উচ্চশিক্ষিতা কিন্তু সমাজ পরিবারের রূপান্তরের ইতিবৃত্তকে পড়তে পারেনি। 'বিস্মৃত-স্মৃতি' গল্পের বিপিন অন্য সময় মাতৃআজ্ঞা পালন না করলেও বংশরক্ষার জন্য দ্বিতীয় বিবাহে মত দেয়। হীরালালবাবু মেম-শিক্ষয়িত্রীর কাছে মেয়েদের পড়ান, সমাজ-সংস্কারে আগ্রহ দেখান, তিনিই আবার বিপিনকে দ্বিতীয় বিবাহের সপক্ষে বলেন—"স্ত্রীশিক্ষা এক জিনিস আর কুলধর্ম পালন আর এক জিনিস। শিক্ষার সাথে ধর্মকে এক করো না। স্ত্রীর চেয়ে পিতৃপুরুষকে ছোট করলে তাতে যে মহা অধর্ম

হবে।" অবশেষে বিপিন বিবাহে মত দিল। নারীশিক্ষার পক্ষপাতী, নারীমুক্তি আন্দোলনের সৈনিক বিপিনদের অনুরূপা এমনই করে হত্যা করেছেন।

'বিবর্তনে'-এ সমাজসেবী দেশপ্রেমিক অনিমেষ জেল থেকে মুক্তি পেয়ে মনীষার হাত ধরে নিজের কাছে টেনে এনে শাস্ত্রীয় বিবাহ মন্ত্রের বাংলা ভাষ্যটি উচ্চারণ করে—"আমার হৃদয় যখন তোমার হয়েই গেছে, তখন তোমার হৃদয়ও আজকে আমার হোক, তুমি আমার চিত্তকে শুধু অধিকার করনি, সম্পূর্ণরূপেই জয় করেছো।" নীলিমা, কমলা, শান্তি, মনোরমা, ব্রজরানী, সুলেখা, উর্মিলা, মন্দাকিনী, ধীরা, তড়িতা, বীণা প্রভৃতি নারীরা বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছে এরা সতী, সাবিত্রী, সীতার ঐতিহ্যের বাহক। তাই তারা পুরাণের নারী চরিত্রের মধ্যে ঐকাত্ম্য অনুভব করেছে। নারী চরিত্রে বিবর্তন নেই—আ'ছ পুনরাবৃ'ত্ত।

অনুরূপা দেবীর উপন্যাসগু'লর প্রধান ও অপ্রধান চরিত্রগুলির মধ্যে সংখ্যা-গরিষ্ঠ বর্ণ হিন্দু। চরিত্রগুলি বিশেষ কোন স্থান কালের উপর ভর করে নেই। তারা দাঁড়িয়ে আছে ইতিকথা, পুরাণ ও তত্ত্বের উপর ভর করে। তাই স্থানিক কোন বৈশিষ্ট্য, ভৌগোলিক পরিচয় লক্ষ্য করা যাবে না। 'মা' উপন্যাসের ঘটনাস্থল ভাগলপুর, বর্ধমান ও কাশীধাম। পোষ্যপুত্র-এর স্থান ব্রজধাম, লক্ষ্মীপুর, কলকাতা, মাদ্রা ও কাশীধাম। বাগদত্তা, গরীবের মেয়ে, চক্র, মন্ত্রশক্তি উপন্যাসের ঘটনাস্থলও একাধিক। 'বিবর্তনে'-ই একমাত্র উপন্যাস যার স্থান-চাঞ্চল্য কম। সমাজ-সংস্কার ও পল্লী উন্নয়নের বড় বড় কথা ও কাজের বিবরণ থাকলেও গ্রামের সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ নিম্নবর্ণের মানুষেরা স্থান পায়নি। সমাজের নীচুতলার দু একটি মানুষ উঁকি দিলেও উপন্যাসে এরা আগন্তুক। এদের জীবন জীবিকা, দুঃখ-দারিদ্র্য, মনের অতলের কোন সংবাদ নেই। মানুষকে স্থান কালের সীমার মধ্যে না ধরলে তার সামগ্রিক রূপ পাবো কি করে। অনুরূপা দেবী কি শহর কি গ্রাম কোথাও স্থির হয়ে বসেন নি বলেই তাঁর উপন্যাসে আঞ্চলিক রং লাগেনি। অধিকাংশ চরিত্র তত্ত্ব ও উদ্দেশ্যের ভারে টাইপ হয়ে গেছে। বহু চরিত্রে সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও তারা তত্ত্বের তোতাপাখি হয়ে রইলো।

অনুরূপা দেবীর উপন্যাস ও ছোটগল্পের মুখ্য এবং গৌণ চরিত্রগুলির অধিকাংশই বিবাহিত। তাঁর উপন্যাসে হয় বিবাহ পরবর্তী জীবন উপস্থাপিত হয়েছে নতুবা বিবাহের মধ্য দিয়ে নায়ক ও নায়িকার জীবনের পরিণতি দেখান হয়েছে। অবিবাহিত নারী পুরুষের জীবন হিন্দুধর্মে অনুমোদিত নয়, তাই অনুরূপার উপন্যাসেও তারা অনুপস্থিত। 'মা' উপন্যাসে অজিত কিশোর, তার বিবাহ প্রসঙ্গ না থাকারই

কথা। 'বাগদত্তা'-র মনীশ 'চির-কৌমার' ব্রত গ্রহণ করেছে। 'উল্কা-'র মনু এবং লক্ষ্মী অবিবাহিত। মনু প্রথমাবধিই ধর্মভীরু, আধ্যাত্মিক ধ্যানধারণায় রত। লক্ষ্মী কাশীধাম আশ্রয় করে ভূদেব কথিত 'চির-কৌমার' ব্রত গ্রহণ করেছে। 'চক্র' উপন্যাসে কৃষ্ণা ও ব্যারিষ্টার অবিবাহিত থাকলেও উপন্যাসের শেষে লেখিকা এদের মিলনের ইঙ্গিত দিয়েছেন।

নিরুপমা দেবীর উপন্যাসে নানা বয়সের নানা সমস্যায় জর্জরিত বিধবাদেব মিছিল দেখতে পাই। অনুরূপা দেবীর উপন্যাসে বয়স্কা নতুবা বৃদ্ধা বিধবার ঠাঁই থাকলেও বাল্ বা যুবতী বিধবার কোন সমস্যা নেই। তিনি মনে করতেন বৈধব্য অর্থ নারী জীবনের কামনা বাসনার শেষ। তিনি বিধবাদের জন্য হিন্দুধর্মের অনুশাসন অনুযায়ী নিয়ম-মাফিক নৈষ্ঠিক জীবন নির্দিষ্ট করেছেন। বিধবার চিত্ত চাঞ্চল্য সমাজ চাঞ্চল্যেরই লক্ষণ। 'মা' উপন্যাসের অপ্রধান চরিত্র মুসলমান ঘরেব যুবতী বিধবা রাবেয়া। মনোরমা রাবেয়াকে বিবাহ করবার জন্য অনুরোধ করলে রাবেয়া বলে,—"তোমার আমার জন্য সব সমাজেই এক বিধান। সেখানে হিন্দু মুসলমানের বিধি ভিন্ন নয়।" যুবতী বিধবা কমলা (বাগদত্তা) হিন্দু বিধবাব নৈষ্ঠিক জীবন যাপন করতে চেয়েছে। যুবতী বিধবাদের কোন সমস্যাই তাঁর উপন্যাসে নেই। অথচ যুবতী ও বাল্ বিধবাদের জীবনে নানা সমস্যা নিয়েই সামাজিক ও পারিবারিক উপন্যাসের জন্ম হয়েছিল। যে সব বিপত্নীকের চরিত্র এঁকেছেন তাদের বয়স পঞ্চাশোর্ধ। যে সমাজে স্ত্রী বর্তমানেই দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করা যায় সেখানে বিপত্নীকে চরিত্রের আপাতসমস্যা কোথায়?

চরিত্রের অন্তরেব গভীরে প্রবেশ করার যে আগ্রহ তা একান্তই মানবিক। ভিতরের মানুষকে আবিষ্কার করাইতো কথাসাহিত্যের মূল প্রয়াস। নিরুপমার অন্নপূর্ণার মন্দিব-এর সতী আর অনুরূপার 'বাগদত্তা'-র কমলার জীবন-সমস্যা এক। তারা জীবনে ভালবাসলো একজনকে, বিবাহ হল আর একজনের সঙ্গে। সতীর নৈকষ্য কুলীনের সাথে নামে মাত্র বিবাহ হল। কিছুদিনের মধ্যে বিধবাও হল। তার সমস্ত সত্তা জুড়ে বসে বিশ্বেশ্বর। তার জন্যই একদিন আত্মহত্যা করতে হল। কমলা ভালোবাসলো মনীষকে, বিবাহ হলো শচীন্দ্রের সঙ্গে। সেও বিধবা হল, কিন্তু নৈষ্ঠিক বৈধব্য জীবনকেই সে অবলম্বন করতে চাইলো। 'মন্ত্রশক্তি'-র বাণী, সতী সাবিত্রী হবার সাধনা করলো কিন্তু মানবী হবার যোগ্যতা সে অর্জন করলো না। অনুরূপা দেবীর উপন্যাসগুলির বিষয়বস্তু, চরিত্র ও ভাষার মধ্যে পুনরাবৃত্তি ঘটায় শিল্পী সত্তার বিবর্তন হয়নি।

এবার আমরা আমরা অনুরূপা দেবীর উপন্যাসগুলি থেকে কিছু সংলাপ প্রবচন ও শব্দ তুলে ধরবো যা একান্তই বাঙালী নারীর ঐকান্তিক সম্পদ। তাঁর ভাষা নারীর, মেজাজ পুরুষের। এই বিরোধের ফলে তাঁর উপন্যাসের রস বিপর্যস্ত হয়েছে।

সংলাপ :—

* বাঁজা তালগাছ নিয়ে আমি কি করবো। (স্মৃতি-বিস্মৃতি)
* আ আমার পোড়া কপাল এমন করে কি থাকতে আছে।
* ও সুকু, দেখছিস একবার আমার বৌমার আক্কেল খানা! এই আমি রক্ত উঠে খেটে খেটে মরে যাচ্চি আর উনি আমার গুরুমা সেজে বসে পশম বুনছেন,……ছি! ছি! ঘেন্নায় মরি মা, ঘেন্নায় মরি।" (অকৃতজ্ঞতা)
* অমন মেয়ের আবার বে দেওয়া কেন গাঁয়ের চৌকিদার করে দিতে হয়।
* থাম্, আবাগি থাম আমায় অমন করে পোড়াসনে। (বাগদত্তা)

একজন স্বামী সোহাগিনী রূপসী ঠোঁট উল্টে জবাব দিল—

* যা বলিস, আর যাই কোস্ বোন। আমি বাবা হক কথা বলবো। রূপো যতোই সিন্দুকে ঠাসা থাক, কি মেয়ে কি পুরুষ অঙ্গে যদি একটু রূপই না রইলো তা সকলি বেরথা। (গরীবের মেয়ে)
* ওলো বৌ, মেয়েটার পাতা চাপা কপাল লো। কেমন মদনমোহন বর জুটেছে দেখ। (ঐ)
* নিত্যি নিত্যি রাত উপোসি থাকিসনে মা। কচি ছেলের মা এতে ছেলের অকল্যাণ হয়। (পোষ্যপুত্র)
* কে জানে বাছা আমার অত সাত কুটুমের খবর রাখার অবসর নেই, যাদের রস পড়ছে তারা করুক গিয়ে।
* মা মাগীর মেয়ের জন্য রস অমনি চাগিয়ে উঠলো। (মা)
* ছেলে আমার মনে করলেন, বাবা বুঝি বিয়ে দেবেনই না, নিয়ে এলেন ক্রম্ করে ডোমের চুবড়ি ধুয়ে। (মা)
* আমি বাঁজা-খাজা মানুষ আমার আবার অসুখ কি করবে। (মা)
* কেমন আর আছি দাদা। দেখচোই তো দথড়া গাছির কুড়ুলের মত আধ-পোতা হয়েই রইলুম। বাঁচবোও না, মরবোও না, শুধু তোমাদের জ্বালাবো। (ঐ)

প্রবাদ প্রবচন :—

* সতী লক্ষ্মীর চোখের জল।

* পরের বাড়ী হবিষ্যি।
* হুলো হুলো কুলো কুলো হয়ে যেও।
* কেঁচো খুঁড়তে শেষে সাপ বার হবে।
* মাকড় মেলে ধোকড় হয়, চালতা খেলে বাকড় হয়।
* ছুঁচোর গোলাম চামচিক্কা তার মায়না চোদ্দ সিক্কা।
* যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর।
* বিষের সঙ্গে খোঁজ নেই, কুলোপনা চক্কর।
* যার শিল তার নোড়া তারি ভাঙ্গি দাঁতের গোড়া।
* চাল না চুলো—ঢেঁকি না কুলো।
* কূট কচালে বুদ্ধি।
* হাড়ে ভেল্কি খেলে।
* যেন ছ' কান না হয়।
* আলিসিতে শরীর যেন মাটি মাটি করতে লেগেছে।
* জাঁহাবাজ শহুরে মেয়ে।
* মিটমিটে ডান।
* বউ মানুষ না গোরার সর্দার।
* পেটে পেটে বুদ্ধি হাড়ে হাড়ে বজ্জাতি।
* শরীর পাত করে মরা।
* হুদো হুদো মিন্‌সে গুলো।
* এঁড়ে গরুকে টেনে দোহান।
* পেটে খিদে মুখে লাজ।
* হায় বিধি পাকা আম দাঁড় কাকে খায়।
* অল্প শোকে কাতর, বিস্তর শোকে পাথর।
* বড় কল্লেন পেটের পো, আর করবেন নাতি।
* আপন দুঃখ অসম্বরি, পরের দুঃখ সইতে নারি।
* যার বে তার মনে নেই, পাড়া পড়শীর ঘুম নেই।
* মেয়ে যেন ঘোড়ার নাচ নাচ্‌ছেন।

শব্দ :—

ঠাহর, পরের আপদ, পোয়ান, ছুরকোট, একরত্তি, ডাইনে চোবা, পরবাই, কচিকাচা, সেয়ানা, তরিবৎ, আপদ বালাই, ন্যাকা মেয়ে, আদা-কাঁথায়, জোয়াতে,

চিত্তির, হাবাতে ঘরের মেয়ে, সর্বরক্ষে, মুখে চুনকালী, কুঁদুলে মাগী, আইবুড়, দুধের ছেলে, মুখ পোড়ান, সো(সোহাগী), আক্কেল খেকো, ঘুরন্তি পোড়ান্তি, অর্শায় (স্পর্শায়), ন্যাকাসাজা, আ মেখলে, নিরম্বুউপসী, খুনসুটি, পোড়ার মুখী, মুখে আগুন, ছাপোষা, খোয়ার, ধেড়ে খিঙ্গী, গসগসানি (গজ গজ করা), পরদোয়ারী, পরভাতি, পরঘরি, হাড়-হাভাতে, লক্ষ্মীছাড়া, পিত্যেশী (প্রত্যাশী) বে-আক্কেলী, চওয়াটে, যত্ন-আত্তি, দিন দরদ, হাবি (বোকা), বত্ত (ব্রত), রাত-ভীত, নালিশ, ফরেজ, বুড়ো-টকি, দেসাক, ভস্ব তাবাস্, গত্তি (গতর), সোমত্ত মেয়ে, বউ-কাটকী, ভাতের কাঁড়ি, চিনির টাকনা, ছাই-পিণ্ড, গেলা (খাওয়া), ছিরি, ঠ্যাকারে, শুঁটকী, গেরো (গ্রহ), কোলখালি, পাঙ্গস রং, বালাই ষাট্, খ্যাঁড়ার মুড়ি।

নিরুপমা দেবী

নারী জীবনের যে সব অধিকারবোধ দেখা দিয়েছিল নব্য হিন্দুয়ানি তা নস্যাৎ করে দিয়ে পুরাতন ব্যবস্থায় ফিরে যাবার জন্য উগ্র মতবাদ গড়ে তুলেছিল। প্রথমে স্বামী বিবেকানন্দ এবং কিছু পরে মহাত্মা গান্ধী হিন্দুধর্ম এবং সমাজসংস্কার আন্দোলনকে আত্মচারণের ও বিবেচনার মধ্যে ফিরিয়ে আনেন। রামকৃষ্ণ কোন অর্থেই সমাজসংস্কারক ছিলেন না। সে সময়কার সমাজসংস্কার আন্দোলন সম্বন্ধেও তাঁর কোন রকম উৎসাহ দেখা যায় না। কিন্তু পরিবার ও সমাজে নারীর কর্তব্য ও দায়িত্ব নিয়ে নানা প্রসঙ্গ তাঁর কথামৃতে এসে পড়েছে। তিনি মনে করতেন এ জগতের সমস্ত নারীই শক্তির আধার। পতিতা নারীও তাঁর কাছে জননী। রামকৃষ্ণের দার্শনিক তত্ত্বকথা হয়ত সবাই বুঝতে পারত না। কিন্তু তাঁর শিষ্যরা সবাই নারীকে সম্মান করতে শিখল। শ্রীশ্রী সারদা দেবীর পুতঃপবিত্র চরিত্র নারীদের সম্বন্ধে নূতন ধারণা গড়ে তুলতে সমর্থ হল। নিবেদিতা সে কাজটা আরও ত্বরান্বিত করেছিলেন। রামকৃষ্ণের মুখে 'কামিনীকাঞ্চন' কথাটা বহুবার শোনা গেছে। স্বামী নিখিলানন্দ এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, "By it he meant only, lust and greed," রামকৃষ্ণ মনেপ্রাণে নারীমুক্তি আন্দোলনকে সমর্থন করেছিলেন বলেই তিনি বিদ্যাসাগরকে এত পছন্দ করতেন। বিবেকানন্দ সমকালের তরুণ সমাজের প্রাণপুরুষ ছিলেন।* সমাজসংস্কারের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে তিনি বলেছিলেন "তোমাদের মেয়েদের প্রথমে শিক্ষা দান কর, তারপর তাদের আত্মনির্ভরশীল হতে দাও, তা হলে তারাই বলবে তাদের কি ধরনের সংস্কার প্রয়োজন। তাদের

সংক্রান্ত ব্যাপারে তোমরা কে হে বাপু?"[২৭] তিনি নারীদের শিক্ষা অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সহবাস সম্মতি আইন সমর্থন করতেন। বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের বিরোধী ছিলেন। পাশ্চাত্য ভাবধারায় পুষ্ট। ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিতের দল ও নব্য হিন্দুয়ানির প্রবক্তরা হিন্দুধর্মের আচার আচরণ, গার্হস্থ্যজীবন, নরনারীর প্রেম প্রভৃতি নিয়ে একদিকে যেমন প্রবল সামাজিক আন্দোলনের ঝড়ো হাওয়া তুলেছিলেন ঠিক সেই সময় পত্রপত্রিকায় নারীরাই তাদের বক্তব্য বলিষ্ঠ ভাবে রাখতে লাগলেন। বিভিন্ন দলের তর্কের বিষয় ছিল নারীদেব শিক্ষা, পোশাক-পরিচ্ছদ, গৃহস্থালী, প্রণয়, নারী পুরুষের সম্পর্ক, সমাজ ও নারীর সম্পর্ক, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা প্রভৃতি। সামাজিক এই আন্দোলনের মধ্যে অন্তরালবর্তিনীদের অনেকেই প্রকাশ্যে সমাজেব সর্বত্র অংশ গ্রহণ করতে আরম্ভ করেছেন। নারীরা যেমন অর্জিত অধিকার ত্যাগ কবে পিছনে ফিরতে চাইলো না তেমনি আবার উগ্র স্বাতন্ত্র্যও কামনা করলো না। তারা পুরুষের প্রতিদ্বন্দ্বী না হয়ে পরিপূরক হতে চেয়েছিল। এ যুগেব নারীরা উপলব্ধি করেছিল অন্তঃপুর তাদের যথার্থ স্থান। 'অন্তঃপুরকে সুন্দর করাই বমণী জীবনের প্রধান ব্রত। অন্তঃপুর সমাজ শরীরের হৃদয় যন্ত্র স্বরূপ।'[২৮] নাবীমুক্তি আন্দোলন এতদিন পুরুষের দ্বারা চালিত হওয়ায় কিছুটা লক্ষ্যভ্রষ্ট না হলেও বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। মহিলারা মধ্যপন্থা বেছে নিলেন। "স্ত্রীজাতি নিত্য অবরুদ্ধা অশিক্ষিতা থাকিতেন তৎসাময়িক কোন প্রকৃষ্ট আদর্শ ছিল না, সেই নেতৃবর্গের সম্মুখে একমাত্র শিক্ষিতা ইংরাজি রমণীর নবীন আদর্শ জাজ্বল্যমান রূপে প্রতিভাত হইয়াছিল, সুতরাং তাহারি অনুকরণ করিতে তাঁহারা বাধ্য হইয়াছিলেন—নবীনতাব মোহ বড় কম নয়। তাই দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনা অপেক্ষা না করিযা ইংরাজী অনুকরণে যে শিক্ষার আরম্ভ হইয়াছিল অধুনা মহিলাগণের বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষায় পুরুষের প্রতিযোগিতায় তাহার চরম পরিণতি হইয়াছে।...... আজ সকলকেই স্বীকার করিতে হইতেছে যাহা আশা করা গিয়াছিল তাহা হয় নাই।.....সর্বাঙ্গ সুন্দর শিক্ষা তাহাকেই বলা যায় যাহাতে প্রত্যেক স্ত্রী স্বামীর গৃহিণী, সচিব, সখী ও প্রিয় শিষ্যা হইতে পারে। কিরূপ শিক্ষা হইলে এই পূর্ণ আদর্শের অনুরূপ চরিত্র গঠিত হইতে পারে এবং আধুনিক শিক্ষা প্রণালীতে কোন অসামঞ্জস্য বর্তমান থাকায় ইহা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে কিনা তাহা বিবেচ্য।"[২৯]

নারীদের অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্র ক্রমশই প্রসারিত হচ্ছে। ব্যক্তি স্বাধীনতা, পারিবারিক আদর্শ, সামাজিক আদর্শ, রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণা প্রভৃতির সঙ্গে পূর্বেই সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। জগৎ ব্যাপারের সঙ্গে কায্য কল্যাণব্রতে যুক্ত হবার

আকাঙ্ক্ষা দেখা দিয়েছে। 'ভগিনী' সমাজ-এর মুখপত্র 'বালিকা'-তে লেখা হল— "প্রত্যেক জীবনের ভবিষ্যতের আহ্বান দুইভাবে বিভক্ত করিয়া বলিতে চেষ্টা করিব। প্রথমে জীবনগঠন, দ্বিতীয়ত জগতের জন্য আত্মবিসর্জন।"[৩০] মহিলারা যে নতুন যুগের দ্বার খুলে নতুন জীবনের ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছেন সে বিষয়ে তাঁরা খুবই সচেতন। "বিলীয়মান যুগের সহিত আমাদের অন্তঃপুর হইতে আর যে দুইটি বৃহৎ অশুভ বিদায় গ্রহণ করিতেছে, তাহা কলহপ্রিয়তা ও পরনির্যাতনেচ্ছা। আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, আমাদের পিতামহীগণ উদার সহানুভূতির যেরূপ কার্পণ্য প্রকাশ করিয়াছেন, আমাদের বর্ত্তমান নবীনা ভগিনীগণ সেরূপ করেন নাই।"[৩১] বাঙালী রমণীদের পোশাক-পরিচ্ছদ নিয়ে এতদিন পুরুষেরাই বাদানুবাদ করছিলেন। নারীরা কোনরকম অনুকরণকেই প্রশ্রয় দিতে রাজি নয়। "এ দেশে ইংরাজ জাতির আগমন ও তাহাদের সহিত মেলামেশার দ্বারা যে কেবল আমাদের পতিপুত্র ভ্রাতাগণই কোট্-প্যাণ্টলুন ব্যবহার করিতে শিখিয়াছেন, তাহা নহে, আমরাও নানা প্রকারের সেমিজ, পেটিকোট, বডি, জ্যাকেট ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছি। ইতিপূর্বে আমাদের জাতির এমন কোন স্ত্রী-পরিচ্ছদ ছিল না তাহা পরিধান করিয়া আত্মসম্মান রক্ষা করা যাইতে পারিত। বোধহয় সেইজন্যই অনেক ভারত মহিলা ইংরাজ মহিলাদের পোষাক বিধান করিয়াছিলেন। ইংরাজ ও বাঙালীর শক্তিতে যেমন প্রভেদ গাউন ও শাড়ীর শক্তিতে তেমন পার্থক্য আছে।"[৩২] উদ্ধৃতির সংখ্যাধিক্যের কারণ নারীসূক্তামৃতে আলোচ্য পর্বের নারীর মানসিক বলয় রেখা রচনা করা।

বিংশ শতকের প্রথম পর্বে আবির্ভাব ঘটেছে অনুরূপা ও নিরুপমা দেবীর। দুজনের ব্যক্তিগত সম্পর্ক বড়ই মধুর ছিল। সাহিত্য রচনায় দুজনেই একই স্থান থেকে যাত্রা আরম্ভ করলেও পথপরিক্রমার পর দুজনের অভিজ্ঞতার ফসল কিন্তু সম্পূর্ণ পৃথক। দুজনের মানসগঠন ও দৃষ্টিভঙ্গীই আলাদা। অনুরূপা হিন্দুয়ানির উচ্চ আদর্শবাদ দ্বারা চালিত। নিরুপমা ভাগলপুরের শরৎচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত সাহিত্য চক্রের অন্যতমা লেখিকা। শরৎচন্দ্রের তিনি শিষ্যা। পরবর্তীকালে শরৎচন্দ্রই তা স্বীকার করেছেন। 'সে বাস্তবিকই ভাল লেখে। সে আমার ছোট বোনও বটে, ছাত্রীও বটে।'[৩৩] নিরুপমা জীবনকে তার স্বরূপ ও সত্যে দেখতে চেয়েছেন। জোর করে জীবনকে কোথাও হওয়াতে চাননি। আদর্শ তাঁর ছিল, হিন্দুয়ানীর পবিত্র ফুলচন্দনের গন্ধ তাঁর রচনাতেও পাওয়া যাবে। তবে তা কোথাও আরোপিত নয়। শরৎচন্দ্র 'নারীর লেখা' নামক নিবন্ধে 'অন্নপূর্ণার মন্দিরের' ত্রুটিবিচ্যুতি

নিয়ে আলোচনা করলেও অন্যত্র অকপটে বলেছেন,—'অনেক সময় এবং বেশীর ভাগ সময়ই আমার চেয়েও তাঁর লেখা ভাল বলেই মনে হয়।'[৩৪]

উপন্যাস সমাজ ও সংসারের ঘটনাকে যত বেশী করে স্বীকার করে নেবে, স্থান-কালের আত্মীয়তা যত গভীর ভাবে অনুভব করবে ততই উপাদেয় হয়ে উঠবে। উপন্যাস ও ছোটগল্পে আঞ্চলিকতার মূল্য অধিক স্বীকৃত। আঞ্চলিকতা উপন্যাসকে বাস্তব করে তোলে। অনুরূপা দেবী উপন্যাসে বাঙালী ঘরের কথা বলতে চেয়েছেন। তবে তা সব সময় বাঙলার মাটির স্পর্শ পায়নি। নায়ক-নায়িকারা ঘন ঘন স্থান পরিবর্তনে মধ্যে লেখিকার বিস্তৃত ভৌগোলিক জ্ঞানের পরিচয় থাকলেও তা কোন বিশেষ জনপদের কাহিনী-হতে পারেনি। অনুরূপা দেবী তাঁর উপন্যাসে ঘটনা সংস্থাপনে কাহিনী-গ্রন্থনায় বা চবিত্র চিত্রণে বাহ্য তত্ত্ব কথাকে অধিক প্রাধান্য দিয়ে ঘটনা ও চরিত্র বিশ্লেষণের অভাব পুষিয়ে নিয়েছেন। বিশেষ স্থানের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের প্রবেশের ইচ্ছা না থাকায় বিবিধ স্থানের বিচিত্র সৌন্দর্য উপস্থাপন করে শিল্পবোধের স্থূলতার কাছেই আত্ম বিকিয়ে দিয়েছেন। নিরুপমার নায়ক-নায়িকাদের গতিবিধি অনেক সময়ই অঞ্চলকে অতিক্রম করেছে। কিন্তু যে স্থানে উপন্যাসের ঘটনার সূত্রপাত সেই স্থানই প্রাধান্য পেয়েছে। বাংলার ভূগোলের গভীর পরিচয়টি তিনি কখনও ভোলেননি। ঢেকিশাল, গোয়াল ঘর, গ্রামের মাটির দাওয়া, কর্দমাক্ত পথ, মজা পুকুর, জীর্ণকুটীর, ধানভানা, ক্ষেতখামার, নদী, জঙ্গল এবং জনপদের সাথে রয়েছে অচ্ছেদ্য ভাবে বাঙলার মানুষের নানা পরিচয়। গ্রামের দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবার, সম্পন্ন গৃহস্থদের শহরমুখীনতা, গ্রামীন অর্থনীতির ভাঙন, সামাজিক সংস্কার, ইংরাজী শিক্ষার প্রতি মোহ, প্রাচীনদের সংস্কৃত শিক্ষার প্রতি আকর্ষণ, গ্রামের মানুষের সরল বিশ্বাস, রোগ-ভোগ-শোক প্রভৃতি নিরুপমা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে চিত্রিত করেছেন।

নিরুপমা দেবীর উপন্যাসের বিষয়বস্তু পল্লীসমাজ। প্রথাসর্বস্ব নিষ্ঠুর হৃদয়হীন সমাজের ঔদাসীন্যকে চিত্রিত করলেও তিনি বিশ্বাস করতেন সমাজ সব সময় পূজনীয়। নারী দয়া, প্রেম, মায়া, ত্যাগ ও সেবা প্রভৃতি দিয়ে পরিবার ও সমাজকে বাসযোগ্য করে রাখেন। 'অন্নপূর্ণার মন্দির' 'দিদি', 'বিধিলিপি' 'শ্যামলী' 'উচ্ছৃঙ্খল' 'দেবত্র' এবং 'আমার ডায়েরী' উপন্যাসের কাহিনী পল্লীজীবনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। নায়ক নায়িকারা শহরাঞ্চলে জীবনের কিছু অংশ কাটালেও জীবনের মূল আকর্ষণ কিন্তু গ্রাম। এ হল শরৎচন্দ্রীয় নসটালজিয়া। শরৎচন্দ্রের 'বিরাজ বৌ' 'মেজদিদি' 'রামের সুমতি' 'পল্লীসমাজ' 'বড়া' বামুনের মেয়ে' 'দেনা-পাওনা' প্রভৃতি উপন্যাসের

পটভূমিকাও গ্রাম বাংলা। নিরুপমা দেবী শরৎচন্দ্রের মত যৌথ পরিবার, কৌলীন্য, বাল্যবৈধব্য, সামাজিক নির্যাতনের চিত্র আঁকলেও অচলা, কিরণময়ী, মৃণাল, বা সুরবালার চিত্র আঁকেননি। সমাজ শাসনের বাইরে যারা চলে গেছে, তাঁর সাহিত্যে তারা স্থান পায়নি। 'আলেয়া' গল্পের সন্ন্যাসী-যোড়শী পার্বতীকে দেখে উপলব্ধি করলে—'এই নারী যেখানে চরণ পাত করিবে, সেখানে গৃহ আপনি গড়িয়া উঠিবে।' এ সত্যটি নিরুপমার সব নারী চরিত্রেই প্রযোজ্য। তিনি প্রেমকেই নারী জীবনের শেষ সত্য বলে মনে করতেন। শরৎচন্দ্রের জীবনের অভিজ্ঞতার ব্যাপ্তি তাঁর উপন্যাসের চরিত্রগুলিকে বিচিত্র সমস্যার সম্মুখীন করেছে। রক্ষণশীল পরিবারের বিধবা রমণী নিরুপমার জীবনে সে সুযোগ কোথায়?

নিরুপমা দেবীর উপন্যাসে গার্হস্থ্য জীবন সমস্যাই প্রাধান্য পেয়েছে। সমাজ ও ব্যক্তির বিরোধের মধ্যে সমাজ প্রাধান্যই বড় হয়ে উঠেছে। শরৎচন্দ্রের মত তাঁর উপন্যাসে ট্রাজেডী নারীর। তিনি নারীর প্রেম, তার সংসার জীবনকে অনুরূপার মত আদর্শান্বিত করেননি। যা সচরাচর জীবনে ঘটে তিনি তারই কথাকার। সতী, কমলা, মীরা, ইলা, করুণা, নীরজা প্রভৃতি চরিত্রের প্রেম কোথাও সোচ্চার নয়। এদের হৃদয় বেদনা বা বাসনার প্রকাশ চকিৎ। এদের জীবনে প্রেম তর্ক বা সংগ্রামের বিষয় নয়, আত্মদহনের উপায় মাত্র। 'প্রায়শ্চিত্ত' গল্পে মোহিত বিধবা নীরজাকে বিবাহ করেছিল। মৃত্যুকালে তার প্রশ্ন "এ বিবাহ সিদ্ধ কি? তুমি আমার কি?" এ প্রশ্নের সমাধান নীরজা খুঁজে পেল না। নবকিশোরবাবু নীরজা এবং তার কন্যাকে বুকে টেনে নিয়ে বললেন, "সেই তোর স্বামী, সেই তোর বিয়ে"। পুরুষ শাসিত সমাজে এছাড়া অন্য সমাধান নিরুপমা কল্পনা করতে পারেননি। শরৎচন্দ্রের 'অনুপমার প্রেম' এর অনুপমার সঙ্গে অন্নপূর্ণার মন্দিরের 'সতী'র সাদৃশ্য যতখানি বৈসাদৃশ্য তার চেয়ে অনেক বেশি। অনুপমা ও ললিত মোহনের মিলনের মধ্যে অতি নাটকীয়তাকে প্রশ্রয় দেওয়া হল। সতী আত্মদহনের পরিণতিরূপে আত্মহত্যার পথকে বেছে নিয়েছিল। দারিদ্র্য এবং পরমুখাপেক্ষিতা সতীর জীবনকে বিবর্ণ এবং ম্লান করে দিয়েছিল। সতীর মত ব্যক্তিত্ব অনুপমার ছিল না।

নিরুপমার গ্রামের প্রেক্ষাপটে রচিত উপন্যাসে যৌথ পরিবারের চিত্র প্রাধান্য পেয়েছে। গ্রাম ও শহর দুই তার সাহিত্যে স্থান পেয়েছে। কিন্তু প্রাধান্য পেয়েছে গ্রাম বাংলা। গ্রামের যৌথ পরিবার ভাঙছে আর ভাঙছে। শহর গ্রামের মানুষগুলোকে নানা প্রলোভন দেখিয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। শহর-ফেরৎ মানুষগুলো গ্রাম্যজীবনে নানা আন্দোলনের তরঙ্গ বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। অন্নপূর্ণার মন্দিরের

সত্তী শিক্ষা দীক্ষা না পেলেও জীবনের সব কিছুকে বিশ্বাস ও ভক্তি দিয়ে মেনে নিতে পারেনি। নিরুপমার জগৎ অনুরূপার চেয়ে সংকীর্ণ হলেও তা গিরিখাতের মত গভীর ও রহস্যময়। অভিজ্ঞতার গণ্ডী সংকীর্ণ হলেও তার পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা অধিক। সাধারণভাবে লেখিকাদের ক্ষেত্রে যা সত্য, নিরুপমাব ক্ষেত্রে তা বিশেষভাবে সত্য। "পরিধি সংকীর্ণ হইলেও তাঁহাদের পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা অধিক। অথবা পরিধি সংকীর্ণ বলিয়াই তাহাদিগের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, কেননা ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতর সর্বদা আবদ্ধ থাকিলে পর্যবেক্ষণশক্তির অসাধারণ সূক্ষ্মতা জন্মে। এই জন্যই অবরোধ-বাসিনী নারী সুযোগ পাইলে ঘোমটার ভিতর এক নিমেষের চাহনিতে যতটা দেখিয়া লয়েন পুরুষ হাটেবাজারে বাহির হইয়াও তাহার শতাংশের একাংশও পারে না। এই তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণশক্তির সহিত সূক্ষ্ম বিশ্লেষণশক্তি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সুতরাং এ বিষয়ে স্ত্রীজাতির অনন্যসাধারণ নৈপুণ্য আছে। বিশেষতঃ স্ত্রীলোক স্ত্রীলোকের চরিত্র বৈচিত্র্য, হৃদয় রহস্য, যেরূপ সত্য ও সহজ ভাবে অঙ্কিত করিতে পারিবে, পুরুষের পক্ষে সেরূপ পারিবার কথা নহে।"[৩৫] নিরুপমা দেবীর পল্লীজীবনের মধ্যেই তাঁর প্রতিভার যথার্থ ক্ষেত্র খুঁজে পেয়েছিলেন। বাংলা সাহিত্যে পল্লীজীবন অনেকেরই কথাসাহিত্যের উপজীব্য। বিশেষ করে শরৎচন্দ্রর পল্লীজীবন কথা নানা সমস্যার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখাব চেষ্টা হয়েছে। তবে প্রাধান্য পেয়েছে সামাজিক সমস্যা। নিরুপমা দেবীর উপন্যাসে পল্লীর সমস্যা উপস্থাপিত হয়েছে নারীর দৃষ্টিতে নারীর সমস্যা।

নিরুপমার প্রথম উপন্যাস 'উচ্ছৃঙ্খল' হলেও প্রথম সার্থক উপন্যাস 'অন্নপূর্ণার মন্দির' (১৯১৩)। নিরুপমার সব উপন্যাসই সামাজিক। তিনি অনুরূপার মত ঐতিহাসিক বা ইতিহাস-আশ্রিত উপন্যাস লেখেন নি। অবশ্য দু'জনেই প্রথম জীবনে কবি ছিলেন। পরে দু'জনেই ঔপন্যাসিক হয়েছেন। উভয়ের প্রতিভার সম্যক বিকাশ ঘটেছে উপন্যাসের মধ্যে। তাই তাঁদের উপন্যাসকেই কেবলমাত্র আমাদের আলোচনায় গ্রহণ করা হয়েছে। 'অন্নপূর্ণার মন্দিরে' কৌলীন্য প্রথা, বৈধব্য, নারীর হৃদয়ের গুপ্তপ্রেম, ভাঙনমুখী গ্রামের ব্রাহ্মণ পরিবার, তার দুঃখদুর্দশা এবং ভাঙনের চিত্র চিত্রিত হয়েছে। পারিবারিক জীবনের মূল্যবোধগুলি ভাঙছে, লেখিকা গভীর মমত্ববোধের সঙ্গে তা লক্ষ্য করেছেন এবং মধুর বেদনারসে সিক্ত করেছেন পল্লীবাংলার মানুষগুলোকে। বোহেমিয়ান শরৎচন্দ্র নিজেও কোথাও ঠাঁই পাননি, চরিত্রদেরও সুস্থির হয়ে ঘর গৃহস্থালীর দৈনন্দিন জীবন সমস্যার দিকে যেতে দেননি। নিরুপমার চরিত্রগুলি ঠিক তেমন নয়। তাদের ঠিকানা ঠিকই

আছে, কেবল বাসস্থান মাথার উপর ভেঙে পড়েছে। নিরুপমা দেবীর উপন্যাস শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের পাশে রেখে পড়লে উনিশ শতকের শেষ ও বিংশ শতকের প্রথম পাদের বাঙলার সমাজের বাস্তব চিত্র ধরা পড়বে। ইংরাজী শিক্ষা এবং অর্থ নৈতিক সমস্যা কি করে পল্লীবাংলার জীবন স্বাচ্ছন্দ্যকে ধ্বংস করছে, এক অর্থে বাঙালীর সামাজিক ইতিহাসও বটে। ম্যালেরিয়া কালাজ্বর প্রভৃতি ব্যাধি পল্লীবাংলার শান্ত শ্রী ও নিশ্চিন্ত আশ্রয় বিধ্বস্ত করে দিচ্ছে। অবশ্য এ চিত্র রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রে বিরল নয়। কিন্তু তার মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে। নিরুপমার এগুলির মধ্য সমাজ পরিবর্তনের নিশ্চিত ইঙ্গিত নেই, রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ, হালদার গোষ্ঠীতে যেমন আছে। নিরুপমা পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেননি, শুধু ট্রাজেডীর বিবরণ দিয়েছেন।

'দিদি' (১৯১৫) উপন্যাসে বহুবিবাহের চিত্র উপস্থিত করেছেন। "নিরুপমার উপন্যাসে নারীরা বাৎসল্যের ও ত্যাগের মহত্তম পরিণামে সার্থক করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।"[৩৩] বালবিধবা উমা উপন্যাসটিতে আগন্তুক কিন্তু কাহিনীর মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করেছে। 'শ্যামলী'তে (১৯১৮) প্রেম যেমন নারীত্বের জাগরণ ঘটিয়ে বোবা শ্যামলীকে মাতৃত্বে এবং সামাজিক দায়িত্বে প্রতিষ্ঠিত করেছে তেমনি 'আলেয়া'-তে নারী কেবল মোহ সৃষ্টি করে না মাধুর সঞ্চারও করে। তাই তো সম্ভব হয় নারী পুরুষের সৃজিত সংসার। 'দেবত্র' (১৩৩৪) উপন্যাসে এসে নিরুপমা দেবীর জীবনভঙ্গির পরিবর্তন দেখা গেল। নারী পুরুষ অর্থকরী বিদ্যার দিকে ঝুঁকে পড়ছে। নারীরা অর্থ নৈতিক স্বাধীনতা কেবল চাইছে না অর্জন করছে। মীরা ধনীর দুলালী হয়ে থাকেনি, নগরীর অসংখ্য ঘর্মাক্ত মানুষের সে সহোদরা। জীবন সংগ্রামে সে চোখের জলকে সম্বল করেনি, করেছে আপন শক্তি ও সামর্থের উপর। শরৎ-রবীন্দ্রনাথের ধারার সঙ্গে নিরুপমার সাহিত্য সৃষ্টি মিলে গেল।

॥ ২ ॥

নিরুপমা দেবী বাঙলার নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ পরিবারের কন্যা। পিতা সাব জজ্ হলেও পরিবারটি ছিল রক্ষণশীল। শরৎচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত 'ছায়া' পত্রিকার পরিচয় দিতে গিয়ে বিভূতিভূষণ ভট্ট লিখেছিলেন—"লেখক অনেকগুলি, লেখিকা মাত্র একটি। তিনি আর কেহ নয়, আমারই অন্তঃপুরচারিণী বিধবা ভগ্নী শ্রীমতী নিরুপমা। ইনি আমাদের সকলের দৃষ্টিপথের অন্তরালে থাকিয়াও আমাদের বন্ধুবর্গের একান্ত আপনার ছোট বোনটিই হইয়াছিলেন। ইঁহার তখনকার লেখা কবিতা বা প্রবন্ধ

যাহা আমাদের সভার জন্য লিখিত হইত তাহা আমাকেই সভায় পাঠ করিয়া শুনাইতে হইত এবং সভার মতামত আমাকেই বাড়ী গিয়া শুনাইতে হইত।" স্বয়ং নিরুপমাও 'শরৎ দাদা' নিবন্ধে লিখেছেন, "আজ তাঁহার শ্রাদ্ধতিথির কথা মনে পড়িতেছে। যাহাতে তিনি আমাদের পূর্ণমাত্রায় অবরোধ প্রথা বিশিষ্ট গৃহান্তঃপুরের মধ্যে আত্মজনের মত প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন।"[৩৮] উদ্ধৃতি দু'টি থেকে দু'টি সত্য উদঘাটিত হল। প্রথম লেখিকা অন্তঃপুরবাসিনী। বাইরের বিশাল জগৎ তাঁর দৃষ্টির আড়ালে থেকে গেছে। দ্বিতীয়টি শরৎ সান্নিধ্যলাভ। নিরুপমার সাহিত্য সাধনা সম্বন্ধে বিভূতি ভট্ট বলেছেন, "প্রায় রান্নাবান্না ঠাকুর সেবা, এই সবের মধ্যে রান্নাঘরে ভাঁড়ার ঘরের মধ্যেই সাধিত হইত।"[৩৯] অতি সাধারণ ও ঘটনা-বিরল জীবন। সামাজিক বিধিনিষেধ মেনে, ব্রত উপবাস করে বাংলার আর দশজন বিধবার মত নৈষ্ঠিক জীবন যাপন করেছেন।

"ইতিমধ্যে আমাদের সমাজে অনেক ভ্রান্ত সংস্কারের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, অনেক প্রচলিত কুরীতি অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে লুপ্তপ্রায় হইয়াছে, অনেক বিষয়ে আমরা সমধিক উদার ও বিবেচক হইতে শিখিয়াছি।......আর যে বিষয়েই সমাজ উন্নতির পথে অগ্রসর হউক না, রমণীগণের মনুষ্যোচিত সুখ, শিক্ষা ও সর্বাঙ্গীন বিকাশে বিধানে স্বার্থখড়্গ এখনো বজ্ররূপে উদ্যত।"[৪০] শিবনাথ শাস্ত্রী ঠিক একই কথা বললেন—"Alas in many parts of the country, people have fallen to such low depths, that a dancing girl receives from them greater honer and attention, than the virtuous ladies of their households while the latter are shamefully neglected inside their houses, their husbands openly associate with the women of this degraded class".[৪১]

এ জাতীয় মন্তব্য রামমোহন থেকে শিবনাথ পর্যন্ত অসংখ্য সমাজ সংস্কারকের মুখেই বারবার শোনা গেছে। তাহলে বুঝতে হবে সমাজ কোথায় দাঁড়িয়ে।

নিরুপমা দেবীর অন্নপূর্ণার মন্দিরের কমলার স্বামী বিত্তশালী এবং পুত্রবান্ হওয়া সত্ত্বেও বিধবা সতীকে 'কদর্য ভাষায় কদর্য প্রস্তাব' করে চিঠি দেয়, পুকুর ঘাটে তাকে একা পেয়ে টাকার লোভ দেখিয়ে দেহ কিনতে চায়। কমলা বান্ধবী সতীর কাছে দুঃখ করে বলে—"ভাই মেয়েমানুষ আর ফুলের মালা সমান। বাসি হলেই মাটিতে গড়াগড়ি। আমাদের আদর ক'দিন?......কিছুরই স্বার্থ আছিলনা, এ এক রকম বেশ আছিল, কিন্তু এ বড় জ্বালা সতী। এখন আমি তোর আমায় তুলনা করে

বুঝেছি, কেবল দুঃখভোগের জন্যই মেয়ে মানুষের সৃষ্টি হয়েছে। সুখ তাদের জন্য নয়। তারা যেন সে আশাও না করে।" (পৃ—৯১)। কমলা স্বামী, পুত্র, বিত্ত সব পেয়েও কচি বয়সে জীবন সম্বন্ধে হতাশাবাদী। সতী জীবনে কিছুই পায়নি। সমাজ তার জীবন, যৌবন নিয়ে যেন ব্যঙ্গ করেছে। পিতার সংসারে সে না চাইলেও তাকে সর্বস্ব সাজতে হয়েছে। বিশ্বেশ্বরকে সে বিবাহের পূর্বেও ভালবাসতো, এখনও ভালবাসে। এ ভালবাসা গহন অরণ্যের মত নিথর নিস্তব্ধ। বিশ্বেশ্বর তাদের অভাবের মাঝে এসে দাঁড়াতে চাইলে বলেছে—"আমরা গরীব সত্য, কিন্তু ভেবে দেখুন, যতক্ষণ আমরা নিজে চালাতে পাববো, ততক্ষণ কেন পরের ভিক্ষে নেব।" এ শুধু অভিমানের কথা নয়, ব্যক্তিত্বময়ী নারীর আত্মসম্মানের কথাও। বিশ্বেশ্বরের সাহায্য যখন সে দু'হাতে ঠেলে সরিয়ে দেয় তখন ঘরে রোগশয্যায় শায়িত তার মা, ভাই এবং ক্ষুধার্ত সাবিত্রী এবং সে। একদিকে তার আত্মসম্মান আর অভিমান অপরদিকে ক্ষুধা, দারিদ্র্য এবং অসহায় কতকগুলি মুখ। নিরুপমার রচনারীতির একটা বৈশিষ্ট্য আছে। এটাকে তার স্টাইলও বলা যায়।

অন্নপূর্ণা সিধা পাঠালে সতী অভুক্ত ভাই বোনদেব জন্য রান্না করতে যাওয়ার মুহূর্তে তার মানসিক অবস্থা, সতীর বিবাহেব পর রামশঙ্করের অবস্থা, তিনকড়ি লাহিড়ীর মৃত্যু সংবাদে ভট্টাচার্য পরিবারের দৃশ্য, স্বামীব মৃত্যুতে সতীর মনের অবস্থা, দেবত্র উপন্যাসে পিতা ও পুত্রের শবদাহের দৃশ্যটি, পিতা ও ভ্রাতার আত্মার উদ্দেশ্যে দুধ ও জল দেবার সময় করুণার মনের অবস্থা বর্ণনায় নিরুপমা দেবীর বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যাবে। এই চোরাপথগুলি দিয়ে নারী হৃদয়ের অন্দরমহলে প্রবেশের অধিকার পাওয়া যাবে। প্রেম, প্রীতি, সুখ, দুঃখ, অভাব, দারিদ্র্য জনিত বেদনাবোধ প্রভৃতি অনুভূতির সার্থক প্রকাশ ঘটেছে। বিশিষ্ট রীতির পাশাপাশি সাধারণরীতিও ব্যবহার করেছেন ; যেমন পুকুর ঘাটে সখী-সংবাদ, রান্নাঘরে মাতা-কন্যার সংলাপ, পাড়ার মেয়েদের জটলা, মোড়লদের শলাপরামর্শ প্রভৃতি।

অন্নপূর্ণার মন্দির উপন্যাসে সতীর আত্মহত্যার পূর্বে পুকুর ঘাটের দৃশ্যটির কথা বলছি। পুকুর ঘাটে নোটের বাণ্ডিল নিয়ে নারী-খাদক নরেন্দ্র ভাদুড়ী সতীকে আসঙ্গ দানের প্রস্তাব করছে আর 'গলা জলে দাঁড়াইয়া নীরবে সে কাঁপিতে লাগিল।' এমন সময় বিশ্বেশ্বরের আবির্ভাব। সতী তখন কি করছে? "মনে হইতেছিল, এখনই যদি সে জলে ঝাঁপাইয়া পড়ে, তাহা হইলে কে রক্ষা করে। কিন্তু সবলে মনকে ফিরাইয়া' অধরের উপর ওষ্ঠ চাপিয়া সে বাড়ি ফিরিল—এখন

আর সে কম্পন নাই। একটু গূঢ় অথচ দৃঢ় সঙ্কল্পে তাহার দেহ মন উভয়েই স্থিরলাভ করিয়াছে।" সতী বুঝলো তার মত অবস্থায় আত্মহত্যাই হিন্দু বিধবার আত্মরক্ষার উপায়। আত্মহত্যার পূর্বে বিশ্বেশ্বরকে সে দীর্ঘপত্র দেয়। নারী রচিত এমন জবানবন্দী বাংলা সাহিত্যে পূর্বেও ছিল না, পরেও সম্ভবতঃ নেই। পত্রের কয়েকটি অংশ উদ্ধৃত করলে সতীর মানস-বৃত্তের কেন্দ্রটি পাওয়া যাবে।

"এই অধম জাতি বুকের মধ্যে কতখানি সমুদ্র লুকাইয়া রাখে, একদিন তাহা মর্মে বুঝিবে। সেদিন স্বীকার করিবে, সংসারে সেই স্নেহের আদান-প্রদানই একমাত্র শ্রেষ্ঠ সুখ।·· আমরা বাঙালী হিন্দু কন্যা, কষ্ট হইলেও আমরা দুই দিনেই নিজের অবস্থার মধ্যে আপনাকে ডুবাইয়া লই। তোমার মাসিমার কথায় আমার সরল বালিকাচিত্তে যে আশা জাগিয়া উঠিয়াছিল, কয়েক মাসেই তাহা সঙ্কুচিত করিয়া লইয়াছিলাম। দারিদ্র্য-দশার পাষাণ ফলকে তোমার দয়ার মূর্তি ফুটিয়া উঠিতে চাহিত। আমি চিরদিন তাহা অন্ধকারের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া আসিয়াছি। তোমার সাক্ষাতে সত্য করিয়া বলিতেছি, নিজেও কোনদিন সে মূর্তি বাহির করিয়া দেখি নাই—দেখিবার অবসরও ছিল না। আজ সে অবসর মিলিয়াছে। আজ আর কোন কাজ নাই—আজ আমার বিশ্রাম। তাই বোধহয় তুমি আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়াছ।"

সতীর শ্রাদ্ধবাসরে বিশ্বেশ্বরের চোখ দু'টি ঝাপসা হয়ে গেল। বিশ্বেশ্বর আজ প্রথম উপলব্ধি করল, "সত্যই এ অকরুণ পৃথিবীতে ভালবাসা আছে কি? কে কাহার পায়ে জীবন উৎসর্গ করিয়া নীরবে মরিয়া যাইতেছে, কে সে সংবাদ রাখে!" জ্যোৎস্না রাতে সতীর বাড়ীর দিকে দৃষ্টি মেলে দিয়ে সে দেখে—"শ্রীহীন গৃহাঙ্গণ অম্লান চন্দ্র করে যেন বিধবার মতই পড়িয়া আছে।" তুলসী তলায় প্রদীপ হাতে সাবিত্রীকে দেখে তার মনে হয় শ্বেতবসনা বিধবা সতী।

সতীর স্রষ্টা তারা প্রায়শ্চিত্ত চাননি। আঁকতে চেয়েছিলেন অসহায়, নিরুপায় হয়ে পল্লীবাংলার সংস্কার কূপে কেমন করে উজ্জ্বল জীবনগুলো তলিয়ে যাচ্ছে পত্রের সূচনায় সতী লিখেছে—"আমি এখন অহঙ্কার করিয়া বলিতেছি, এই আজ প্রথম এবং শেষ,—আমি স্ত্রী হইবার নিতান্ত অযোগ্য ছিলাম না। তবু তুমি আমায় গ্রহণ কর নাই।" জীবনের শেষদিন তার দেহমন বিশ্বেশ্বরময় হয়ে গেছে। সতীর পত্রটি পড়তে পড়তে স্ক্যাণ্ডেনেভিয়ান ঔপন্যাসিকের 'Herlha' (1856) উপন্যাসের নায়িকার মৃত্যুর রোমান্টিক দৃশ্যটির কথা পাঠকের মনে পড়বেই। বিশেষ করে নায়িকা যখন বলে, 'Show yourselves, both by

word and deed, by the whole of your conduct in life, worthy of the freedom, the self responsibility which you have a right to demand from the laws of your country, and—it will be conceded to you or your successor।" [Page—387] ফেডারিক রেমার নায়িকার মত সতী জোর করে না বলতে পারলেও মানসিকতার দিক থেকে দু'জনের যথেষ্ট মিল ছিল।

পরিবেশ তৈরীতে নিরুপমা দেবী নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। তার মধ্যে নাটকীয়তা নেই, চমক সৃষ্টির প্রয়াস নেই, আছে সহজ সরল স্বাচ্ছন্দ্য জীবন-অভিব্যক্তি।

'দিদি' উপন্যাসের রচনা কাল ১৯১৫। কাহিনী নতুন নয় কিন্তু তার উপস্থাপনা ও ব্যাখ্যানের মধ্যে কিছু অভিনবত্ব আছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বাসরকক্ষে কিশোর অমর ও কিশোরী সুরমার বাধ বাধ লজ্জার ভাবটি এবং পরবর্তীকালে লাজুক অমরের স্ত্রী সান্নিধ্য থেকে পালিয়ে বেড়ান চিত্রে নিরুপমা বিশেষ অনুভূতির কথাই বলেছেন। চারুর রুগ্ন মাতার পাশে অমরের উপস্থিতিতে কিশোরী চারুর 'ম্লান গণ্ড দু খানি একটু রাঙা' হয়ে ওঠে এবং সলজ্জ চারু অধঃবদনে বসে থাকে। অমরের সাথে বিবাহের পর মাতৃহারা চারুর ভীত সন্ত্রস্ত ভাবটি বা চারুকে পুনরায় বিবাহ দেবার প্রস্তাবে রোদনরতা নবোঢ়া নারীর অনুরাগ প্রকাশের ভাষা কত সহজ, কত নিখুঁত। পঞ্চম পরিচ্ছেদে অমর ও চারুর গভীর প্রণয় দৃশ্যের অবতারণ প্রসঙ্গে 'যৌবন' সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন—"হায় যৌবন। তুমিই কি জগতের সাধনার ধন? তাই কি মানুষ আজন্মের সঞ্চিত ভাণ্ডার শূন্য বোধে তুচ্ছ করিয়া ফেলিয়া দিয়া নব জীবন সমুদ্রের কূলে, আশালোকিত ঊষার প্রারম্ভে নতুন রত্ন সংগ্রহ করিতে উৎসুক হয়?···হে যৌবন। এই কি তোমার স্বরূপ? তোমার ফেনিলোচ্ছ্বাসে মন হইতে কর্তব্যের কঠোর চিন্তা ধুইয়া মুছিয়া যায়, তাই কি তুমি এত সুখদায়ক? তোমারই তীব্র মাদকতায় মানুষ মাতাল হইয়া উঠে, দুঃখের অতল গহ্বরে পড়িয়াও তোমার নেশায় বিভোর থাকে। ত্রিলোকের তৃষিত হৃদয় বাঞ্ছিত সুরা সদৃশ হায় যৌবন। হায় একীভূত সুধা ও গরল।" যৌবন সুধা-গরলে মিশ্রিত। বাল্ বিধবা নিরুপমার এটিই যৌবন সম্বন্ধে দর্শন। চারুর কাছে বিশ্বস্ত থাকার জন্য অমর সুরমাকে উপেক্ষা করেছে। সুরমা সতীন হয়েও মায়ের মত স্নেহ ও কর্তব্য দিয়ে চারুকে ভরিয়ে দিয়েছে। সুরমা ভারতীয় নারী বাঙালী নারীর কাছে সংসার জীবন দৈবোদ্দিষ্ট জীবন। "সংসারের মধ্যে থাকিয়া সংসারকে বাদ দিয়া চলিবার উপায় নাই।" সংসারে সহ্য শক্তি এবং ধৈর্য দিয়ে

সব সংকট ও সংশয়কে অতিক্রম করতে হয়। অমরের সংসারে সে সামঞ্জস্যের সাধনা করেছে। সর্বক্ষেত্রে সে হয়তো জয়ী হয়নি, কারণ সে মানবী। দেহ-মনকে অস্বীকার করতে পারলে তো সে যোগিনীই হয়ে যেতে পারতো। সংসারে নারীর সবচেয়ে বড় পরিচয় সে জননী। চারুর 'ফুল্ল কুসুম তুল্য' শিশুটিকে বুকে তুলে নিয়ে মাতৃত্বের আস্বাদনে মগ্ন হয়েছে। নিরুপমা দেবী নিঃসন্তান। আপন জীবনে এরূনার বেদনাকে নানা কাজে ভুলিয়ে রেখেছিলেন। তাঁর উপন্যাসের নায়িকাদের কোলে তুলে দিয়েছেন সন্তান। নারী জীবনের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। সাবিত্রী, চারু, কমলা, বিজলী, নীরজা, এমন কি বোবা মেয়ে শ্যামলী সবাই জননী। অন্নপূর্ণা বিশ্বেশ্বরের কাছে, সুরমা প্রফুল্লের পুত্রের কাছে, জেঠিমা সতী সাবিত্রীদের কাছে জননীর মর্যাদা পেয়েছেন।

পিতামাতা ও সন্তানের মধ্যকার মধুর সম্পর্কটিকে অবলম্বন করে তিনি কতকগুলি দৃশ্যের অবতারণা করেছেন, যা একান্তই গার্হস্থ্য চিত্র। সাবিত্রী ও তাঁর 'কুন্দকলিকা তুল্য' শিশু, সুরমা, চারু ও তাদের পুত্র, শ্যামলী ও তার জননী, চারু ও তার জননী, প্রফুল্ল ও তার কন্যা, নীরজা ও তার কন্যা প্রভৃতি দৃশ্যে মাতৃহৃদয়ের বাৎসল্য, উৎকণ্ঠা, আকুলি বিকুলি শিশুর সব কিছুকে এমন সুন্দর করে দেখার অকৃত্রিম দৃষ্টি বাংলা সাহিত্যে মহিলা লেখিকাদের অনবদ্য অবদান।

স্বামী-স্ত্রী-সন্তান নিয়ে কতকগুলি চিত্র পাই। সন্তানের প্রতি পিতামাতার আকর্ষণ স্বাভাবিক। এই সব স্বাভাবিক দৃশ্য রচনায় নিরুপমার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

"চারু শিশুকে কোলে লইয়া স্বামীর বুকে হেলিয়া রহিয়াছে। অমরনাথ শয্যার উপরে অর্ধশায়িত ভাবে উপবিষ্ট হইয়া মধ্যে মধ্যে উভয়কে চুম্বন করিতেছেন" (দিদি)।

"উভয়ে শিশুকে যুগপৎ চুম্বন করিলেন। প্রফুল্ল হাসিয়া উঠিল।" এমন দৃশ্য প্রত্যাখ্যাত 'প্রায়শ্চিত্ত' ও শ্যামলীতে একাধিকবার উপস্থাপিত হয়েছে।

সন্তানের চেহারার আদল স্বভাবত পিতা অথবা মাতার মত হয়ে থাকে। এ নিয়ে স্বামী স্ত্রী দুজনের আলোচনায় স্বামী বলেন সন্তান মাতার মত, মাতা বলেন পিতার মত হয়েছে। একে সন্তানের মধ্যে অপরের সাদৃশ্য লক্ষ্য করে আনন্দ পান।

স্বামী স্ত্রীর গভীর মিলনের দৃশ্যগুলির মধ্যে লেখিকার আন্তরিকতা উপভোগ্য। তিনি সমাজবিধি-বহির্ভূত প্রণয়ের চিত্র আঁকেননি। নারীজীবনে সতীত্ব গভীর

ভাবাবেগের সঙ্গে যুক্ত। নীতি ও বিধির কারাগারে সে বন্দী। সতী বিশ্বেশ্বরকে ভালবেসেছে। ভালবেসে কোনদিন অবৈধ অসামাজিক আচরণ করেনি। যেদিন সে বিশ্বেশ্বরকে মনের বাইরে এনেছে, সেদিনই সে আত্মহত্যা করেছে। নিরুপমা দেবীর উপন্যাসে সব প্রণয় বিবাহে পরিণত হয়। নরনারীর গভীর মিলন দৃশ্য বিবাহ জীবন ব্যতীত নেই। তারাচরণ-প্রফুল্ল, মোহিত-নীরজা, বিশ্বেশ্বর-সাবিত্রী, চারু-অমর, বিজলী-শিশির প্রভৃতি স্বামী-স্ত্রীর মধুর মিলনের দৃশ্য রচনায় লেখিকা যথেষ্ট সংযম দেখিয়েছেন। বিশেষ করে উপন্যাসে সুদক্ষ শিল্পীরমত স্বল্প কথায় এই সব দৃশ্য উপস্থাপনার প্রয়োজনও আছে।

'উচ্ছৃঙ্খল' উপন্যাসে প্রমোদ-মৃন্ময়ী, 'দিদি' উপন্যাসে প্রকাশ-উমা ঘটনা দুটির মধ্য দিয়ে তরুণী মনে প্রেমের আবেগ ও ভাবাবেগের প্রথম স্ফুরণের চিত্র উপস্থিত করেছেন। উদ্ভিন্নযৌবনা উমা, সুরমার উপদেশ লঙ্ঘন করেছিল বয়সোচিত কৌতূহল ও বিস্ময়ের আকর্ষণে। প্রকাশের প্রেম নিবেদনের ভাষা সব সে উপলব্ধি করতে না পারলেও তার নারীত্বের পূর্ণ জাগরণ ঘটে যায়। হায়! সে বিধবা। উমার অবস্থা সম্বন্ধে লেখিকার মন্তব্য—"যে বিহঙ্গ কখনও লোকালয় দেখে নাই, তাহাকে মনুষ্য সমাজে আনিয়া পিঞ্জরে পুরিলে তাহার যে অবস্থা হয়, তাহা অনেকেই দেখিয়াছিল। সে যেন উন্মত্ত হইয়া উঠে, কখন অধীরভাবে পিঞ্জরকে আঘাত করে, কখন নির্দয় পীড়নে আপনাকে রক্তাক্ত করিয়া ফেলে। কেহ তাহার প্রতি স্নেহ প্রকাশ করিলে তাহাকে দংশন করিতে উদ্যত হয়।" এই পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গী উমার যন্ত্রণার যথাযথ প্রকাশে নিরুপমা নিজ জীবনের অভিজ্ঞতাই ব্যক্ত করেছেন।

নিরুপমার নারী চরিত্রগুলি সংসারকে উপেক্ষা করেনি। পরিবারের কর্তব্য ও দায়িত্বকে অবহেলা করেনি। তিনি মনে করতেন সংসার প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্র নয়, প্রতিশোধ বা প্রতিহিংসার স্থানও নয়। নারী সংসারের অধীশ্বরী। সতী, সুরমা, রেবা, রমা নিজের যোগ্যতায় সংসারের কর্তৃত্ব পেয়েছে। সুরমা সতীন নিয়ে অমরের ঘর করেছে। অমরের সঙ্গে বন্ধুর মত, আত্মীয়ের মত আচরণ করতে চেয়েছে। সে কঠিন সংযমের ব্রত নিয়েছে। নানা ঘটনায় তার সব সংযম, দূরত্ব ও অভিমান নিজের অজ্ঞাতেই এলোমেলো হয়ে যায়। অসুস্থ অতুল এবং অমরের পাশে সুরমা ঘুমিয়ে পড়ে। অকস্মাৎ নিদ্রাভঙ্গে সে অমরের উপস্থিতির কথা ভেবে লজ্জা, দ্বিধা, সংকোচ এবং আসক্তির এক মিশ্র ভাবাবেগে অভিভূত হয়ে পড়ে। চারু ও অতুলকে নিয়ে হাওয়াবদল করতে যেয়ে অমরের অসুস্থতা এবং তার সেবায় জন্য সুরমার আগমনের মধ্যে লেখিকার উদ্দেশ্য সুরমাকে অমরের আরো কাছে

নিয়ে আসা। সুরমা অমরের দাবীকে উপেক্ষা করে বলেছিল—"জগতে তোমারচে পর আর আমার কেউ নেই।" পরক্ষণেই সুরমার মনের পর্দা তুলে দেখালেন সেখানে কতবড় আন্দোলন চলছে। 'আজ এতদিন পরে সেই রুদ্ধ গৃহে এ আঘাত কেন? আঘাতকারীই বা কে? সেই ব্যক্তি অথচ সে নয়, সুরমার সে যে এখন স্নেহাস্পদ আত্মীয়। ভগ্নীর অধিকারে সে বুক ছাড়িয়া বসিয়া আছে, সে যে তাহারই স্বামী। লজ্জায় সুরমার আপদমস্তক রঞ্জিত হইল। এ কি বিড়ম্বনা।' সুরমার কপালে ঘাম জমতে লাগলো, লজ্জায় রাঙা হয়ে গেল।

লেখিকা স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধের মধ্যে পুষ্পে মধু সঞ্চারের মত 'মধুময়ত্ব' লক্ষ্য করেছেন। তাই পিতৃগৃহে যাবার সময় সুরমা যত জোরের সঙ্গে অমরের প্রেমকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, গাড়ীতে উঠেই কান্নায় ভেঙে পড়ে তত আবেগের সঙ্গেই বলেছে, "স্বীকার করছি, স্বীকার করছি, আর অস্বীকার করবো না—আমি বলছি—সে অধিকার ছিল তোমার একদিন—আর এখনো—এখনো—।" সুরমা তার নারীস্বভাব-বিরুদ্ধ ভাবের জন্য চারুকে লিখেছিল—"জেনো স্ত্রীলোক চিরকালই স্ত্রীলোক, পুরুষ পুরুষই, এ অন্যথা হয় না। যে এর অন্যথা দেখে আমার বিবেচনায় সে ভুল করে। তবে যদি স্থলবিশেষে স্ত্রীলোক পুরুষ ভাবাপন্ন হলে তাতে তার বা আর কারো মঙ্গলের সম্ভাবনা থাকে, তবে সেখানে স্ত্রীর পুরুষ হওয়াই বিধি।" পত্রের অংশটুকু পড়লেই বোঝা যায় সে তার স্বভাববিরুদ্ধ আচরণ করেছে। তাই উপন্যাসের শেষে লেখিকা সুরমার সব অহঙ্কার চূর্ণ করেছেন। সে অমরের পাশে একটু স্থান ভিক্ষা করেছে।

নায়িকাদের আঁচলটি চাবির চেয়ে চোখের জল মোছার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে বেশী। প্রথম দিকে সুরমা প্রচণ্ড অভিমানে মুখ ফিরিয়ে থাকতে চেয়েছিল। তাই তার চোখে জল নেই। সে অস্বাভাবিক। উমার ঘটনায় বুঝলো প্রেমই নারীর একমাত্র অবলম্বন। মন্দাকিনী তাকে শেখালো সধবার স্বামীই সব। নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লোপ করতে না পারলে নারীর সুখ নেই। "There is a feminine need to be overpowered by men".[৪২] আত্মযুদ্ধের পর সে ভারতীয় নারীর চিরন্তন আদর্শে উপনীত হয়ে উপলব্ধি করলো—"নারীর দর্প, তেজ, অভিমান কিছু নেই,—আছে কেবল ভালবাসা, কেবল দাসীত্ব।"

অস্বাভাবিক পরিস্থিতি ও মানসিকতার প্রকাশ ঘটেছে 'বিধিলিপি'-র নায়িকা জ্যোতির্বার্ণবের কন্যা কাত্যায়নীর চরিত্রে। লেখিকা কাহিনীর মুখবন্ধে সংস্কৃত শ্লোকটি স্থাপন করেছেন, "যদ্ভাব্যং তদ্ভবতু ভগবন্ পূর্বকর্মানুরূপং।" জ্যোতির্বার্ণব তাঁর

পালিত পুত্র মহেন্দ্রের কোষ্ঠীবিচার করে দেখেছেন কাত্যায়নীর সঙ্গে তার বিবাহ সম্ভব নয়। অথচ মহেন্দ্র কাত্যায়নীকে ভালবাসে। কাত্যায়নী পিতৃনির্দেশকেই একমাত্র পালনীয় সত্য বলে মনে করেছে। পিতা, মৃত্যুর পূর্বে জমিদার কামাক্ষানাথের হাতে কাত্যায়নীকে সমর্পণ করে যান। কাত্যায়নী তাঁকেই স্বামী বলে গ্রহণ করতে চেয়েছে। কিন্তু নিজের মনের দুর্বলতার কথা সমবয়সী বিধবা রমার কাছে বলে ফেলে—"তুমি ভালবাসার যে মূর্তি এঁকেছ, আমি যে তা দেখিনি। আমি যা দেখেছি, তার নাম হয়তো আসক্তি আর মোহ, কিন্তু তুমি যা পেয়েছ, সে বুঝি আর এক জিনিষ।" এই মোহ এবং আসক্তির ছোঁয়া কাত্যায়নী এড়াতে পারেনি। উপন্যাসের শেষ অধ্যায়ে কঠিন প্রাচীরে ফাটল ধরিয়ে মহেন্দ্র তার সামনে উপস্থিত হয়েছে। কামাক্ষানাথ তার ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র, ভালবাসার পাত্র মহেন্দ্র। সুরমা ও কাত্যায়নীর আত্মদ্বন্দ্বের পরিমাণ একই রকম। কাত্যায়নীর দ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশ কম বলে সে অনেকখানি স্থৈতিক। সুরমা চিরগতিশীল এবং সক্রিয়। সুরমা সমাজ সংসারের কেন্দ্রীয় সমস্যার মধ্যে বিকশিত।

শ্যামলীতে বহুক্ষেত্রেই বাস্তবসম্মত বিশ্বস্ত চিত্র উপস্থাপিত হয়নি। রোমান্সের মোটা তুলির টানে শ্যামলীর চরিত্রে, গতিসঞ্চারে প্রয়াস পেয়েছেন। শ্যামলী চরিত্রে নারীর কৈশোর থেকে জননীত্বে উত্তীর্ণ হবার বিভিন্ন পর্যায়গুলি খুবই সুন্দর ভাবে চিত্রিত হয়েছে। শ্যামলী স্বামীগৃহে সকলের গ্রহণযোগ্য হবার জন্য সাধনা করেছে। কপালকুণ্ডলা সমাজ সংসারের বাইরে লালিত হওয়ায় সমাজে ফিরেও সে সংসারী হতে পারেনি। শ্যামলী সংসারে লালিত হয়েছে। শ্যামলী মূক, মূঢ় নয়। কপালকুণ্ডলায় প্রকৃতি একটি অনিবার্য শক্তির মত তার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করেছে। শ্যামলীর জীবনেও এই প্রকৃতির প্রভাব কম নয়। বিশ্বজগতে একমাত্র প্রকৃতির অব্যক্ত সৌন্দর্যের ভাষাই সে বোঝে। প্রকৃতি তার নারীত্বের জাগরণ ঘটায়।

২ ॥

নিরুপমা দেবী যখন উপন্যাস লিখছেন, তখনও বাল্যবিবাহ চলছে, বহুবিবাহ অব্যাহত, বিধবাদের বিবাহ অধিকার আইনতঃ সিদ্ধ, কার্যত অসিদ্ধ। নারী জীবনের সব দুর্দশার কথাই তিনি সারা জীবন ধরে বলেছেন। এই নিষ্ঠুর অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য একটি মাত্র পথ খোলা ছিল, হয় বিদ্রোহ, না হয় আত্মনিগ্রহ। বিদ্রোহ অপেক্ষা আত্মনিগ্রহের চিত্রই তাঁর উপন্যাসে প্রাধান্য পেয়েছে। "এই জন্যই

আজকাল বঙ্গনারীর আত্মহত্যা একটা ভীষণ সংক্রামক রোগের আকার ধারণ করিয়াছে।"[৪৩] আত্মনিগ্রহ একপ্রকার প্রতিবাদ। নিরুপমা যে বঞ্চনাকে আত্মিক মুক্তির সোপান বলেননি, এইটেই বড় কথা।

লক্ষ্যহীরার পাতিব্রত্য কাহিনী এখন অচল। স্বামী পরনারীর প্রতি আসক্ত হলে কমলার জীবনে নেমে আসে হতাশা এবং নারীজীবন সম্বন্ধে ঘৃণা। জীবন নিয়ে সমাজের পুতুল খেলাকে সহ্য করতে না পেরে সতী আত্মহত্যা করেছে। উমা, মন্দাকিনী, সুরমা, রেবা, ইলা, মীরা, কল্যাণী, নীরজা সবাই ব্যক্তিত্বময়ী। সতী আত্মহত্যা করেছে, উমা জীবন্মৃত, মন্দাকিনী স্বামীর উপেক্ষাকে সহ্য করতে না পেরে শয্যাশায়ী, সুরমা নিজের সঙ্গে রক্তাক্ত সংগ্রামে রত হয়েছে। রেবা শ্যামলীকে জীবনের সব সঁপে দিয়ে সরে দাঁড়িয়েছে, ইলা বিবাহ অপেক্ষা সমাজ-কল্যাণমূলক কাজকে বেশি পছন্দ করেছে, মীরা অর্থনৈতিক সংগ্রামে নেমে পড়তে বাধ্য হয়েছে। কল্যাণী স্বামীর অবজ্ঞা সহ্য করতে না পেরে মৃত্যুকালে স্বামীর সেবা প্রত্যাখ্যান করেছে। বালবিধবা নীরজা পুনরায় বিবাহ করে সামাজিক স্বীকৃতির জন্য উন্মত্ত হয়েছে। নিরুপমা দেবী নারীদের সব বৈসাদৃশ্যকে সামাজিক আদর্শের সমে ফিরিয়ে এনেছেন।

নারীদের আত্মজাগরণ ও সমাজসচেতনতা ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই সমাজ-জীবনের শান্ত সরসীতে জল মাঝে মাঝেই ঘোলা হয়েছে। রক্ষণশীলরা ও নব্যহিন্দু-ধর্মের প্রবক্তরা এর জন্য আধুনিক সাহিত্যকেই দায়ী করেছেন। মুক্তদৃষ্টি সমালোচক মন্তব্য করেন—"কিন্তু আত্মহত্যা রোগের কারণ নব সাহিত্যের স্কন্ধে স্থাপন করিলে চলিবে না। পুরুষের কোঁচায় আগুন না লাগিয়া মেয়েদের শাড়ীতে লাগে কেন তাহা সাহিত্যে নয় সমাজেই অনুসন্ধান করিতে হইবে। আর সত্যই কি আমাদের কোন নারীসমস্যা নাই? যখন বঙ্গবালার বিবাহের জন্য স্বল্পবিত্ত লোককে সর্বস্বান্ত হইতে দেখা যায়, তখন বালবিধবাদের দুঃখকাহিনী সর্বজনবিদিত এবং নানা কারণে এই সীতা সাবিত্রীর দেশেও পতিতা নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, তখনও কি বলিব আমরা বেশ ছিলাম, এই সাহিত্যিক গুলাই যত নূতন নূতন সমস্যার সৃষ্টি করিতেছে? ইহাদের অপরাধ এই যে সমাজের অত্যাচার অবিচার সমূহ সকলের চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিতেছেন, আর কেহ বা সত্য ন্যায়মূলক নূতন সমাজব্যবস্থার ইঙ্গিত করিতেছেন।"[৪৪]

নিরুপমা দেবীর উপন্যাসের পটভূমি ভাঙ্গনমুখী গ্রামবাংলা। এই গ্রামে পানীয় বলতে কচুরী পানায় ভরা মজাপুকুরের জল, যানবাহন পথঘাট বলতে কর্দমাক্ত

পথে গরুর গাড়ী, বস্তি বলতে কবিরাজ। মানুষগুলোর নিত্যসঙ্গী কালাজ্বর, ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড, অশিক্ষা ও দারিদ্র। সঙ্গতিসম্পন্ন গৃহস্থেরা শহরমুখী হয়েছে। গ্রামের অর্থনৈতিক সঙ্গতিও গেছে কমে। 'অন্নপূর্ণার মন্দিরে'র রামকিঙ্কর ব্রাহ্মণ হলেও যজমানের অভাবে কুঠীবাড়ীতে দশ টাকা মাইনেতে কাজ করে। স্ত্রী ও দুই কন্যা তুলা পেঁজা, পৈতা কাটা, পাটের দড়ি কাটা, সূচের কাজ করে কোন রকমে সংসার চালায়। বড় ছেলে টেরিকেটে, ধুতি সার্ট ও সিগারেটের বাহার দেখিয়ে ঘুরে বেরায়।

'দেবত্র' উপন্যাসের হরিশ দুঃখ করে বলে, "যজমান আর আছে কৈ? গরীব গেরস্তর বেশীর ভাগই মরে ফৌত হয়েছে, তবু যা দু'চার ঘর এ গাঁয়ে সে গাঁয়ে আছে তাদেরই এমন করে দিন কাটে, কিন্তু বড়লোক যারা তারা তো কেউ গাঁয়ে বাস করে না। সব এ শহর ও শহর আর কলকাতায় থাকে।" কর্ম বা শিক্ষা উপলক্ষে গ্রামের সঙ্গতিসম্পন্ন মানুষরা ঘর ছাড়া। 'নূতন পূজা' গল্পে লেখিকা গাঁয়ের জমিদার রায়েদের বর্ণনা দিয়েছেন—'বিপুল রায়বংশ এখন একঘর গৃহস্তে পর্যবসিত। অধিকাংশ জ্ঞাতিরা জ্বর প্লীহা রোগগ্রস্ত হইয়া অকালে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, কতক বা দেশ ছাড়িয়া চাকুরী স্থলেই বসবাস করিতেছে।'

ইংরাজী শিক্ষার আকর্ষণ গ্রাম বাংলাতেও প্রবল। ছেলে-মেয়েরা ইংরাজী শিক্ষার আকর্ষণে শহরমুখী। 'দেবত্র' উপন্যাসের কনিষ্ঠ পুত্রবধূর ইচ্ছা—'তার দাদার মেয়েদের কিভাবে সাজিয়ে মেয়েদের গাড়ীতে ইস্কুলে পাঠানো হয়, কেবল তারা গান গাইতে, পিয়ানো বাজাতে, সেলাই করতে শিখ্ছে—লেখাপড়াও শিখছে মীরাকেও তেমনি করে শেখাতে তার সাধ।" 'প্রায়শ্চিত্ত' গল্পে বিমলাচরণ তাঁর বিধবা মেয়ে নীরজাকে কলকাতায় এনে বেথুন স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। বাড়ীতে গৃহশিক্ষক আছে। পিয়ানো বাজিয়ে গানে নীরজার পারদর্শিতার প্রসঙ্গ বারবার উল্লিখিত হয়েছে। মোহিত গ্রামের ছেলে ইংরাজী শিক্ষার জন্য কলকাতায় এসে বিধবা নীরজাকে বিবাহ করে। কলকাতার সমাজ তখন কসমোপলিটান্।

'দেবত্র' (১৯২৭) প্রকাশের পূর্বে শান্তাদেবী, সীতাদেবী, শৈলবালা ঘোষজায়া প্রভৃতি লেখিকাদের আবির্ভাব ঘটে গেছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর বাঙলা সাহিত্যে বিশেষ করে কথা সাহিত্যে জীবন ও জীবনের মূল্যবোধগুলির মৌল পরিবর্তনের প্রভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। 'দেবত্র' উপন্যাসে 'বঙ্গবালা সমিতি' স্থাপন করেছে ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিতা নারীরা। মীরা-ইলা এর সভ্যা। সমিতির সভ্যারা দেশসেবা, নারী জীবন গঠন, শিক্ষা বিস্তার, গ্রামোন্নয়ন কাজে আত্মনিয়োগ করেছে এবং সারা জীবন

অবিবাহিত থাকবে বলে শপথ নিয়েছে। ইতিপূর্বেই ১৯১৬ খ্রীঃ পুণায় 'ভগিনী সমাজ', ১৯১৭ সালে উইমেন্স ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১৭ সালে বেথুন কলেজে ছাত্রী সংখ্যা ছিল ৭৮ জন, ১৯২১ সালে ছাত্রী সংখ্যা ১১৪ জন হয়েছে। ১৯১৭ খ্রীঃ সারা ভারতে শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষিকার সংখ্যা ২,৭৫৭ ছিল, ১৯২১ খ্রীঃ তা বৃদ্ধি পেয়ে ৪,৩৯১ জনে দাঁড়ায়। শিক্ষার প্রসার ধীরে ধীরে নারীদের পরিবেশ সচেতন করে তুলছে। ভারতের রাজনীতির মঞ্চে গান্ধীজীর আবির্ভাব কেবলমাত্র জাতীয় আন্দোলনকেই ত্বরান্বিত করলো না, নারীমুক্তি আন্দোলনেও শক্তি সঞ্চার করলো। গান্ধীজী শহরকেন্দ্রিক রাজনৈতিক আন্দোলনকে সাধারণ মানুষের সঙ্গে যুক্ত করার জন্য গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে দিলেন। ১৯২৮ খ্রীঃ লবণ আইন আন্দোলনের সম্বন্ধে মার্গারেট কাজিন মন্তব্য করেছেন—"When a call for volunteers for Satyagraha action came, and men from the village responded, women who understood through their emotions, through their institutions, also responded and nearly 5000 of them suffered imprisonment, while hundreds of thouands, nay millions of them were co-sufferers with the men in the repressions of 1929 and 1939"[৪৫]

গান্ধীজীর আন্দোলনে গ্রামের মহিলারা সাড়া দিল। বিদেশী পণ্যবর্জন, স্বদেশী গান প্রভৃতির মধ্য দিয়ে আত্মসচেতনার পরিচয় দিয়েছিল। মূলতঃ প্রথম মহাযুদ্ধের পর সারা ভারত ব্যাপী মহিলা সংগঠনের সংহত রূপ দেখা দিল 'দি অল্ ইণ্ডিয়া উইমেন্স কনফারেন্স'-এর মধ্য দিয়ে। নারীদের সর্বাঙ্গীন শিক্ষা এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক দাবী প্রাধান্য পায়। দেশের বিভিন্ন স্থানে আঞ্চলিক শাখা স্থাপন করা হয়। এই সংগঠন সোচ্চার হয়ে উঠলো সবস্তরে নারীশিক্ষা, বাল্যবিবাহ রোধ, হারসিং গৌড় আনীত সম্মতি বিষয়ক বিধি প্রভৃতি নিয়ে। ১৯২৮ সালের অধিবেশনে রাজনৈতিক ক্ষমতা চাওয়া হল।

নিরুপমা দেবীর 'দেবত্র' 'নূতন পূজা' প্রভৃতিতে সমসাময়িক সামাজিক আন্দোলনের ছায়াপাত ঘটেছে। সমাজসচেতন লেখকদের ক্ষেত্রে এটাই স্বাভাবিক। ইলা-মীরা স্বাবলম্বী হতে চলেছে। গৃহশিক্ষয়িত্রীর কাজ করে নিজেদের পড়াশোনার খরচ চালাচ্ছে। জীবনে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে লক্ষ্যে পৌছান তাদের একমাত্র সাধ। নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নিয়ে পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ নিবন্ধ প্রকাশিত হচ্ছে। "নারীর স্বাতন্ত্র্য বাস্তব হইয়া উঠিবে তখনই যখন সে পাইবে আর্থিক স্বাধীনতা।"[৪৫ক]

সমাজ ও ব্যক্তির বিবর্তনের নানা সমস্যা উপন্যাসের বক্ষে ভৃগুর পদচিহ্নের মত জেগে থাকে।

নিরুপমা দেবী আমাদের বন্ধ্যা রুগ্ন ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু যৌথ পরিবারের বিশ্বস্ত কলাকার। এর দীনতার কথা তিনি বলেছেন। দু'চোখ অশ্রু ভরে গেছে, তবু বলেছেন। কারণ তিনি এর মধ্যে একটা গৌরবও দেখতে পেয়েছেন।

তাঁর উপন্যাসগুলিতে বিধবা এবং বি-পত্নীকদের মিছিল চলেছে। বালিকা যুবতী এবং বর্ষীয়সী নানা বয়সের বিধবার চরিত্র অঙ্কন করেছেন। অন্নপূর্ণা, জেঠিমা, সতী, জাহ্নবী, দিদি উপন্যাসের বাল্ বিধবা উমা, চারুর মা, বিধিলিপিতে যুবতী বিধবা বমা, শ্যামলীতে বর্ষীয়সী অনিলের মা, 'দেবত্র'র বিধবা যুবতী ছোট বৌ, 'নূতন-পূজা'-র যুবতী-বিধবা বাণী, প্রায়শ্চিত্ত গল্পে বালিকা নীরজা, 'প্রত্যাখ্যান'-এ অন্নদাদি প্রভৃতি। অন্নপূর্ণা, জাহ্নবী, চারুর মা, জেঠিমা, অনিলের মা এরা বয়স্কা বিধবা। সবাই মাতৃস্থানীয়া। জেঠিমা ও অন্নপূর্ণার নিজের সন্তান নেই। অন্নপূর্ণা বোনের মাতৃহারা পুত্রকে কোলে তুলে নিয়েছিলেন। জেঠিমা দেবরের সংসারে দেবরের পুত্র কন্যাদের নিয়ে ঘর করছেন। জাহ্নবী, চারুর মা, অনিলের মা সন্তানবতী। এদের জীবনকে অবলম্বন করে লেখিকা নৈষ্ঠিক বিধবা জীবনের পরিচয় তুলে ধরেছেন। অন্নপূর্ণা বিশ্বেশ্বরের জননীর পদ নিয়েছেন কোন আইন বলে নয়, হিন্দু পরিবারের স্বাভাবিক নিয়মে। সতীর জেঠিমা আপাত রুক্ষ, কটুভাষী ও স্পষ্টবাদী। সতী সাবিত্রীদের প্রতি তার স্নেহের কোন অভাব নেই। চরিত্র সংলাপ নির্ভর। এই বয়স্কা বিধবারা বাঙালীর ঘরে ঘরে বিরাজিতা। সকালের শান্ত দৃশ্যপটে জেঠিমার আবির্ভাব। তিনি ঘর থেকে মুখে করে যে সংবাদটি নিয়ে বেরলেন তা হল—চাল বাড়ন্ত, গয়লানী দুধ না দেওয়ায় কালীপদ রাতে কিছু খায়নি, ঘুম থেকে উঠেই খাবার জন্য বায়না করবে। সংলাপের কিছু কিছু উদ্ধৃত করলেই জেঠিমার মেজাজটি উপলব্ধি করা সহজ হবে।

"ঘোষালমাগী কাল দুধটুকুও দেয়নি গো। আর দেবেই বা কি। যে তোমাদের গতিক, সাতজন্মে দামটি দেবার নাম করবে না।"

গোয়াল ঘরে গরুকে খেতে দিতে দিতে উক্তি—"হতভাগা গরু, অলপ্পেয়ে গরু, বাছুর বড় হল ত আর দুধ দেবেনা। কেবল খাবে। অমন গরু ভাগাড়ে যায় না কেন?"

রামকিঙ্করের খাবার সামনে পিঁড়ে পেতে বসে কন্যাদের বিবাহ প্রসঙ্গের

অবতারণা করে বলেন "বলি গিলে ত যাচ্ছ। এদিকে চোদ্দ বছর বার বছরের করে দুই মেয়ে যে গলায় আড় হয়ে রইলো, তা কি টের পাচ্ছ না? হুঁশ পরশ নেই? চক্ষু কি গিয়েছে?"

উদ্ধৃতির সংখ্যা বৃদ্ধি না করেও বলা যায় এ জাতীয় নারীচরিত্র সংলাপ নির্ভর না হলে বিকশিত হতে পারে না। রুক্ষতার আড়ালে কোমলতা, তিক্ততার মধ্যে অশ্রুজলের সন্ধান দিয়ে নিরুপমা নারীচরিত্রের আর এক রহস্য উদ্‌ঘাটিত করে দিলেন। স্নেহ ও প্রেমের ব্যাকরণ নেই।

সতী, নীরজা, রমা যুবতী বিধবা। সতী যৌবনজ্বালায় আত্মহত্যা করেছে, নীরজার পিতা তাকে পুনরায় বিবাহ দিয়েছে। আর রমা পিতার সংসারে নৈষ্ঠিক বৈধব্যজীবন যাপন করছে। সতীর কুমারী, বিবাহিত ও বৈধব্যজীবন সমাজের উপহাস মাত্র। উমা বালিকা। উমা প্রকাশের ভালবাসার চিত্রের মধ্য দিয়ে নারীর পুরুষের প্রতি স্বাভাবিক প্রবণতার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেও সুরমাকে দিয়ে সমাজবিধি আরোপ করেছেন। বাণী ভাইয়ের সংসারে আশ্রয় নিয়েছে। 'রন্ধনশালা ও গৃহস্থালীর যাবতীয় কার্যের ভার বিধবাদেরই উপর ন্যস্ত।' (নূতন পূজা, পৃ-৫২)। নবকিশোর বাবুকে দিয়ে নীরজাকে সমাজে গ্রহণ করিয়েছেন। 'আমার ডায়েরী'-র দিদি নিঃসন্তান মধ্যবয়সী বিধবা। তার মধ্যে চিরন্তন মাতৃমূর্তি অঙ্কন করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে বৈধব্য জীবনের চিত্রের অভাব নেই। পারিবারিক জীবনের মূল স্রোতধারার মধ্যে তারা আবদ্ধ থাকে নি। বিষয়টাকে তর্ক ও সামাজিক সমস্যা হিসাবেই দেখেছেন। তাঁদের হাতে নারীর সাধ্য ও স্বভাবের পরিণতিও হয়েছে বিষময়। এখানেই যথার্থ নারী সৃষ্টির সঙ্গে তাঁদের পার্থক্য। নিরুপমা দেবী নায়িকাদের স্থানচ্যুত করে মেসবাড়ী, বৃন্দাবন বা কাশী পাঠিয়ে দেননি। তবে কথাটা শুধু নিরুপমা দেবীর ক্ষেত্রেই সত্য। কারণ অনুরূপা দেবী বিধবাদের জীবনের সমস্যাকে এড়িয়ে গেছেন। বাল্-বিধবা বা যুবতী বিধবাদের চরিত্র তাঁর বৃহৎ সাহিত্যসম্ভারে স্থান পায়নি।

॥ ৩ ॥

ব্রাহ্মরা নারীর বাহ্যিক রূপের বর্ণনার পথ ত্যাগ করলেন। দেহসর্বস্ব নারীকে প্রাণসর্বস্ব করে তুললেন। "স্ত্রী বলিতে স্ত্রীর দেহকে বুঝায় না, স্ত্রী প্রকৃতি ও স্ত্রী আত্মাকে বুঝায়।"[৪৬] 'স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য' নিবন্ধে বলা হল, 'স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য

পুণ্য ও সতীত্বে, ভগবদ্ভক্তি, পরসেবা ও বিনয়, বৈরাগ্য। জরা বার্দ্ধক্যে সেই সৌন্দর্যের বিনাশ হয় না, মৃত্যুতেও সেই সৌন্দর্য বিলুপ্ত হয় না। উহা আত্মিক সৌন্দর্য জীবনগত ও চরিত্রগত সৌন্দর্য।' পরবর্তীকালে বাংলা সাহিত্যে নারী ও পুরুষের দৈহিক রূপবর্ণনা বহুলাংশে শিথিল হয়ে পড়ে। উদ্ধৃত নীতি উপদেশের জন্য এই প্রকার ঘটেছে তা বলব না। নারীসৌন্দর্য সম্বন্ধে ব্রাহ্ম নীতিবিদরা যাই বলুন ব্রাহ্ম স্বামীরা বা হবু স্বামীরা কি ভাবছেন, তা ঐ ব্রাহ্মদের নিয়ে লেখা উপন্যাস পড়লেই বুঝতে সুবিধা হবে। নৌকাডুবির হেমলতা রোগা হলেও সুশ্রী, গোরার সুচরিতা ও ললিতা সুন্দরী। ললিতার শ্যামবর্ণ, রূপবতী হতে বাধা দেয়নি। রূপ বর্ণনার সাবেকী ভঙ্গি বদলে গেল। বঙ্কিমী রীতি শিল্পের ভাষায় Broach, আর রবীন্দ্ররীতি Impressionistic. তা সুন্দর নয় বলা যাবে না, তা ইঙ্গিতবহ। পদ্মাবতীর মত তা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বলা হয়নি। কিন্তু স্টীমারে ওঠার সময় ললিতার অনন্যতা মুহূর্ত মধ্যেই বিনয়ের হৃদয় গোচর হয়। এই সূক্ষ্ম হৃদয়হারী রূপ বর্ণনাই নিরুপমা দেবী অনুসরণ করেছেন।

নিরুপমা ও অনুরূপা দেবী উপন্যাসে চরিত্রগুলির বর্ণনায় বাহ্যিক রূপ বর্ণনার পদ্ধতিটি একেবারেই পরিত্যাগ করেছেন। স্বভাব, আচরণ ও অবস্থানের মধ্যে চরিত্রের পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছেন। নায়ক নায়িকাদের পরিচয় দিতে যেয়ে গুণবাচক, ভাববাচক, অবস্থাবাচক ও ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যের ব্যবহার করেছেন। নারীরা বিশেষিত করতে বা করে বলতেই ভালবাসে। নিরুপমা দেবী উপন্যাসগুলিতে চরিত্র বর্ণনায় বিশেষ্য ও বিশেষণের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। সবচেয়ে বিস্ময়কর নিরুপমা প্রায় কোন ক্ষেত্রেই (নারী পুরুষ নির্বিশেষে) দৈহিক বর্ণনা দেননি। নিম্নে রূপ বর্ণনার কিছু উদ্ধৃতি দেওয়া হল।—

"বিশ্বেশ্বর দেখিতে মন্দ নয়, নব্য যুবক, স্বশ্রেণী, বিবাহ হয় নাই।" কমলার বর্ণনা—'সেও সুন্দরী, ধনীর কন্যা এবং অবিবাহিত।' জননী জাহ্নবীর বর্ণনা —"পরিধান একখানি সরু লাল পেড়ে বস্ত্র মাত্র, হাতে দুই গাছি সাদা শঙ্খ, ললাটে সিন্দুর বিন্দু, এই সামান্য বেশে দাওয়াখানি যেন আলো হইয়া উঠিল।" সতীর বর্ণনা—"কুসুম কলিকা তুল্য বালিকা"। (অন্নপূর্ণার মন্দির)

চারু—'নীলাম্বরী পরা বালিকাটি।'

সুরমা—'শ্রী রাধাকিশোর ঘোষের একমাত্র দুহিতা শ্রীমতী সুরমা দাসী সুন্দর ও বয়স্থা।'

'সে সুন্দরী, বিদুষী, বুদ্ধিমতী এবং সর্বোপরি হৃদয়শালিনী'।

'দেবত্র'—

ইলা—"নবাগতা তরুণী সন্ধ্যাতারার মত অঙ্গনের এক পাশে দাঁড়াইয়া ছিল।"

শ্যামলী—

"তাহার অঙ্গের সেই শ্যামবর্ণে ও তনুদেহে চতুর্দিকে লম্বিত কতকগুলা কৃষ্ণকেশের চাঞ্চল্যে তাহাকে এই শ্যামলা প্রকৃতির সঙ্গে যেন একত্রীভূত কোন পদার্থের মতই দেখাইতেছিল।"

'প্রায়শ্চিত্ত'—

নীরজা—"একখানা জ্যোতির্ময়ী মূর্তি আঁধার আকাশের গায়ে চন্দ্রের ন্যায় উদয় হইল। তাহার আলোকে সমস্ত অন্ধকার দূরে পলাইয়া গেল।" নীরজা "সুন্দরী, সুশীলা, শিক্ষিতা, ধনীর কন্যা, তাহার বিবাহের জন্য পাত্রের ভাবনা নাই।"

নিরুপমা তরুণীর রূপ বর্ণনায় রোমান্টিক। দেহ, মন, স্বভাব ও পরিবেশ সব মিলিয়ে নারীর যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে উপমা ও উৎপ্রেক্ষার ব্যবহার থাকলেও তা সংস্কৃত বা মধ্যযুগীয় সরণী বেয়ে চলেনি। সব নারীই তাঁর চোখে সুন্দরী। নিশ্চয়ই গ্রাম বাংলার এটি স্বাভাবিক ঘটনা নয়, যদি সুন্দরী বলতে গাত্রবর্ণ ও নাক চোখের গঠনই মেনে চলা হয়।

নিরুপমা দেবীর সঙ্গে অনুরূপা দেবীর পার্থক্য।

১। অনুরূপা দেবী উপন্যাসের মধ্যে নীতি ও শাস্ত্র শিক্ষা দিয়েছেন। ভূদেব তাঁর কাছে দ্বিতীয় মনু। নিরুপমা শুধু শাস্ত্র মেনে চলেছেন। তিনি জানতেন উপন্যাসের কাজ শাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া নয়। তবুও একটু ভিন্ন পথ চলাও আছে। বিধবার বিবাহ দিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে শাস্ত্রাচার অপেক্ষা লোকাচারের বিরুদ্ধতা বেশি।

২। অনুরূপা দেবীর উপন্যাসে কোন নায়িকা স্বপ্রতিষ্ঠ হয়নি, অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্য অর্জনে পা বাড়ায়নি। শিবানী, মনোরমা শেষ পর্যন্ত স্বামীর গৃহে প্রত্যাবর্তনের সুযোগের অপেক্ষা করেছে। নিরুপমার নায়িকারা বিদ্রোহিণী না হয়েও নিজের জীবনকে স্বচ্ছন্দ করার জন্য রিক্ততার উঠোন থেকে উঠে এসেছে। অর্থ উপার্জনের মধ্যে স্বাবলম্বী হতে চেয়েছে।

৩। অনুরূপা দেবীর নায়িকাদের কোন স্খলন নেই। নিরুপমা দেবীতে স্খলন আছে। তার জন্যে ভর্ৎসনা নেই, আছে অনুকম্পা।

৪। অনুরূপা দেবী মানবিক দৃষ্টি ভঙ্গি নিয়ে নারীদের পাশে দাঁড়াতে পারেননি।

তাঁর অন্তরায় পুরুষ, পুরুষ-ভাষিত মনু-সংহিতা। নিরুপমা দেবী মনু-সংহিতার জন্য হৃদয়ের সংহিতা ছিঁড়ে ফেলেননি।

৫। অনুরূপা অপেক্ষা নিরুপমাদেবীর রচনায় নারীজীবনের রূপবৈচিত্র্য অধিক। নানা অবস্থার, নানা জাতের নারীরা ভিড় করেছে। কুমারী, বিধবা, সধবা, বালিকা, যুবতী, পৌঢ়া, বৃদ্ধা—সবাই আছে। এমন কি বোবা, অন্ধও আছে। গ্রাম শহর, ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বৈদ্য, ব্রাহ্ম-হিন্দু সব সমাজ থেকে মেয়েরা এসেছে। প্রত্যক্ষতা তাঁর বহুধা বিস্তৃত। তাই অনুরূপার মত ইতিহাসে তাঁর কোন আকর্ষণ নেই। তাঁর সব আখ্যানের উৎস বর্তমান। তাঁর উপন্যাসে রোমান্স রস নেই, আছে নিত্যনৈমিত্তিক পরিচিত জীবনের নাতিবৃহৎ ঘটনার মাধুর্য।

পাদটীকা

১। গর্ব ও অহঙ্কারের প্রতি—লজ্জাবতী বসু, অন্তঃপুর, ৭ম বর্ষ, ১ম সং, পৃ ২৪
২। বঙ্গের মহিলা কবি—যোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত, ২য় সং, ১৩৬০, পৃ-৯৪
৩। Calcutta Revie v, Jan, 1945, Modern Bengali Literature—Surendranath Sen, P-38.
৪। New Essays in Criticism—Brojendranath Sil, P-103 Publisher—Som Brothers, 1903.
৫। দাসী, ৬ষ্ঠ ভাগ, সেপ্টেম্বর, ১৮৯৭, পৃ-৪৩০
৬। ভারতী, ১২৯৭
৭। উনিশ শতকের বাঙলা গীতিকাব্য—ডঃ অরুণ মুখোপাধ্যায়, পৃ-১৩৫
৮। বাংলা কবিতার নবজন্ম—ডঃ সুরেশচন্দ্র মৈত্র, পৃ-৫৫৮
৯। A History of English Literature—A. Cazamian, P-796.
১০। The Romantic Poets—Graham Hough, Chap.-IV, P-122
১১। সাহিত্যসাধক চরিত মালা—মানসকুমারী বসু, পৃ-১৪
১২। ঐ ঐ
১৩। উক্তিগুলি কাব্য কুসুমাঞ্জলির শেষে এবং বীরকুমার বধ কাব্যের প্রথমে উদ্ধৃত আছে।
১৪। ভারতী, ১২৯০, বৈশাখ।

১৫। বঙ্গের মহিলা কবি—যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, পৃ-২০১
১৬। সাহিত্যসাধক চরিত মালা—প্রমীলা নাগ, পৃ-৬৭
১৭। বঙ্গ সাহিত্যে নারী—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ-২৬
১৮। নবজীবন, চৈত্র, ১২৯৪, পৃ-৫৩১
১৯। নবজীবন, কার্ত্তিক, ২য় ভাগ, ১২৯২, পৃ-৩০২
২০। নবজীবন, ৪র্থ ভাগ, চৈত্র, ১২৯৪, পৃ-৫৯১
২১। প্রবাসী, ১৩১৮, ব্রাহ্মসমাজের সার্থকতা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃ-৪৭
২২। সাহিত্য ও সমাজ—অনুরূপা দেবী, পৃ-৪৭
২৩। Women's Education in India—Y. B. Mathur, P-73-74.
২৪। সাহিত্য ও সমাজ—অনুরূপা দেবী, পৃ-১১
২৫। ঐ ঐ , পৃ-১১
২৬। বাগদত্তা—অনুরূপা দেবী, পৃ-৯১
২৭। স্বামী বিবেকানন্দ—ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত হইতে উদ্ধৃত, পৃ-৩৬২, নবভারত পাবলিশার্স।
২৮। অন্তঃপুর, ১৮৯৮, সম্পাদকীয়, পৃ ১
২৯। অন্তঃপুর, ১৯০১, স্ত্রীশিক্ষা—প্রিয়ংবদা দেবী।
৩০। বালিকা, ভগিনী সমাজের মুখপত্র, ১৯০৩, পৃ-৪
৩১। ভারতী, শ্রাবণ, ১৩১৮, বিলীয়মান ও উদীয়মান যুগ—আমোদিনী ঘোষজায়া, পৃ-৩১২।
৩২। অন্তঃপুর, ১৯০১, মহিলার পরিচ্ছদ,—হেমন্তকুমারী চৌধুরানী।
৩৩। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ-৮৪
৩৩ক। ঐ ঐ
৩৪। ঐ ঐ , পৃ-৭৮
৩৫। ভারতবর্ষ, ১৩২৩, অগ্রহায়ণ, দিদি—ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
৩৬। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস-৪র্থ খণ্ড, ১৯৫৮—ডঃ সুকুমার সেন, পৃ—১৯৩
৩৭। ভারতবর্ষ, চৈত্র, ১৩৪৪, পৃ—৫৯০
৩৮। ঐ ঐ পৃ—৫৯৭
৩৯। সাহিত্যসাধক চরিতমালা, নিরুপমা দেবী, পৃ—২৪
৪০। বালবিধবা ও হিন্দু পত্রিকা—স্বর্ণকুমারী দেবী, ভারতী, ভাদ্র, ১৩১৩, পৃ—২৫২

৪১। Modern Review, Condition Favourable to Social Purity, P-514.

৪২। The Psychology of Women—Helen Deutsch, M.D., Vol.I, 1947.

৪৩। প্রবাসী, ১৩২৭, শ্রাবণ, পৃ—৩৮৪

৪৪। ঐ পৃ—৩৮৪—৮৫

৪৫। Cousins, J.H(ed)—The Annie Besant Centenary Book, 1947, P—180

৪৫ক। প্রবাসী, মাঘ, ১৩২৮, পৃ—৫৫০

৪৬। মহিলা, ১৩০৩, জ্যৈষ্ঠ, রমণীর প্রকৃত সৌন্দর্য।

৪৭। মহিলা, ১৩০৬, ফাল্গুন।

॥ ষষ্ঠ অধ্যায় ॥

এতদিন মেয়েদের সম্বন্ধে যাবতীয় গবেষণা পরিচালিত হোত পুরুষের দৃষ্টিকোণ থেকে। পুরুষেরা পত্র-পত্রিকা, পুস্তক-পুস্তিকায় নারী সম্বন্ধে ভুরি ভুরি আলোচনা করেছেন। মেয়েরা ছিল তার নীরব পাঠিকা মাত্র। এতদিন নারীদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে করণীয় ও বরণীয় বিষয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে পুরুষেরা। মেয়েরা সেই সিদ্ধান্ত কেমন করে কার্যকরী করবে অর্থাৎ গ্রহণ করবে তার উপায় সন্ধানেই ব্যস্ত। নারীরচিত সাহিত্যে পুরুষনির্দিষ্ট সূত্রগুলি আলোচিত বা ব্যাখ্যাত হত। বৈশিষ্ট্য যেটুকু ফুটত তা হল নারীজীবনের পেলবতা, কমনীয়তা, ভাষা ও বাক্‌ভঙ্গীর। কোথাও কোনও উষ্মা, ব্যঙ্গ বা তিক্ততার ছাপ দুর্লক্ষ্য নয়। এ যুগের (১৯২০-৪৯) নারীরা রাজনীতি সমাজ, অর্থ, পরিবার, স্বাস্থ্য, সংবিধান, ধর্মতত্ত্ব, দর্শন প্রভৃতি আলোচনায় অংশ নিচ্ছেন। আমাদের দেশের নারীরা পাশ্চাত্য নারীদেব মত উত্তেজিত হয়ে তর্কের ধুলো উড়াতে ব্যস্ত হননি। তারা আত্মস্থ, সংগ্রামী, সমাজ ও জীবন সম্বন্ধে সচেতন। বিশ্বের তাবৎ জ্ঞানভাণ্ডার মন্থন করার সুযোগ পেয়ে তারা কেবল নিজেদের খুঁজে পায়নি—জীবন সম্বন্ধে তাদের দৃষ্টিভঙ্গীই পাল্‌টে ফেলেছে। তাদের ব্যাপার নিয়ে তারা এখন সালিশী বা প্রতিবাদে প্রস্তুত নয় বরং অধিকার অর্জনের জন্যে সর্বপ্রকার দুঃখ কষ্ট বরণে আগ্রহী। নারী শব্দটি এখন আর পুরুষ শব্দের বিপরীত শব্দ নয় বরং পরিপূরক।

১৯২০ সালের পর, যে কোন বৎসরের নারীরচিত গ্রন্থের একটি তালিকা করলে, বোঝা যেত কত বিচিত্র বিষয়ে তাদের মনোনিবেশ ঘটেছে। ইতিপূর্বে নারীর রচনা ছিল অবজেক্‌টিভ। বিংশ শতকে নারীর রচনা ক্রমশই সাবজেক্‌টিভ হতে লাগল। নারী হৃদয়ের ব্যথা বেদনা, কাম-কামনা, আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ ঘটতে লাগল। ভার্জিনীয়া উল্‌ফের ভাষায়—"Women have served all those centuries as looking-glass possessing the magic and delicious power of reflecting the figure of men at twice its natural size".[১] মহিলা ঔপন্যাসিকরা এতদিন যে সব নারী চরিত্র সৃষ্টি করেছেন তারা পুরুষের মনোরঞ্জন তোষামোদে ব্যস্ত থেকে, নীরবে নির্যাতন সহ্য করাকেই সতীত্বের পরাকাষ্ঠা বলে মনে করেছে। ১৯১৯ খ্রীঃ নিরুপমা দেবী নারী জীবনের যে সমস্যাকে 'বিধিলিপি' বলে পাশ কাটাতে চাইলেন, ১৯১৫ খ্রীঃ প্রবাসীতে শৈলবালা ঘোষ

আয়ার ক্রমপ্রকাশিত উপন্যাস 'সেখ আন্দু'-তে সেই ভালবাসারই সোচ্চার প্রকাশ। 'অন্নপূর্ণার মন্দির'-এর নায়িকা সতী ভালবাসাকে তার বৈধব্যজীবনে অসামাজিক বলে হৃদয় পেটিকায় আজীবন লুকিয়ে রেখেছে, কেবল মৃত্যুর পূর্বে পত্রের আধারে দৃষ্টিগোচর করেছিল। 'সেখ আন্দু'-র নায়িকা লতিকা বাগ্‌দত্তা, জ্যোৎস্না বিবাহিতা লতিকার হবু স্বামী ডাক্তার এবং জ্যোৎস্নার স্বামী ইঞ্জিনীয়ার। তবুও তারা ড্রাইভার আন্দুর প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেছে। লেখিকা তাদের হৃদয়রহস্য উন্মোচিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। হৃদয়কে সমাজ-তর্জনীর ভয়ে প্রতারিত করতে লেখিকা নারাজ। জীবনের সব ঘটনার পরিণতি সব সময় সুখপ্রদ হয়না। তাই বলে ঘটনাগত সত্যকে অস্বীকার করা যায় না এতদিন অজ্ঞতা, সরলতা এবং বাধ্যতাই ছিল উপন্যাসের নায়িকাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। মহিলা ও পুরুষ ঔপন্যাসিকরা সবাই তাই ভেবেছেন।

শৈলবালা ঘোষজায়া, শান্তাদেবী ও সীতাদেবী আলোচ্য পর্বের সূচনা করেন। এইসব লেখিকাদের উপন্যাসে হৃদয়, সমাজশাসনের নির্ভরতাকে মানতে পারেনি। তাই, নায়িকারা জীবনে অনেক জটিলতার গ্রন্থি ছিন্ন করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে। এই লেখিকাদের উপন্যাসে নারীপুরুষের অবাধ মেলামেশা। এনিয়ে অভিভাবকদের কোন মাথা ব্যথা নেই। জীবনে দোসর নির্বাচনে এদের স্বাধীনতার অন্ত নেই। এঁদের উপন্যাস পাশ্চাত্য উপন্যাসের অনুকরণ নয়। পাশ্চাত্য প্রভাব ও ইংরাজী শিক্ষায় রূপান্তরিত বাঙালীয়ানার চিত্ররূপ। এঁদের নায়িকারা পুরুষের সঙ্গে সমান তালে শিক্ষা, সমাজসেবা, রাজনৈতিক আন্দোলনে এগিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত। এরা নিজেদের আর হীনপ্রাণ, হীনমতি বলে মনে করে না। একালের নারীরা হৃদয়বতী তারা আত্মমর্যাদা সম্বন্ধে সচেতন। সমকালীন য়ুরোপে একই মানসিকতার আবহাওয়া চলছিল। "We must treat women as women, as the equals, not the inferiors, the collaborators, not the instruments of men. Men must treat them as such, and women must think of themselves and the other women as such. We must aim at a society, which will be a diversity, not a uniformity, a harmonization, not a standardization, an orchestra, not a masculine solo".[২]

১৯২০ খ্রীঃ ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর প্রকাশিত গ্রন্থ 'নারীর উক্তি'-তে লেখিকার বক্তব্য "সীতা সাবিত্রীর কথা তুলিবেন না। সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই।

তাঁহারা চিরকালই আমাদের চিত্তাকাশে তারার ন্যায় জ্বল্‌জ্বল্ করিবেন। কিন্তু তারার আলোয় জীবনযাত্রা নির্বাহ হয় না। ওদিকে পশ্চিম সমুদ্র পারে নানা প্রকার নর-নারীদের বিদ্রোহ রণ-যাত্রার রক্তবর্ণ মশালের আলো আমাদের নবজাগ্রত চক্ষু ও চিত্তে ধাঁধাঁ লাগাইতেছে। সেই বিদেশিনীকে 'তোমারে সঁপেছে প্রাণ' বলিয়া আমরা কেহ কেহ তাহার পায়ে সর্বস্ব ঢালিয়া দিতেছি, কিন্তু সত্যই কি আমরা তাহাকে 'চিনি গো চিনি তোমারে' বলিতে পারি? এই তারা ও মশালের মধ্যবর্তী স্নিগ্ধোজ্জ্বল স্থিরজ্যোতি সন্ধ্যাপ্রদীপ কে জ্বালিয়া দিবে?"[৩] এ-যুগের নারীরা কামনা করছিল 'দৈনিক জীবনের সহযাত্রী'।[৪] দেশীয় আদর্শ যেমন অচল তেমনি বিদেশী উন্মাদনাও পরিত্যজ্য, মধ্যপন্থাই শ্রেষ্ঠপন্থা বলে বিবেচিত হল। মেয়েদের ইংরাজী শিক্ষার বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ উঠছিল ইন্দিরা দেবী ক্ষুরধার যুক্তি দিয়ে তা নস্যাৎ করে দেন। রক্ষণশীলরা বলতে লাগলেন ইংরাজী শিক্ষার ফলে দেশের মেয়েদের মধ্য থেকে ধর্মভাব, নম্রতা, গৃহকর্ম নিপুনতা নেই বললেই চলে। পাঠে বেশি মনোযোগ দেওয়ায় স্বাস্থ্যহানি হচ্ছে। মহিলারা ক্রমশ বিলাসিতা, আমোদে মেতে উঠছে। এসব অভিযোগের উত্তরে ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী বললেন "একেলে পুরুষেরা একেলে মেয়েদের যতই দোষ ধরুন, তাঁহাদের বর্তমান সহধর্মিণীর পরিবর্তে যদি তাঁহাদের স্বর্গগত ঠাকুরমা পার্শ্বে দাঁড়ান, তাহা হইলে সত্যই কি তাঁহারা সন্তুষ্ট হন?"[৫] এইসব সমস্যাই এ কালের মহিলা ঔপন্যাসিকদের রচনায় প্রাধান্য পেয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই এযুগের মহিলা রচিত উপন্যাসে সমাজ-ক্ষেত্র প্রসারিত হয়েছে। সেকালের সঙ্গে একালের নারীদের মানসিকতার দুস্তর ব্যবধান ঘটে গেছে। "সেকেলে গৃহিণী যেখানে গয়না খুলে উপোষ করে চুল এলিয়ে গোসা-ঘরের মেঝেয় লুটতেন, এবং যথাসময়ে মামুলীভাবে মান ভাঙিয়ে নিতেন, আজকালকার গৃহিণী সেস্থানে দৈনিক কর্তব্য পালনের তিলমাত্র ত্রুটি না করেও মৌখিক ভদ্রতা রক্ষার অন্তরালে যে দুর্জয় অভিমান পোষণ করতে পারেন, তাকে কাবু করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। সেকালের সনাতন যুদ্ধক্ষেত্র এবং একালের গুহাগহ্বর মণ্ডিত কণ্টকজাল খণ্ডিত ক্ষেত্রে যা তফাৎ— এত তাই আর কি।"[৬] 'স্থির জ্যোতির সন্ধ্যা প্রদীপ' হাতে নিয়ে বাঙলার ললনাদের শুভযাত্রা আরম্ভ হয়েছে। স্বর্ণকুমারী, মানকুমারী, হিরন্ময়ী দেবী, সরলা দেবী, কামিনী রায়, কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়, সরোজিনী নাইডু, দুকড়িবালা প্রভৃতি নারীরা সাহিত্য, সমাজসেবা ও রাজনীতি প্রভৃতিতে দেশের নারীদের সামনে আদর্শ স্বরূপ হয়ে উঠেছেন। সবচেয়ে বেশি করে অনুভূত হচ্ছিল ভগিনী নিবেদিতার প্রভাব।

১৯২০-তে গান্ধীজী অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব গ্রহণ করেন। সরলা

দেবী, সরোজিনী নাইডু, বাসন্তী দেবী, উর্মিলা দেবী, সুনীতি দেবী, জ্যোতির্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায় দেশের বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করে দেশের জনসাধারণকে জাগিয়ে তোলেন এবং দেশের নারীদের কাছে তাদের ইতিকর্তব্য তুলে ধরেন। মহিলারা গহনা ও টাকাকড়ি দিয়ে দেশ নেতাদের সাহায্য করেন। কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক ও নেতৃবৃন্দ কারারুদ্ধ হলেন। মহিলারা নারী কর্মমন্দির স্থাপন করে নেতৃত্বের শূন্য স্থান পূরণ করেন। ১৯২২ সালে বাসন্তী দেবী, উর্মিলা দেবী আইন অমান্য করে খদ্দর বিক্রয় করার জন্য গ্রেপ্তার বরণ করেন। নেলী সেনগুপ্তা ও মোহিনী দেবী চাঁদপুরে কুলি নিগ্রহের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করেন। তারকেশ্বরের মোহান্তের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ, প্রিন্স অব ওয়েলসের ভারত আগমণের বিরুদ্ধে সভার আয়োজন করে ছিলেন বাঙলার রমণীকুল। নারীরা দেশব্যাপী হরতালের ডাক দিলেন এবং ঐদিন বিকালে এক সভার আয়োজন করলেন। হেমপ্রভা দেবী, উর্মিলা দেবী এবং একজন মুসলমান রমণী এই সভায় বক্তৃতা দেন।[৭] ১৯২২ সালে মর্ডান রিভ্যু পত্রিকায় মহিলাদের সহস্রে সহস্রে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদানে, উৎসাহিত হয়ে লেখা হল—

"If women are to take on the full duties of citizenship, if they are to take their place in politics and in Government, they must, learn economy of time-to take advantage of every cut short in house-keeping, to systematize the details of their personal life including dress".[৮]

মহিলারা জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন। পুরুষের পাশে সমান দায়িত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, ইংরেজ সরকারের নির্যাতন সমানভাবে ভোগ করেছিলেন। এর মধ্য দিয়ে নারীর ব্যক্তিত্ব বিকাশের পূর্ণ সুযোগ দেখা দিল।

নারীশিক্ষায় দ্রুত অগ্রগতি দেখা যাচ্ছিল। ১৯০১-২ সালে ১২টি কলেজে ছাত্রী সংখ্যা ছিল ২৫৬। ১৯২১-২২ সালে ১৯টি কলেজের ছাত্রী সংখ্যা ৯০৫ জন। ১৯২১-২২ সালে বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১৯, ১২৪ টি। ১৯৩১-৩২ সালে তা এসে দাঁড়াল ২৩, ৫১৭ টিতে। সরকারী উদ্যোগও বৃদ্ধি পেতে লাগলো। পঞ্চায়েত ও পৌরসভা নারী শিক্ষায় বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করলো। মহিলারা শিক্ষার কাজে যাতে করে অধিক সংখ্যায় অংশ নিতে পারে তারজন্য এল. টি. ও বি. টি. ট্রেনিং এবং স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে ভর্তির ব্যবস্থা করা হল। একদল অতি উৎসাহী সমাজহিতৈষীরা রাতারাতি নারীদের শিক্ষিত করে পূর্ণ স্বাধীনতা দেবার জন্য আন্দোলন করেছিলেন।

ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী তাঁদের উদ্দেশে বললেন—"যেমন স্বভাব মলেও যায় না, তেমনি স্বাধীনতাও পাইলেই লওয়া যায় না,—তাহার মূল্য বুঝিতে পারা, তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পারার জন্য আগে শিক্ষা দরকার, এবং সে শিক্ষার জন্য সময় দরকার। তবে সামাজিক মন বলিয়া যদি কোন পদার্থ থাকে, তাহা অজ্ঞাতসারেও শ্রেয়ঃ পথে চলিবে, ইহাই আমাদের আশা ও প্রার্থনা।" সমাজের অগ্রগতিতে সমাজ-মনই বড় কথা। এই সমাজ মন জেগেছে, রমণীর দৃষ্টিতে তা ধরা পড়েছে। দেশের ললনাদের আত্মসচেতন হয়ে দেশসেবার কাজে আত্মনিয়োগের ডাক এসেছে।

"বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে বাঙ্গালায় নারী ঔপন্যাসিকদের স্বর্ণযুগ বলা চলে।"[৯] স্বর্ণযুগ কি রোপ্য যুগ তা বলা মুশকিল। তবে নারী ঔপন্যাসিকের সংখ্যা বৃদ্ধি যদি সাহিত্যিক উৎকর্ষের নজির হয়, তবে স্বর্ণযুগ বলা যেতে পারে। ইন্দিরা দেবী, শৈলবালা ঘোষজায়া, শান্তা দেবী, সীতা দেবী, গিরিবালা দেবী, সরসীবালা দেবী, সুরুচিবালা রায়, উর্মিলা দেবী, মনমোহিনী দেবী, প্রভাবতী দেবী, লীলা দেবী, মিসেস আর. এস. হোসেন, বিজনবালা কর, রজ্জবউন্নিসা, মনোরমা দেবী, বিভাবতী দেবী, পূর্ণশশী দেবী, সুলেখা দেবী, নির্মলা দেবী, হেমলতা দেবী, ইন্দ্রাণী দেবী প্রভৃতি লেখিকাদের নানা উপন্যাস সে সময়ের সব পত্র-পত্রিকায় স্থান করে নিয়েছিল। শৈলবালা ঘোষজায়ার রচনা ইতিপূর্বে 'বীণার সমাধি,' (১৯১৫) এবং 'সেখ আন্দু' (১৯১৫) প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়। 'বীণার সমাধি' বেগমবাহার-গল্প-প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় পুরস্কার পায়। গল্পটির নায়ক অবাঙালী বীণাবাদক, নায়িকা ধনীর দুলালী। বীণাবাদক ধনীর কন্যাকে গান শেখাতে যেয়ে প্রণয় পাশে আবদ্ধ হলেন। ধনীব্যক্তি কন্যাকে অন্যস্থানে বিবাহ দেন। বীণাবাদকের জীবনে নেমে এল হতাশার অন্ধকার। এবার থেকে তার বীণায় ধ্বনিত হতে লাগলো ব্যর্থ প্রেমের করুণরাগিণী। লক্ষ্য করার বিষয় প্রথম গল্পেই তাঁর নায়ক অবাঙালী এবং নায়িকা বাঙালী। অর্থাৎ সে কালের প্রচলিত কাহিনীর ধরনটি পরিত্যক্ত হল। 'সেখ আন্দু'-ও তাই। এবার নায়ক-নায়িকারা সমাজের ভিন্ন কোটির। নায়িকারা—লতিকা এবং জ্যোৎস্না—বাঙালী হিন্দু, ভাগলপুরে প্রবাসী। নায়ক সেখ আন্দু জাতিতে পাঠান, মানুষ হয়েছে উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে। নায়ক-নায়িকারা কেবল ভিন্ন ধর্মাবলম্বী নন, ভিন্ন প্রদেশেরও।

শৈলবালা ঘোষজায়ার 'সেখ আন্দু' একটি সাহসিক পদক্ষেপ। গ্রন্থটি সম্বন্ধে সমালোচকদের পরস্পরবিরোধী মন্তব্য লক্ষ্য করা যায়। অনুরূপা দেবী মন্তব্য করেছেন, "নারী চরিত্র অসম্পূর্ণ, বহুস্থলে অসংযত এবং অসংগতি দোষে দুষ্ট।"[১০]

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, "নূতন ধারা প্রবর্তনের বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায় না।"[১১] বাণী রায়ের মতে, "নবযুগের সূচনা দেখি শৈলবালা ঘোষজায়ার রচনায়।"[১২] ক্যালকাটা রিভ্যুতে মন্তব্য করা হল, "In her Sheik-Andu, she introduces the question of free-love."[১৩] এ-সব মন্তব্যে বোঝা যায়, উপন্যাসটির আসল তাৎপর্য অনুধাবন না করতে পারার জন্য মূল্যায়ণও যথার্থ হয়নি। শৈলবালা উত্থাপিত প্রশ্ন এবং সমস্যা নিতান্তই নারীর নয়, প্রশ্নটা গোটা সমাজের। লেখিকারা যখন আত্মকথনের মধ্যে প্রবেশ করেন, তাঁদের একান্ত 'আমি'কে আবিষ্কার ও প্রকাশ করেন, তখন প্রশ্ন উদ্ভাবিত হয় অন্যরকম। প্রতিভা বসুর 'সুমিত্রার অপমৃত্যু,' গল্পটি তার দৃষ্টান্ত। লেখিকা 'সেখ আন্দু'-র ভূমিকায় তাঁর উদ্দেশ্যটির আভাষ দিয়েছেন। "……জাতীয় উন্নতকামী, উদারচেতা, হিন্দু-মুসলমান হিতৈষী সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাদের হস্তে আমার স্নেহের 'আন্দু' সাদরে অর্পণ করিলাম।" উপন্যাসে ভবতারণ চ্যাটার্জী ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে আন্দুর অন্তরঙ্গ সম্পর্ক প্রসঙ্গে লেখিকার উক্তি—"সাম্প্রদায়িক পার্থক্যের অনুরোধে বাহ্য ব্যবহার ও রীতির স্থূল স্বাতন্ত্র্য বিধানটা যতই নীরস কঠিন হউক—চরিত্র মাধুর্যে সর্বজনপ্রিয় আন্দু, স্বাভাবিক সরল সৌহার্দ্যে সকল শ্রেণীর লোকের সহিত মিশিয়া বেশ বুঝিয়াছিল,—ঐ ব্যবধানের বিধানটা নিতান্তই বহিঃসীমাবদ্ধ বাহিরের লৌকিক ব্যাপার মাত্র। মানুষের অন্তরে পবিত্র নির্মল অন্তরঙ্গতার অসীম মিলন ক্ষেত্রে প্রাণবন্ত মানুষের প্রাণশক্তির গতি চির অপ্রতিহত। অন্ধ পার্থক্যের 'গোড়ামি'ই মানুষকে মর্মে পীড়িত করে। কিন্তু জগতে, মানুষের সহিত মানুষের যে নিত্য সত্য সহজ সম্বন্ধটা আছে তাহা যদি অবিকৃত ঔজ্জ্বল্যে মানুষের মনে জাগিয়া থাকে তবে বাহিরের এই সামান্য ব্যাপার লইয়া মাথা ঘামাইয়া সময় নষ্ট করিবার কি প্রয়োজন? কি আসে যায় উহাতে? লৌকিক সংস্কারের মূল্য থাক না থাক, যিনি রুচিপূর্বক তাহা পালন করিতে চাহেন, সহৃদয় আন্দু তাঁহার সহায়তায় কার্পণ্য করিতে চাহে না। কেননা স্থান, কাল, পাত্র ভেদে এই ক্ষুদ্র কার্পণ্যই একটা বৃহৎ বিরোধের স্রষ্টা হইয়া দাঁড়ায়। অন্ধ বিশ্বাসে দৃপ্ত আঘাত বাজিলেই উদ্ধত উত্তেজনা জাগিয়া উঠে, সঙ্কীর্ণতা সঙ্কীর্ণতম হইয়া উঠে। অন্তরের উন্নত ঔদার্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আন্দু নীরব সহানুভূতিতে তাই হাসিমুখে বিরোধ এড়াইয়া চলিত।" (পৃ—২০) আন্দু ভবতারণের গৃহে গিয়ে তাঁর কাছে সংস্কৃত শাস্ত্র নিয়ে আলোচনা করতো, সংস্কৃত শ্লোক মুখস্ত করতো। গীতা এবং মোহমুদ্গারের স-ব্যাখ্যা শ্লোক শুনতো এবং ভবতারণকে নমাজের রেকার এবং কোরাণের বয়েদ আবৃত্তি করে শোনাত। "তাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের মাঝে পরস্পরের ধর্মের প্রতি সম্মানের ভাবটি বড় স্নিগ্ধ মধুময়

ছিল।" (পৃ-৯০)। উপরের উদ্ধৃতিগুলি পড়লেই বোঝা যায় লেখিকার দৃষ্টিভঙ্গী খুবই স্বচ্ছ।

ভাগলপুরের উকীল রায়চৌধুরীর জ্যেষ্ঠা কন্যা লতিকা এবং তার সহপাঠিনী জ্যোৎস্না গ্রীষ্মাবকাশে বেড়াতে এসে মুসলমান ড্রাইভার আব্দুর প্রেমে পড়ে গেল। নায়িকাদ্বয় কলকাতায় পড়াশোনা করে। এবার ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়েছে। বয়স একজনের কুড়ি, অপরজনের আঠারো। জ্যোৎস্না বিবাহিতা। স্বামী উচ্চশিক্ষার্থে আমেরিকা প্রবাসী। লতিকা বোম্বাই প্রবাসী ডাঃ চক্রবর্তীর বাগদত্তা। তবুও আব্দুর বলিষ্ঠ পৌরুষ তাদের আকর্ষণ করেছে। লেখিকা আব্দুর বর্ণনা দিয়েছেন—" "আব্দুর দৈহিক গঠন পৌরুষ কঠিন,—কিন্তু লালিত্য বর্জিত নয়। প্রশস্ত ললাটে মমতাশীলতার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছে, চক্ষু দুটি নম্র স্নিগ্ধ, বিশাল বক্ষ, আজানুলম্বিত বাহু, সর্বশরীর পেশী সবল, পুষ্ট সুন্দর। মনোরম লাবণ্যে উদ্ভাসিত।" (পৃ—২)। এ যেন বঙ্কিমের জগৎসিংহের বর্ণনা। সম্ভবতঃ ইতিপূবে কোন লেখিকাই পুরুষের দেহের এমন বিস্তৃত বর্ণনা দেননি। আব্দুর গুণেরও অন্ত নেই। সে আরবী, ফার্সী পড়েছে, গান গাইতে পারে, ছবি আঁকায় তার হাত খুবই ভাল। পিতার কাছে দর্জিব কাজ শিখেছে, কুস্তিতে এক নম্বর পালোয়ান, মোটর চালনায় ভাগলপুরে তার দোসর নেই। লতিকার আব্দুর প্রতি দুর্বলতার প্রথম প্রকাশ আধুনিক শিক্ষা প্রসঙ্গ নিয়ে জ্যোৎস্নার সঙ্গে তর্ক। লতিকা তার মতামত জানাতে যেয়ে বলে—"তোমরা বল শিক্ষিত শিক্ষিত—শিক্ষিত কি? শিক্ষার ভারে মনুষ্যত্বটুকু রোলারের চাপে খোয়ার মত গুঁড়িয়ে যাচ্ছে, তাঁরা শিক্ষিত। স্বাধীনচিন্তাশক্তি, স্বাভাবিক বুদ্ধি বৃত্তি,—সবই পরস্ব মতের মোমজালায় মুড়ে এক কিম্ভূতকিমাকার হয়ে দাঁড়াচ্ছে—এই তো শিক্ষার সার্থকতা। ঝাঁটামার। তোতাপাখির মত খানকতক বই মুখস্ত করলেই মানুষ হয় না, মনুষ্যত্ব আলাদা জিনিষ।" একালের মেয়েরা তথাকথিত পড়ুয়া পণ্ডিতদের পছন্দ করেছেনা। রাধারানী দেবীর 'মনের মত' কবিতায় নায়িকা বলছে—

> ডজন হিসাবে পাশ করে যারা চিন্‌তে তো নেই বাকী।
> সে সব বুকিশ্‌ বুর্জোয়াদের আসলে সবটা ফাঁকী।
> হরফের হার চাইনেক' আমি, বরমালা বিনিময়ে।
> 'অ্যালফাবেটের' ফেটিস যাদের এড়াই তাদের ভয়ে।
> আমি চাই যার জ্ঞানের আলোকে উদার হয়েছে মন,—
> মানুষ হয়েছে সত্যি সে পড়ে,—যথার্থ সজ্জন।
>
> (আঙিনায় ফুল, পৃ—৩)।

লতিকার বিবাহের পূর্বে আব্দুর সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হয়েছে মাত্র চারবার। কথোপকথন খুবই নগণ্য। শৈলবালার লেখনী এসব স্থানে খুবই সংযত ও শালীন।

আব্দুর সঙ্গে লতিকার প্রথম সাক্ষাতের বর্ণনা :—"একটা উৎকট উত্তেজনা লতিকার ধমনীতে, রক্তস্রোত দ্রুতবেগে ছুটিতে লাগিল। টেবিলটা দৃঢ়ভাবে চাপিয়া, সে বুক পর্যন্ত নুইয়া বইখানা দেখিতে লাগিল।" (পৃ—৩১)

দ্বিতীয় সাক্ষাতের চিত্র :—"লতিকার হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া একটু উত্তেজনার সহিত চলিল।" (পৃ-৬৩)

তৃতীয় সাক্ষাতের বর্ণনা :—"লতিকার মনের মধ্যে অজ্ঞাত প্রদেশে এক সুপ্ত সমুদ্র অকস্মাৎ সবেগে উছলিয়া উঠিল। অধীরতায় লতিকার কপালের শিরা দপ্‌ দপ্‌ করিতে লাগিল।" (পৃ-৬৩)

চতুর্থ সাক্ষাৎকালে লতিকার অবস্থা :—"সে স্পষ্ট স্পন্দিত হৃদপিণ্ডটা দুই হাতে চাপিয়া চেয়ারে বসিয়া চক্ষু মুদিল, তাহার মনে হইল, সমস্ত আইন-কানুন বাঁধন ছিঁড়িয়া খুঁড়িয়া মরণোন্মাদ বক্রকেন্দ্র বক্ষের মধ্য উর্দ্ধশ্বাসে তাণ্ডব নৃত্য জুড়িয়াছে, কি ভয়ঙ্কর।" (পৃ ৬৪)

শৈলবালা দ্বিধাহীনভাবে নারীর দেহ ও মনের কামনা-বাসনা প্রকাশের প্রাচীন রীতিকে নির্দয়ভাবে বাতিল করেছেন। লতিকা ও জ্যোৎস্নার আব্দুর প্রতি ভালবাসা একান্তই শরীরী। নায়িকাদের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে ক্ষুধিত যৌবনের প্রচণ্ডতম রূপ। বাসনার হাহাকারে তাদের সমগ্র অস্তিত্ব বিপন্ন। তাই স্নানের ঘাটে আব্দুকে দেখে বিধবা জ্যোৎস্নার শরীর কামনায় থরথর করে কেঁপে উঠে। এ জৈব ক্ষুধা স্বতঃসিদ্ধ নিয়তির মত। বাংলা সাহিত্যে ইতিপূর্বে নারীদের দ্বারা নারীর যৌবনের এমন অভিজ্ঞতার চিত্র বর্ণিত হয়নি।

আব্দুর চোখে লতিকা উগ্রা, জ্যোৎস্না—জ্যোৎস্নার মতই শান্ত ও সুন্দর। উপন্যাসের শেষে নিঃসন্তান বিধবা জ্যোৎস্না কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে আব্দুকে বলে, "তোমায় ভয় নয়, তুমি মহৎ, তুমি পবিত্র। তোমার নিঃশব্দ ধৈর্য আর নীরব আত্মত্যাগ বড় কঠিন, বড় ভয়ানক। তাতেই মনকে মুগ্ধ করে, ভীত করে। তোমার পায়ে পড়ি, তুমি ফিরে যাও—আমার তীর্থ ধর্ম সফল হতে দাও।" (পৃ-২০৪)।

শৈলবালা 'সেখ আব্দুর' লেখিকা রূপেই পরিচিত। যে সময় অনুরূপা 'মা' উপন্যাসে মুসলমান রমণীর কণ্ঠে সতীত্বের বাণী উচ্চারণ করাবার জন্য ব্যাকুল এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের কিছু শিক্ষিত ব্যক্তি বিধবা বিবাহকে হিন্দুর অনুকরণ বলে চিৎকার করেছেন [১৪] সেই সময় শৈলবালার কাহিনীটি একটা চমকের ব্যাপার বৈকি।

শৈলবালার (১৮৯৩ ?—১৯৭৩) পিতা কুঞ্জবিহারী সরকারী ডাক্তার ছিলেন। তাঁর পিতৃভূমি বর্ধমান। তাঁব জন্ম হয়েছিল চট্টগ্রামের কক্সবাজারে। মাত্র তেরো বৎসর বয়সে মেমারির জমিদার পুত্র নরেন্দ্রমোহন ঘোষের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। তাঁর দাম্পত্যজীবন সুখের ছিল না। বিষয়বিলাসী স্বামী বিবাহের দশ বৎসর পরেই পাগল হয়ে যান। স্বামীর কাছে অবর্ণনীয় মানসিক এবং শারীরিক অত্যাচার ভোগ কবেছেন। ১৩৩৬ সনে নরেন্দ্রমোহন দেহত্যাগ করেন। শৈলবালার রচনায় প্রচ্ছন্ন বিদ্রোহ এবং সমাজ সমস্যা তাই বড় হয়ে উঠেছে। শৈলবালা রক্ষণশীল হিন্দু পরিবারের কন্যা এবং বধূ। পিতার কাছ থেকে তিনি ধর্ম সম্বন্ধে উদার দৃষ্টিভঙ্গির উত্তরাধিকারিণী হয়ে ছিলেন। "উদার পিতার কাছ থেকে যে মানসিকতা তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে অর্জন কবেছিলেন, তাতে ধর্মীয় গোঁড়ামির কোন স্থান ছিল না, কেননা তা ছিল অসম্প্রদায়িক, মনুষ্যধর্মে আস্থাশীল। সেই সহিষ্ণু মানসিকতার অধিকারী ছিলেন বলেই তিনি উপলব্ধি কবেছিলেন যে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ বলে কোন ব্যাপার থাকা উচিত নয়। উপলব্ধি করেছিলেন বলেই ব্যক্তিগত জীবনে মুসলমান সম্পর্ক রহিত হওয়া সত্ত্বেও কল্পনায় তাঁর সাহিত্যে তিনি বচনা কবতে চেয়েছিলন সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে মিলনের সুদৃঢ় সেতু।"[১৫]

তাঁর পরবর্তী কালের রচনা 'মিষ্টি সরবৎ' গল্পের মুসলমান পরিবারটি এবং 'অভিশপ্ত সাধনা'-র রাবেয়ার চিত্র নিশ্চিতভাবে লেখিকার মনেব বিশেষ একটি প্রবণতাকেই তুলে ধরে। ইংরাজরা দ্বি-জাতি তত্ত্ব ভিত্তি স্থাপন করে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যে ফাটল ধরাতে চাইছে। ১৯০৩ খৃঃ ঢাকার নবাব আলি চৌধুরীর সভাপতিত্বে মুসলিম এডুকেশন সোসাইটির পক্ষে গৃহীত প্রস্তাবে বাঙলার নবজাগরণকে হিন্দুর অভ্যুত্থান বলে ঘোষণা করা হল। ঐ বৎসরই 'ইসলাম প্রচারক' নামক পত্রিকায় ইসমাইল হোসেন সিরাজী 'মুসলমান ও হিন্দু লেখা' নামক নিবন্ধে অভিযোগ তুললেন হিন্দু লেখকরা ইচ্ছাকৃত ভাবে মুসলমান পুরুষ ও নারী চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করেছেন। মুসলমান রমণীদের, পবিত্র হারেম থেকে টেনে এনে প্রণয় পাশে বেঁধেছেন। ১৯০৩ সালে 'ইসলাম প্রচারকে' প্রকাশিত 'হিন্দু সাহিত্য' নামক নিবন্ধে লেখক অভিযোগ করলেন—"Those who have polluted the hearts of the lovely women···may be commended as ideal authors but they can never earn the gratitude of their readers."[১৬]

এই প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শরৎচন্দ্র পর্যন্ত প্রায় সব হিন্দু লেখকই অভিযুক্ত হলেন। 'অল্ ইসলাম' পত্রিকায় এম. এম. আকবরুদ্দীনের 'বর্তমান বাংলা সাহিত্যে

মুসমানের স্থান' (১৯১৬), 'সাহিত্যগুরুর বাঙালী প্রীতি' (১৯১৭), বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায় সৈয়দ এমদাদ আলির 'বঙ্গ ভাষা ও মুসলমান' (১৮১৮), ইসলাম দর্শনে মহম্মদ আবদুল হাকিমের 'বঙ্গ সাহিত্যে মুসলমান' (১৯২১) প্রভৃতি নিবন্ধে মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের ক্ষোভ প্রকাশিত হল। আল্-ইসলাম পত্রিকায় মহম্মদ শহীদুল্লাহ 'আমাদের দরিদ্রতা' (১৯১৬) নিবন্ধে বললেন মুসমানদের নিয়ে লেখা উপন্যাসে মুসলমানের সমাজ—পরিবার, আচার আচরণের প্রভাব থাকা উচিত। নতুবা সে সব সাহিত্যের কোন মূল্য নেই। কাজী আবদুল ওদুরের 'মীর পরিবার' (১৯১৮), মহম্মদ বরকত উল্লার 'পারস্য-প্রতিভা' (১৯২৪) খাঁটি মুসলমান সাহিত্য বলে মুসলমান সমালোচকদের কাছে গৃহীত হল। এই আন্দোলনের পাশে বৈরী ভাব প্রশমনের চেষ্টাও চলছিল। দীনেশচন্দ্র সেনের 'বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্য' (১৮৯৬)-এ তৈমুরের পরিচয়, অক্ষয়কুমার মৈত্রের 'সিরাজদৌল্লা' (১৮৯৮), 'মীরকাশেম' (১৯০৬) গ্রন্থ দুটিতে সিরাজ ও মীরকাশেমের সত্য পরিচয় উদ্ঘাটিত হল। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'তাজ', 'ইত্‌মৎদ্দৌল্লা' 'কবরী-ই-নূরজাহান' প্রভৃতি কবিতায় নিরপেক্ষ কবির দৃষ্টি ফুটে উঠলো। ১৯২১ সালে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায় সৈয়দ এমদাদ আলি 'সেথ আন্দুব' সমালোচনা প্রসঙ্গে বললেন, লেখকরা এমন সব উপন্যাস লিখছেন যাতে হিন্দু রমণীরা মুসলমান নায়কের প্রণয় প্রার্থী হয়েছে। ভালবাসার কোন জাত-ধর্ম নেই। কিন্তু যদি হিন্দুব প্রতি প্রতিশোধ স্পৃহার বশবর্তী হয়ে লেখা হয় তা হলে ভুল করা হবে। শৈলবালা পুরুষে পুরুষে এই যে সাম্প্রদায়িক কলহ তার অবসান ঘটালেন নিজে নারী হয়ে। এটা একটা বড় ঘটনা।

শৈলবালা যে প্রশ্ন উত্থাপিত করেছেন তা নারী জীবনের একান্ত কথা নয়, এটা সমাজ-প্রশ্ন। নারী তার ইচ্ছানুসারে ভালবাসবে, এটা নর-নারীর সমান অধিকারের প্রশ্ন। হিন্দু নারী এক মুসলমান যুবককে ভালবাসতে পারে। তবে এ প্রশ্ন নারীর একান্ত প্রশ্ন নয়। এ প্রশ্নের জন্ম নারী জীবন থেকে নয়, এ প্রশ্নের জবাব তাই নারী দেবে না, দেবে সমাজ। শৈলবালা নারীমনের বিশিষ্ট কথার কথাকার নন, সামাজিক কথার কথাকার। তাঁর দুঃসাহস প্রশংসনীয়, তবে তা একান্তভাবে নারী মুখাৎ উচ্চারিত হবে, এমন অনিবার্যতা তার অন্তরে নেই।

নারী ঔপন্যাসিকরা যখনি সমাজসমস্যাকে বড় করে তুলেছেন এবং তার চিত্রনেই সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছেন তখনি তাঁদের ব্যক্তি 'আমি'-টি সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয়ে রচনা পুরুষালি হয়ে উঠেছে। স্বর্ণকুমারী, অনুরূপা এবং শৈলবালা ঘোষজায়া ভাবে-ভাষায় নারীর মনের সংবাদটি বহন করতে পারেননি।

প্রবাসী ও মর্ডান রিভ্যু, পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এর দুই কন্যা শান্তা দেবী ও সীতা দেবীর বাঙলা সাহিত্যে আবির্ভাব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তাঁদের লেখা থেকেই উচ্চ শিক্ষিতা বঙ্গ ললনাদের জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে ধ্যানধারণার পরিচয় পাওয়া গেল। উচ্চশিক্ষিতা এবং স্কুলে কলেজের পড়ুয়া মেয়েরা সাহিত্যের মধ্যে তাঁদের স্বরূপ খুঁজে পেলেন। এঁদের সাহিত্যের নায়িকারা ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত হলেও বিলিতিয়ানার ইমিটেশন নয়। অথচ সে সময় বিলিতিয়ানার কেতাদুরস্ত একটি শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটেছিল। স্ত্রী পুরুষে মদ্য পান, থিয়েটার দেখা, পার্টিতে রাত কাটানো, নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা, ইংরাজী বাংলা মিশিয়ে, একটি জগাখিচুড়ি ভাষায় কথা বলা—এ সবই কাল্‌চার বলে মনে হোত।[১৭] সেকালে অনেক মহিলা উপন্যাসিক উচ্চশিক্ষিতা রুচিশীলা নারীর চরিত্র চিত্রনে জগাখিচুড়ি ভাষার ব্যবহার করতেন। ১৩১৮ সালের ভারতী পত্রিকায় আমোদিনী ঘোষজায়ার 'যূথিকা' গল্প সঙ্কলন গ্রন্থের সমালোচনা করা হল—"গ্রন্থোক্ত নায়িকাবর্গের মধ্যে শিক্ষিতা হইলেই প্রায় বাঙলা কথায় ইংরাজী বুকনি মিশাইয়া কথা কহেন। 'শেফালি' গল্পেব বৌদি এবং 'অ-তরঙ্গ' গল্পের লাবণ্য চরিত্র দুটি জলন্ত দৃষ্টান্ত। অথচ লেখিকা এই দুইটি চরিত্রকে ইঙ্গবঙ্গ সমাজের অন্তর্গত করিয়া অঙ্কিত করেন নাই।" (কার্তিক. পৃ-৭২৩) শান্তাদেবী ও সীতা দেবীর রচনায় এ জাতীয় বুক্‌নি লক্ষ্য করা যাবে না। তাঁদের উপন্যাসে নারীর প্রেমের বিচিত্র ও জটিল প্রকাশ। আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম, নারীদের অর্থ নৈতিক কর্মে অংশ গ্রহণ, সমাজ সেবামূলক কার্যে পুরুষের সঙ্গে নারীদের সমান তালে এগিয়ে যাবার সংগ্রাম, যুবক যুবতীর অবাধ মেলামেশা, জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে পুরুষের সমান অভিজ্ঞতার প্রকাশ এবং স্বাধীনভাবে জীবনসঙ্গী নির্বাচনের অধিকারকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। নারী পুরুষের চিরন্তন সম্পর্কের পুনর্বিন্যাসই লেখিকাদের রচনায় প্রধান কথা।

ভারতী গোষ্ঠীর লেখক ও লেখিকারা সমাজের পতিতা নারীদের জীবনের নানা বিড়ম্বনাকে তুলে ধরলেন। সৌরীন্দ্রমোহনের 'নির্ঝর' (১৯১১) মণিলালের 'মুক্তি' (১৯১৪), সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মাটকোঠায়' (১৯২১) হেমেন্দ্রকুমার রায়ের 'কুসুম' ও 'শিউলি' (১৯২১) প্রভৃতি গল্পে পতিতা নারীর বেদনা ও মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষার কথা বলা হয়েছে। পঙ্কিল জীবন থেকে তারা মুক্তি চেয়েছে। শিবনাথ শাস্ত্রী ও দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় পতিতাদের উদ্ধারের জন্য আন্দোলন করে আসছিলেন। শিবনাথের আত্মজীবনীতে এ বিষয়ে বিশদ ইতিহাস আছে। "সেই সমস্ত কন্যা ভবিষ্যৎকালে সুগৃহিণী হইয়া এমন সমস্ত সন্তান সন্ততির মাতা হইয়াছেন, যাঁহারা

সমাজে রত্ন স্বরূপ হইয়া এমন স্থান লাভ করিয়াছেন যে তাঁহাদের বংশের পূর্ব কালিমা আজ আর কেহ স্মরণ পর্যন্ত করে না।"[১৮] মহেশচন্দ্র আতর্থী "নারী রক্ষা সমিতি" স্থাপন করে নিগৃহীতা, অপহৃতা এবং পতিতা নারীদের উদ্ধারের ব্যবস্থা করেন। এ সব আন্দোলন এ যুগের লেখক-লেখিকাদের মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। শান্তা দেবীর 'জীবনদোলা' উপন্যাসে হৈমবতীর 'নারী আশ্রমের' পরিকল্পনা, শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিধবাশ্রম' ও মহেশচন্দ্র আতর্থীর 'নারী রক্ষা সমিতির' আদর্শে গঠিত। এখানে আশ্রয় নিয়েছে স্বামী পরিত্যক্তা নিস্তারিণী, বালবিধবা গৌরী, বাঙালী অভিনেত্রীর কন্যা চঞ্চলা। চঞ্চলার পিতা বিহারের স্বনামধন্য আইনজীবী। গৌরীকে শঙ্কর প্রথম 'হিন্দু বিধবাশ্রম'-এ নিয়ে উঠেছিল। এই বিধবাশ্রমের বর্ণনা তো একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের বর্ণনা। "শ্মশানে বাসরের মত ইহা গৌরীর চোখে বিসদৃশ ঠেকিল। মেয়েগুলির সবই অল্প বয়স, তাহাদের দীনবেশের ও ম্লান মুখের পাশে তাহাদের মাতৃস্থানীয়ার এ রকম সালঙ্কারা মূর্তি দেখিলে মনে হইত কে যেন একটা প্রহসন অভিনয় করিবার জন্য এই মা ও মেয়েগুলিকে সাজাইয়া আনিয়াছে।" (পৃ-১৯)। এর পাশেই হৈমবতীর আশ্রমের চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। সে সময় সারাভারত জুড়ে এমন বহু হিন্দু বিধবাশ্রম গড়ে উঠেছিল। সেবার নামে এগুলি পেশায় পরিণত হয়েছিল। হৈমবতীর আশ্রমের চার পাশে একদল উচ্চশিক্ষিত যুবকদের দেখতে পাই। এরা দেশ সেবার, সমাজ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করেছে। জাতি পাঁতির বিচার তারা করে না। মেথর, চামার প্রভৃতির সেবার মধ্য দিয়ে তারা দেশকে সেবা করতে চায়। তাদের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা সমাজের উচ্চকোটির বাসিন্দা নয়। ফেলি, টেরা, ভেংচু, প্রভৃতি নাম থেকেই বোঝা যায় এদের সামাজিক পরিচয়। 'জীবনদোলা' উপন্যাসের স্থান-কাল লেখিকা নির্দেশ করেছেন—'বাংলা ১৩৩০ সালে। কলিকাতা সহর।' ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধীজীর আবির্ভাব ঘটে গেছে। অচ্ছুৎদের সেবা, জাতি পাঁতির বিরুদ্ধে গান্ধীজীর সংগ্রাম আরম্ভ হয়েছে। শান্তা দেবী ও সীতা দেবী এই সংগ্রামের সরণী ধরে চলার যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন।

রামানন্দ প্রথম জীবনে সুদূর এলাহাবাদে প্রবাসী হয়েছিলেন। এলাহাবাদে জননী মনোরমা দেবীর কাছেই দুই কন্যা (শান্তাদেবী ও সীতা দেবী) লেখাপড়া করতেন। এই সময় রামানন্দের কন্যাদ্বয় ভারতের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সংস্পর্শে আসেন। পিতা ও পিতৃবন্ধুদের সাহচর্যে শৈশব থেকেই কন্যাদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ জেগে ওঠে।

শান্তা দেবী (১৮৯২) ও সীতা দেবী (১৮৯৫-১৯৭৪) বেথুন স্কুলের ছাত্রী ছিলেন।

ম্যাট্রিক পাশ করার আগেই তাঁরা শ্রীশচন্দ্র বসুর সহযোগিতায় 'ফোক টেলস্ অব হিন্দুস্থান' অনুবাদ করতে আরম্ভ করেন। রামানন্দের সম্পাদনায় এবং উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরীর অঙ্কিত চিত্রে শোভিত বইটি ১৯১২ সালে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯১৫-১৬ সাল থেকেই পিতার 'প্রবাসী' পত্রিকায় তাঁরা গল্প লিখতে আরম্ভ করেন। সীতা দেবী ইংরাজী ও বাংলা দুই ভাষাতেই লিখতেন। ১৯১৮ সালে দুজনের যৌথ প্রয়াস 'উদ্যানলতা' প্রকাশিত হয়। তাঁরা 'সংযুক্তাদেবী' ছদ্মনাম ব্যবহার করেছিলেন। ১৯১৭-১৯ সাল পর্যন্ত দুজনেই পিতার সঙ্গে শান্তিনিকেতনে অবস্থান করেন। রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'র পাণ্ডুলিপি সীতা দেবীকে দিয়ে গিয়েছিলেন।

'উদ্যানলতা' (১৯১৯) উপন্যাসে এ-কালের মেয়েদের এবং একালের পরিবারের সুন্দর চিত্র পাই। উপন্যাসে যৌথ পরিবারের চিত্র থাকলেও তা ভাঙনমুখী। এ কালের মেয়েদের বিদ্যালয় ও কলেজ জীবনের সুন্দর চিত্র পাওয়া যাবে। মুক্তির জীবনের বিস্তৃত বর্ণনা অনেকেব কাছেই পীড়াদায়ক বলে মনে হলেও লেখিকাদের প্রথম উপন্যাসেই আধুনিকাদের দৈনন্দিন জীবন ও ধ্যানধারণার পরিচয় পাওয়া যাবে। মুক্তির দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গী ছিল জ্যোতি। জ্যোতি বিলেত চলে গেলে তার জীবনে এল ধীরেন। মুক্তি-জ্যোতি এবং মুক্তি-ধীবেনের সম্পর্কের মধ্যে পরিশীলিত মনের পরিচয় পাওয়া যায়। ঠাকুরমার সঙ্গে মুক্তির ছোট ছোট বিরোধগুলি—নবীনা ও প্রাচীনার বিরোধ। মুক্তির পিতার মধ্যে সম্ভবত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের জীবনের ছায়াপাত ঘটেছে। পিতার অগাধ স্নেহ এবং অবাধ স্বাধীনতা পেয়েও মুক্তির জীবন তেমন বিকশিত হতে পারেনি।

১৯২০-তে ধারাবাহিক ভাবে প্রবাসীতে শান্তা দেবীর 'চিরন্তনী' এবং সীতা দেবীর 'রজনীগন্ধা' প্রকাশিত হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পর অর্থনৈতিক চাপে নর-নারীর ধ্যানধারণার দ্রুতরূপান্তর ঘটেছিল। নারী-পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যকার প্রথাসিদ্ধ পথটি অচল হয়ে যাচ্ছিল। জীবনে কত সমস্যা, কত সংগ্রাম, কত অন্তর্দাহন সীতা দেবী ও শান্তা দেবীর সাহিত্যে তা লক্ষ্য করা যায়। 'চিরন্তনী'-র নায়িকা করুণা এবং 'রজনীগন্ধা'র নায়িকা' ক্ষণিকা দুজনেই জীবিকার জন্য পথে নেমেছে। এরা শিক্ষিতা, আত্মসচেতন, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন এবং পরিবারের প্রতি কর্তব্যপরায়ণ। 'চিরন্তনী' ও 'রজনীগন্ধার' মধ্যে কাহিনীগত মিল আছে। সীতা দেবীর রচনা অনেক বেশি পরিণত। 'চিরন্তনী'-র নায়িকা করুণা কলকাতার একটি স্কুলে চাকরী নিয়ে ভাই. বোন ও দাদা মশাইকে প্রতিপালন করছে। এদের বাঁচিয়ে রাখার সংগ্রামের মধ্যে তার যৌবনের সুখস্বপ্নের মুহূর্তগুলি হারিয়ে যাচ্ছে। এমন সময় তার সামনে

এসে দাঁড়াল কৈশোরের পরিচিত অবিনাশ। অবিনাশ আজ বিলেত ফেরৎ ডাক্তার। আজ সে আশাতীত ঐশ্বর্যের অধিকারী। অবিনাশের ঐশ্বর্য ও বৈভবের পাশে দাঁড়িয়ে করুণার বারবার মনে হয়—'নাই-নাই কিছু নাই, শুধু জীবনভরা দুঃখ আর হতাশা।' অবিনাশের ঐশ্বর্য তার মনে মোহ সঞ্চার করলেও অবিনাশকে সে মনে প্রাণে মেনে নিতে পারেনি। তাই মাঝে মাঝেই করুণার মনে হত 'কিসে তাহাকে টানিতেছে, প্রণয় না প্রলোভন।' ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত তার হৃদয় প্রণয় ও প্রলোভনের মাঝে ঘোরাফেরা করে। অবিনাশ তার চিত্ত, বিত্ত সব দিয়ে করুণার মনকে জোর করে ছিনিয়ে নিতে চাইছিল। অপেক্ষা বা অবসর তার নেই। করুণার মধ্যে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, সংকোচ আত্মমর্যাদা এবং কৃতজ্ঞতার টানাপোড়েন চলে। হৃদয়ের মধ্যে সৃষ্টি হচ্ছে কত জটিল আবর্ত। কখনো সে অবিনাশের কাছে আত্মসমর্পণ করতে চায়, কখনো চায় মুক্তি। করুণার সামনে মূল সমস্যা হল—শুধু নেবার অধিকার কারো নেই, এমন নিশ্চিন্ত বিশ্রাম কি ত্যাগ করা উচিত, ভাগ্যতো দুবার প্রসন্ন হয় না, ভারতীয় নারী চিরদিনই তো অজানার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে, ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করা কি উচিত ইত্যাদি। অবিনাশের ভালবাসা সম্বন্ধে লেখিকার উক্তি—"প্রেমে যে ভিখারীর প্রতীক্ষা ছিল তাহা তাহার ছিল না, যাহা সে চায় তাহা সে নিজেই কাড়িয়া লইতে পারে, এই ছিল তাহার স্পর্দ্ধা ও বিশ্বাস, তাই সে কাড়িয়াই লইয়াছিল। করুণা চাহিতেছিল ঠেকাইতে।" আজ করুণার সামনে দুটি পথ খোলা, আত্মসমর্পণ অথবা আত্মগোপন। শেষপর্যন্ত করুণাকে আত্মগোপন করতে হল। দূরে পল্লীগ্রামে একটা স্কুলে চাকরী নিয়ে সে চলে গেল। এবার তার জীবনে এল প্রকাশ। এ প্রেমে নেই আত্মগ্লানি, নেই আত্মগোপনের ইচ্ছা। প্রকাশের প্রেম করুণার নারীত্বের জাগরণ ঘটিয়েছে। এই আত্মনিষ্ঠ প্রেমের ধর্মই হল আত্মসমর্পণ। অবিনাশের স্বল্পদিন ভাগলপুরে অবস্থান করুণাকে তার ও অবিনাশের সম্পর্কের বিষয়ে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন করেছিল। বিরহ তাকে ব্যাকুল করেনি বরং স্বস্তির নিশ্বাস ফেলার অবকাশ দিয়েছে। কিন্তু প্রকাশের অনুপস্থিতি তার মনের পটে প্রকাশের স্মৃতি জাগিয়ে বাসনাকে দুঃসহ করে তুলেছে। মিলনের আকাঙ্ক্ষায় সে অধীর হয়েছে। অবশেষে প্রকাশের বাহু পাশে ধরা দিয়ে সে মুক্তি পেয়েছে। নারী অন্তর্মুখী, পুরুষ বহির্মুখী। একেই মনস্তাত্ত্বিকেরা বলেছেন,"......greater intuition and greater subjectivity." [১৯] করুণার মানসিক দ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশ নেই বলেই লেখিকাকে তার মনের অবস্থা ব্যাখ্যা করতে হয়।

শান্তা দেবী মধ্যবিত্ত জীবনের চিত্র তুলে ধরতে পারেননি। অবিনাশ-করুণা,

কঙ্কণা-প্রকাশ প্রেমকাহিনীই উপন্যাসের মূল বিষয়। সীতা দেবীর 'রজনীগন্ধা' অনেক পরিণত রচনা। নায়িকা ক্ষণিকা মধ্যবিত্ত শিক্ষকের জ্যেষ্ঠা কন্যা। ঘটনা সংস্থাপন, চরিত্র চিত্রন, বিশ্লেষণ ও মন্তব্যে শিক্ষকের পরিবারের নিটোল চিত্র তুলে ধরেছেন। ক্ষণিকার বড় ভাই প্রবোধ চুরি করে জেলে গেল। পিতা অকস্মাৎ কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হলেন। সংসার অচল হয়ে পড়লো। ক্ষণিকা তার ছোট ভাই লালু ও ছোট বোন মেনকার দিকে তাকিয়ে ভাবে এবা অপরিণত বয়সে দারিদ্রেব চাপে পরিণত বুদ্ধির অধিকারী হয়েছে।

'এখানে ফুলফোটার আগেই তার কাঁটাগুলি তিনগুণ বড় হয়ে ওঠে।' অবশেষে ক্ষণিকাকে চাকরী নিতে হল। চিন্ময় যখন চাকরীর সংবাদ নিয়ে এল, এবং অবিবাহিত অধ্যাপক অনাদিনাথের প্রসঙ্গ তুলে তাকে নিরস্ত করতে চাইলো, ক্ষণিকা অত্যন্ত সহজভাবে বলে—"তুমিও জান, এবং আমিও জানি যে বেঁচে থাকতে হলে টাকা দরকার এবং রোজগার করা ছাড়া টাকা পাবার আমাদের কোন উপায় নেই। এবং বাড়ীতে রোজগার করতে সক্ষম এবং ইচ্ছুক আমি।......আত্মসম্মান বজায় রেখে সে কাজ কবা যদি সম্ভব হয় ত আমি নিশ্চয়ই করবো। যা বিপদ নয় তাকে বিপদ ভাববার, যা অপমান নয় তাকে গায়ে পড়ে অপমান মনে করার সময়ও আমার নেই, সুবিধাও নেই।" একটি অবিবাহিতা যুবতী নারী কাজ নিয়ে যে বাড়ীতে এল তার অধিবাসী একজন যুবক অধ্যাপক, শিশু-ভাগিনী এবং বৃদ্ধা বাতগ্রস্ত জননী। অনাদিনাথ ও ক্ষণিকার মধ্যে নিঃশব্দে প্রেম সঞ্চাবিত হল। অধ্যাপক বিবাহ করলো ক্ষণিকাব শিক্ষিকা মনোজাকে। ক্ষণিকা জানে তার ব্যক্তিজীবনের চাওয়া-পাওয়ার চেয়ে বড় একটি পবিবারেব জীবন মরণ। এ যুগের ক্ষণিকারা জানে—"ঘর সকলেব জন্য ভগবান রাখেনা, তবুও তাদের থাকতে হয়?" জীবনে নানা বিপর্যয় আসে তাই বলে জীবনকে ব্যর্থ করে দেওয়া যায় না। লেখিকা ক্ষণিকার মনের অবস্থার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বললেন—"দিনের আলোয় তাহার রাত্রের চিন্তা যেন লজ্জায় ম্লান হইয়া চোখ মুদিয়া ফেলিল। জ্যোৎস্না রজনীতে যাহা জীবনে গভীরতম সত্যের রূপ ধরিয়া আসে, মধ্যাহ্নের প্রখর দীপ্তিতে তাহা পাগলের প্রলাপের মত অর্থহীন, যুক্তিহীন, অবজ্ঞেয় হইয়া পড়ে।" এতদিন বাংলা সাহিত্যে প্রেমসর্বস্ব নারী ভাবনা একাধিপত্য করে আসছিল, তার অবসান হল। জীবনের সামনে নানা সমস্যা দেখে করুণারা বিচলিত নয় বরং কঠিন সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত। তারা পুরানো সংস্কার ও জীবনবোধের প্রাচীর টপ্‌কে সম্ভাবনাময় জীবন প্রাঙ্গনে বেরিয়ে পড়েছে। তাদের জীবনে অনুভূত হচ্ছে প্রচণ্ড আবেগ এবং প্রবল আসক্তি। মনের গতিপ্রকৃতি এখন আর একমুখী নয়—

বহুমুখী। ব্যক্তিজীবনের প্রেম-ভালবাসা নিয়ে আত্মচারণার অবকাশ খুবই কম। অনাদি মেয়েদের রূপান্তরের প্রসঙ্গ তুললে ক্ষণিকা বলে—"মেয়েদের বুদ্ধি বেড়েছে কিনা জানিনা, তবে সে সম্বন্ধে সচেতন তা খুব বেড়েছে। আগে মেয়েরা কাজে যেমন বাঁধা নিয়ম মানতো, মনেও তেমন মানতো, এখন কাজে অবাধ্য হবার সাহস যদিও কম জাগাতেই পায়, কিন্তু মনে মনে যে মন্ত্র আওড়ায় তা একেবারেই মনু-সংহিতায় নেই।" (পৃ-১৬৮) তাই এই সমাজ রূপান্তবের সবচেয়ে বড় ভূমিকা মেয়েদের। পুরুষ রচিত মনু-সংহিতাকে বাতিল করে তারা নতুন সংহিতা রচনায় রত হল।

মনোজার মৃত্যুর পর আদিত্যনাথ সংসারের পাট তুলে নিরুদ্দেশ হল। চিন্ময় জেল থেকে ছাড়া পেয়ে ক্ষণিকাকে বলেন—"আমার চাওয়ার কোন বদল হয়নি। তোমার উত্তর কি এখনো বদলাবার দিন আসেনি।" ক্ষণিকার উত্তর—"হয়তো এসেছে। কিন্তু আমার অতীত জীবনকে তুমি আমারই থাকতে দিও। তার সুখ দুঃখ যা তা শুধু ভগবান আর আমার মধ্যেই থাক। আমার বর্তমানকে আমার ভবিষ্যৎ জীবনকে তুমি নাও।" (পৃঃ-৩৭১)। অতীতের মধ্যেই তার যৌবনের প্রথম ফুলগুলো ফুটেছিল। তাকে সে অস্বীকার করবে কেমন করে? আর তা সে করতেও চায়না। এযুগের মেয়েদের বক্তব্য—"স্বাধীনচিত্ত সততার লীলভূমি। যেখানে সততা নেই প্রতিভা জন্মায় না। স্বাধীনতা না হলে সততা রাখা বড় কষ্ট সাধ্য। কেননা আত্মরক্ষা বলে যে একটা সহজাত সংস্কার আছে তা দুর্বলচিত্তের সততাকে নষ্ট করে মিথ্যা বলিয়ে, সরল চিত্তের সততাকে নষ্ট করে আত্মহত্যা করিয়ে।"[২০]

শান্তা দেবীর 'জীবন দোলা'-র নায়িকা বালবিধবা গৌরী। সে শিক্ষার মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করেছিল। তাই সে নিজের হৃদয়, কামনা, বাসনার চেয়ে সমাজ-বিধিকে অধিক মূল্য দিতে পারেনি। আজ সে বঞ্চনায়, ব্যর্থতায় জীবন বহন করতে অক্ষম। সঞ্জয়ের হাতে দেহ-মন সঁপে দিয়ে বলে—"আমার আজন্মের বেদনাকে দূরে সরিয়ে মুহূর্তের আনন্দ যে অমৃত রসে অনন্ত হয়ে উঠেছে। আমাকে ওসব কথা তুমি আর বলনা।" নটীর কন্যা চঞ্চলার বড় পরিচয় সে নারী। নারীর সকল বাসনা তার আছে—নেই কেবল সামাজিক পরিচয়। শিক্ষা তাকে দিয়েছে আত্মমর্যাদা এবং আত্ম-অভিমান। সে পুরুষের মহানুভবতার কাছে বশ্যতা স্বীকার করবে না। কেননা তা প্রেম নয়। গৌরী ও চঞ্চলার কাছে সামাজিক প্রশ্ন বড় নয়, বড় তাদের নারীত্বের একান্ত প্রশ্ন। তাদের কাছে সমাজ ধর্ম বড় কথা নয়, বড় কথা ভালবাসা।

সেকাল-একালের পার্থক্যটুকু নারী মুখেই শোনা যাক্। "সেকালের জীবন-যাত্রার যতই সৌন্দর্য ও সামঞ্জস্য থাক্ না কেন, এখানে আমরা তাহা ফিরাইয়া আনিতে পারিব না, কেননা আজকাল আমরা তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিব না, সে সকল নির্ভরের ভার হারাইয়াছি।...এখন হইয়াছে পরীক্ষার কাল, স্বাধীনতার কাল।"[২১] শান্তা ও সীতা দেবীর নায়ক-নায়িকাদের জাত-ধর্মের, শুচি অশুচিব বালাই নেই। তারা পুরুষের হাতে হাত মিলিয়ে সমাজসেবায় নেমেছে। তারা শাস্ত্রের, লোকাচারেব দোহাই দিয়ে জীবনকে গণ্ডীবদ্ধ করতে প্রস্তুত নয়। বরং জীবনেব প্রয়োজনে শাস্ত্র বা লোকাচারকে গ্রহণ ও বর্জন করে। সীতা দেবীর 'আলোব আড়ল', 'ভ্রষ্টতারা', 'রামলীলা', 'স্পর্শমণি', প্রভৃতি গল্পে রূপহীনা কনক, ব্যর্থপ্রেমিকা সুরমা, বিধবা মায়ের একমাত্র ছেলে দুলাল আর পক্ষাঘাতগ্রস্ত ফুলবালা দীর্ঘদিন পাঠককে আনন্দ দেবে। 'পরভৃতিকা' পথিক বন্ধু এবং কন্যা 'রজনীগন্ধার' মত সার্থক সৃষ্টি নয়।

এ সময় কলকাতায় ফোর আর্টস ক্লাব (১৯২১) প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ক্লাবেই নারী-পুরুষ মিলে কলাবিদ্যার চর্চা আবম্ভ হয়। বাংলা দেশ তথা ভারতবর্ষে সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চার জন্য নারী-পুরুষ সম্মেলন, এই প্রথম। এই সভার উৎসাহী কর্মী ছিলেন গোকুল নাগ, দীনেশ দাস, সুনীতি দেবী, নিরুপমা দাশগুপ্তা ও মনীন্দ্রলাল বসু। এঁরাই কল্লোল পত্রিকার স্রষ্টা। এই সম্মেলন নিয়ে কলকাতায় নানা অপবাদ ছড়িয়ে পড়েছিল। ব্রাহ্মসমাজের প্রার্থনা সভায় এদের একজনকে অপবাদের অছিলায় অপমান পর্যন্ত করা হয়।[২২] প্রথম যুদ্ধোত্তবকালে কল্লোল গোষ্ঠী য়ুরোপের কাছ থেকে ধার করেছিল মনুষ্যত্বে শ্রদ্ধেয়তা, জনগণতান্ত্রিক চেতনা, যৌনবোধ, মিথুনাসক্তি ও মনস্তত্ত্ব। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে অবাধ শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে দেখা দিয়েছিল বিপুল বেকারত্ব। পুরুষের জীবনের এই প্যাটার্ণ মেয়েদের জীবনকেও অবিকৃত থাকতে দেয়নি। সমাজে নারীদের স্থান, নারী এবং পুরুষ সম্পর্ক নিয়ে নতুন করে ভাবনা-চিন্তার অবকাশ এল। কল্লোল গোষ্ঠী মার্কসীয় ভাবনার পাশাপাশি ফ্রয়েডীয় যৌন জীবন ও সম্ভোগ-স্পৃহার প্রসঙ্গকেও প্রাধান্য দিল। "Marx and Freud dominate the thought of the post 1918 world."[২৩] নারী প্রসঙ্গে এবার এল যৌন স্বাধীনতার ব্যাপার। এবার নারী সম্বন্ধীয় আলোচনার বিষয় হল—সতীত্বের মূল্য কতটুকু, নারী পুরুষের সমান অধিকার, ডির্ভোসের অধিকার, বিবাহিত নারীর সন্তান ধারণ কি আবশ্যক, কুমারী জীবনে সন্তানের সামাজিক মর্যাদা প্রভৃতি বিষয়।

কল্লোলের পাতায় বুদ্ধদেব অচিন্ত, প্রেমেন্দ্রের নারীদেহ নিয়ে ভাব-বিলাসিতার

পাশাপাশি নীলিমা বসু 'ঝরা ফুল' এ মহিলা মহলের সমকামিতার চিত্র তুলে সকলকে চমকে দিলেন। নৃসিংহদাসী দেবীও যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। এর পাশাপাশি স্বাধীনতার জন্য, যৌবনের তীব্র জ্বালার ইতিহাস উপেক্ষার নয়। সত্যগ্রহ আন্দোলনে হাজার হাজার নারী বুকপেতে পুলিশের লাঠি ও বেয়নেটকে সহ্য করেছে। ঢাকায় 'দীপালী সঙ্ঘ' (১৯২৩) সমাজসংস্কার আন্দোলনে হাত দিল। শান্তা দেবী, সীতা দেবী, নিরুপমা ও অনুরূপা দেবীর কোন কোন উপন্যাসে তার ছায়াপাত ঘটেছে। লাঠি ও অসি খেলার মধ্য দিয়ে মেয়েরা স্বাবলম্বী হয়ে গড়ে উঠতে চাইলো। এরা প্রচার করতে লাগলো—'সমাজে ও রাষ্ট্রে নারী পুরুষের অধিকার সমান।'[২৪] লতিকা ঘোষের নেতৃত্বে ১৯২৭ সালে 'মহিলা রাষ্ট্রীয় সঙ্ঘ' এবং ১৯২৮ সালে 'স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনী' গঠিত হল। ১৯২৩ সালের এপ্রিল সংখ্যায় মডার্ণ রিভ্যু পত্রিকায় কামিনী রায়ের 'উইমেন লেবার ইন্ মাইনস্' নামক প্রবন্ধে কয়লা খনি অঞ্চলে কর্মরত নারীদের নানা সমস্যার কথা আলোচিত হল।[২৫] ১৯৩৬ সনে দি অল্ ইন্ডিয়া উইমেন্স কন্ফারেন্সে নারীর সম্পত্তির অধিকার, বিবাহবিচ্ছেদ আইন, জন্মনিয়ন্ত্রণ, চাকুরী ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমানাধিকার, রাজনীতি বিষয়ে নারী-পুরুষের সমান মর্যাদার কথা বলা হল। ১৯৪৪ সালে 'বুলবুল-ই-হিন্দ', সরোজিনী নাইডুকে সারা বোম্বাই শহরের পক্ষ থেকে জাতীয় সম্বর্ধনা দেওয়া হল।[২৬] নারীরা বারবার 'লিগ্যাল আটিটিউড্'-এর পরিবর্তন চাইছিলেন। কন্ফারেন্সের সপ্তদশ অধিবেশনের সভানেত্রী কমলাদেবী বললেন, 'মেয়েদের অধিকারকে অবহেলা করার অর্থ জীবনকে অস্বীকার করা।'[২৭] শান্তা দেবী কল্লোল ও কালিকলমের কাল সম্বন্ধে পরবর্তীকালে মন্তব্য করেছিলেন—'অন্ত্যজ, পতিত, বিদেশী বা বিধর্মীকে হৃদয়পদ্মে বসিয়ে যতই কবিতা লিখি না কেন তার আওয়াজটা মেকি টাকার ধ্বনির মত শূন্যগর্ভ শোনাবে, যদি না তা আমাদের জীবনের সত্যকার ছবি হয়। আমাদের জীবনধারায় অতবড় বিপ্লব কি হয়েছে যে সাহিত্যে বড় বড় বিপ্লবী দেখা দেবে।"[২৮] এই বিপ্লবের জন্য অপেক্ষা করতে হবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও ভারতের স্বাধীনতা লাভের জন্য।

প্রভাবতী দেবী সরস্বতী (১৮৯৬-১৯৭২)

প্রভাবতী দেবী সরস্বতী অনুরূপা দেবীর সমগোত্রীয়া, কিন্তু পরবর্তীকালের লেখিকা। উপন্যাস, ছোট গল্প, নাটক, শিশু সাহিত্য সব মিলিয়ে প্রায় দুইশত গ্রন্থ রচনা করেছেন। পরিমাণের দিকে থেকে তিনি বাংলা সাহিত্যের পূর্ববর্তী সব লেখককে ছাড়িয়ে গেছেন।

সম্ভবতঃ 'অন্ধা' (১৩২৯) প্রভাবতীর প্রথম উপন্যাস। অনুরূপা দেবীর 'মা' উপন্যাসের সঙ্গে মিল রয়েছে। সুবিমলের দুই স্ত্রী—মৃদুল ও নিরুপমা। প্রথম স্ত্রী মৃদুল সন্তান প্রসবকালে অন্ধ হল। সুবিমল বেথুনের ছাত্রী নিরুপমাকে বিবাহ করলো। নিরুপমা পিয়ানো বাজিয়ে গান করে, স্বামীর সঙ্গে হেসে কথা বলে। স্বামীকে বশ করার সব মন্ত্রই তার জানা। মৃদুল উপেক্ষিত হল। স্বামী এবং সতীনের অবজ্ঞায় ব্যথিত মৃদুলকে খৃষ্টান নার্স সান্ত্বনা দিয়ে বলে—"আমি তোমার বোন।" উত্তরে মৃদুল বললো—"তুমি খৃষ্টান আমি হিন্দু—কেমন করে আমার দিদি হবে তুমি? পার্থক্য অনেক দূর।" মৃদুলের দাদা সুবিমলকে উপেক্ষা করলে মৃদুলের উক্তি—"সে আমার কাছে দেবতা দাদা। হাজার লাঞ্ছনা করুক, তবু আমি তার পায়ের ধুলো নেবার কাঙ্গালিনী।" এতো অনুরূপা দেবীর মনোরমার উক্তির প্রতিধ্বনি। নিরূপমা ব্রজরাণীর দ্বিতীয় সংস্করণ। মৃদুলের হাত ধরে নিরূপমা বলে—"তোমার জিনিস তুমি নাও দিদি, আমরা তোমায় নিতে এসেছি।" 'বিধবার কথা' গল্পের নায়িকা নীহার তের বৎসর বয়সে বিধবা হল। একদিন গ্রামে রটে গেল সে অন্তঃসত্ত্বা। জমিদার হরলালের পুত্র তাকে ভোগ করেছে। সে দায়িত্ব পালন না করে আবার বিয়ে করেছে। নীহার আত্মহত্যা করলো। 'বাংলার মেয়ে'-র পূরবী দিদির দেবরকে ভালবেসে ছিল। কিন্তু কোনদিন মুখ ফুটে বলতে পারল না। বিষ খেয়ে মরার পর আঁচলে চিঠি পাওয়া গেল। 'একজনকে হৃদয় দিয়ে, আর একজনকে দেহ দিয়ে দ্বিচারিণী হতে পারব না বলে চলে যাচ্ছি।' 'দানের মর্যাদা'-য় বালবিধবা সতীর বেদনা আভাসিত। অনুরূপা দেবীর মত প্রভাবতী দেবীর উপন্যাসে পাশ্চাত্য শিক্ষা বনাম দেশীয় শিক্ষা, বর্ণাশ্রম ধর্ম, বৈধব্য জীবনের পবিত্রতা, দেশীয় ও বিদেশীয় সংস্কৃতির বিরোধ বড় হয়ে উঠেছে। 'পথের শেষে' উপন্যাসে উপেন্দ্রের দুই পুত্রই, জিতেন্দ্র ও সত্যেন্দ্র ইংরাজীয়ানায় মত্ত হয়ে পিতা-মাতা, স্ত্রী-পুত্রদের উপেক্ষা করে, আত্মসুখে মগ্ন হল। প্রভাবতী দেবী বীথির মধ্যে আদর্শ আধুনিকাকে খুঁজে পেয়েছেন। উপেন্দ্র বীথির মধ্যে যেন খুঁজে পান প্রাচ্য সংস্কৃতি ও পাশ্চাত্য শিক্ষার মিলন। দেবীরাণী, ভবানী, বীথিদের আদর্শ গৃহবধূ হবার সব গুণই ছিল। ইংরাজী শিক্ষায় পুরুষরা উচ্ছৃঙ্খল হওয়ায় তাদের জীবন ব্যর্থ হল। এই উপন্যাস 'বাংলার মেয়ে' এই নামে যোগেশ চৌধুরী কর্তৃক নাট্য রূপান্তরিত হয়ে বাংলা রঙ্গমঞ্চে ও ছায়াছবিতে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। 'দূরের আশা'-র সীতা, রামায়ণের সীতার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। 'আমি যারে চাই', উপন্যাসের বিধবা প্রতিভা শৈলেশকে ভালবেসে ছিল। দিদি সুষমা প্রতিভাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলেন। প্রভাবতী দেবীর কাছে বিধবার প্রেম

নৈতিক চ্যুতি বলেই মনে হয়েছে। প্রভাবতী দেবী, অনুরূপা দেবীর প্রদর্শিত পথেই এগিয়ে গেছেন।

জ্যোতির্ময়ী দেবী (১৮৯৪ —)

জ্যোতির্ময়ীর বাল্য শিক্ষাজীবন কেটেছে রাজস্থানে। তাঁর 'রাজা ও রাণীর যুগ' গ্রন্থে প্রবাসী বাঙ্গালী মেয়েদের শিক্ষার একটি সুন্দর চিত্র দিয়েছেন। তিনি সুমিত্রা দেবী ছদ্মনামে সাহিত্যিক জীবন আরম্ভ করেন। ১৩৪১-এ তাঁর প্রথম উপন্যাস 'ছায়াপথ' প্রকাশিত হয়। সুপ্রিয়ার জীবনে, প্রথম প্রেমিক অজিত। অজিতের প্রত্যাখান সুপ্রিয়াকে পুরুষের প্রতি বিমুখ করে তোলে। তার ধারণা নারীর অর্থ-নৈতিক স্বাধীনতা না থাকার জন্যই এই উপেক্ষা। নিজের সম্বন্ধে সে বড়ই সচেতন। এবার তার জীবনে এল বিভাস। কিন্তু সে ঠিক করেছে, আর বিবাহ করবে না। তবুও বিভাসকে বিবাহ করতে হল। সে বিভাসকে বলেছে—"আপনারা আমাদের ভার নিয়ে কৃতার্থ করে দেন তা' এই আর্থিক স্বাধীনতা থাকে না বলে।···আর্থিক স্বাধীনতা সব মেয়েরই থাকা উচিত, কমই হোক আর বেশিই হোক।" সুপ্রিয়াদের মত শিক্ষিতা নারীরা অর্থ নৈতিক স্বাধীনতা ব্যতীত জীবনকে ভাবতেই পারছে না। সুপ্রিয়ার চাকরি নিয়ে বিভাসের সঙ্গে বিরোধ দেখা দিলেও পরবর্তী কালে মিলনের চিত্র দিয়ে উপন্যাসের পরিণতি টানা হয়েছে। সুপ্রিয়া-বিভাসের মধ্যে বিরোধ বিবাহ পরবর্তী জীবনেও জের টেনে ছিল। এদের দাম্পত্যজীবনের মধ্যে আগামী দিনের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ও অধিকারবোধের প্রতিধ্বনি শোনা গেল। 'বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ' (১৯৪৮) এর নায়ক ধনীর পুত্র। শৈশবে পিতৃবিয়োগ হল। আত্মীয়স্বজন নীতীশের সম্পত্তি গ্রাস করলো। জ্যেঠতুত ভাই বোনদের স্বার্থপর, হৃদয়হীন আচরণে একদিন সে গৃহত্যাগ করলো। ভাগচক্রে সে রাজস্থানে এসে উপস্থিত হল এবং স্বাধীন জীবিকা গ্রহণ করলো। রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সে জেলে গেল। সেখানেই তার মৃত্যু হল। 'একাদশী' গল্পের বাল্-বিধবা শানু, 'কালমেঘ' গল্পের খ্রীস্টান মহিলার জীবনবৃত্তান্ত এবং 'চিরকালীন' গল্পে নিষিদ্ধপল্লীর যুঁই ও মল্লিকার ভদ্র জীবন যাপনের বাসনা দরদ দিয়ে অঙ্কন করেছেন। রাজস্থানের পটভূমিকায় রচিত গল্পগুলিতে তিনি ধূসর মরু অঞ্চলের অনেক অজানা সংবাদ ও কাহিনী শুনিয়েছেন।

আশালতা দেবীর 'অন্ধকারের অন্তরেতে' (১৩৪২) উপন্যাসেও বিবাহ পরবর্তী জীবনের সমস্যার কথাই প্রাধান্য পেয়েছে। কমলেশের স্ত্রী শ্রীলেখা। সুমিত্রা সেন তার পূর্ব প্রণয়িনী। কমলেশও শ্রীলেখার বিবাহের পর অকস্মাৎ একদিন সুমিত্রার

সঙ্গে কমলেশের দেখা হল। কমলেশের জীবনে শ্রীলেখা ও সুমিত্রাকে নিয়ে দ্বন্দ্ব দেখা দিল। শ্রীলেখা নিজেকে অপমানিত ও উপেক্ষিত বলে মনে করলো। সে চলে গেল কলকাতায় তার দাদার কাছে। শ্রীলেখা মডার্ন মেয়ে হলে কি হবে মনের মধ্যে সেই সূক্ষ্ম খোঁচাটুকু—ওর স্বামীর প্রিয়া সে নয়—এতবড় কথাটাকে সে নিঃশব্দে সহ্য করে নেবে কি করে? শ্রীলেখার আভিজাত্য এবং আত্মমর্যাদা জ্ঞানটুকু টনটনে। বিধবা দিদি ইন্দ্রাণীকে সে বলে, "আমাকে যে মর্মান্তিক ব্যথা দিয়েছে তাকে ক্ষমা করতে পারবো না, এতে যে যা পারে আমাকে বলুক।" দাদার বন্ধু ফ্রান্স-ফেরৎ রঞ্জিতের সঙ্গে সে দেশভ্রমণে গেল। 'নব্যতন্ত্রে শিক্ষিতা' শ্রীলেখা রঞ্জিতকে বন্ধুভাবে নিয়েছিল, প্রেমিক বলে নয়। রঞ্জিতরা নারীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যকে ভালবাসা ছাড়া, আর কিছুই ভাবতে পারে না। শ্রীলেখা অপমানিত হয়ে বলে, 'এছাড়া অন্য কোন সম্পর্ক তোমাদের হতে নেই।'

শিক্ষা, স্ত্রী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, জীবনের নানা ক্ষেত্রে অভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণের ফলে নারী-পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য ক্রমশই কমে আসছে। এ কালের মেয়েরা যৌথ পরিবার পছন্দ করছে না। নারীর স্বাতন্ত্র্যবোধ, অর্থনৈতিক স্বাধীনতার স্পৃহা ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছে। নারী-পুরুষ, স্বামী-স্ত্রী, মাতা-কন্যা, পিতা-পুত্র প্রভৃতির মধ্যের মূল্যবোধ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আশালতা সিংহ, প্রভাবতী দেবী, রাধারানী দেবী, বাণী রায় প্রভৃতির রচনায় নূতন সম্পর্ক গড়ে ওঠার চিত্র পাওয়া যাবে।

আশালতা সিংহের (১৯১১) নায়িকারা উচ্চশিক্ষিতা এবং সপ্রতিভ। সাহিত্য সঙ্গীত, খেলাধূলা এবং দেশবিদেশের নানা খবরে তাঁর নায়িকাদের মন সমৃদ্ধ। উগ্র স্বাধীনতাপ্রিয়তা এবং উগ্র ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধের ফলে পরিবার ও সমাজে যে সমস্যা দেখা দিচ্ছে তিনি তারই কথাকার। তাঁর উপন্যাসের নারীজীবনের নানা সমস্যার কথা থাকলেও তিনি নায়িকাদের জীবনে একটা সমাধান বা সামঞ্জস্য এনে দিয়েছেন। 'সমর্পণ' উপন্যাসের নায়িকা সুরমা জীবনে ও পরিবারে সব রকম আতিশয্যের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। রূপতৃষ্ণা ঐশ্বর্যতৃষ্ণা প্রভৃতির বিরুদ্ধে সে যেন নিজেই নীরব প্রতিবাদ। তার ব্যক্তিত্বের কাছে হরলাল ও সুপ্রকাশ খুবই নিষ্প্রভ। নূতন শিক্ষার মধ্য দিয়ে তারা যে 'লাইফ প্যাটার্ন' গড়ে তুললো চার পাশের সমাজ পরিবেশের মধ্যে তার সাদৃশ্য খুঁজে না পাওয়ায় বিরোধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়লো। গৃহস্থালীর কাজ এখন আর মেয়েদের আবশ্যিক গুণ বলে বিবেচিত হচ্ছে না।

'অন্তর্যামী' গল্পে অমলার জীবনে একই সঙ্গে এল সুকুমার ও অমিয়। সুকুমার কবি এবং অমিয় ব্যবসায়ী। সুকুমারকে অমলা ঘৃণা করতো। তার কবিতার সে

ছিল কঠিন সমালোচক। অমিয় বিদেশ থেকে পটারীতে ডিগ্রী এনেছে। অমিয়কে অমলার ভাল লাগতো। অথচ সে বিয়ে করলো সুকুমারকে। অমিয়র উপর তার দুর্বলতা রয়েই গেল। একদিন সুকুমার অফিসের কাজে অমলা ও অমিয়কে বাড়ীতে রেখে বাইরে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। অমলা সুকুমারকে ডেকে বললো—"বাড়ীতে পুরুষ মানুষ বন্ধু এসেছে। দ্বিতীয় একটি লোক নেই, আর আমাকে একলা ফেলে আমার ওপরই সব ভার দিয়ে চলে যাচ্ছ।" অমলা তার দুর্বলতা সম্বন্ধে খুবই সচেতন। সুকুমারের তিরস্কারে অমলা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে—'নিজেকে যে আমি আজও ভাল করে জানিনে।' কত দুর্বোধ্য তার হৃদয়। আজ সে কত অসহায়। তাই বলে কোন রকম মিথ্যাচাব নেই। 'প্রেমে-পড়া' গল্পে কলেজের তথাকথিত ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল মেয়েদের পরিচয় তুলে ধরেছেন। কলেজ কমনরুমে মেয়েদের আলোচনার বিষয়বস্তু বুদ্ধবোসের নতুন বই, শাড়ী, ব্লাউজ, কাউন্সিল, ডিভোর্সের বিল, রাশিয়ার কম্যুনিজম্, ইসাডোরার 'মাই লাইফ' অরবিন্দের 'সিনথিসিস অব ইয়ং', ওয়েলস সাহেবের 'টাইম মেসিন' বা ফোর্থ ডাইমেশন ইত্যাদি। নায়িকা অলকানন্দার ধারণা মেয়েরা হাজার বার প্রেমে পড়তে পারে কিন্তু বন্ধুত্ব করতে পারে না। সে ধনীর কন্যা। তাদের বিশাল অট্টালিকায় বাবা, মা, ভাই, বোন সকলে এক সঙ্গে থাকলেও তারা প্রত্যেকেই বড় নিঃসঙ্গ। "এ যেন একটা গ্রহ থেকে আর একটা গ্রহের যতদূর ততটাই ব্যবধান।" অলকার ধারণা প্রেম এদের কাছে তুচ্ছ ব্যাপার। "অর্থের ক্ষেত্র ছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এরা মানুষের চেয়ে ছোট অর্থাৎ 'সাব ম্যান'।" তাই অলকা এদের সঙ্গে ভালবাসার মনস্তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করার কথা ভাবতেই পারে না। প্রেমে পড়া বা প্রেমতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা অপেক্ষা বই পড়তে ভালবাসে। মীরার মাস্টার নরেশের সঙ্গে সে নারীর নারীত্ব এবং পুরুষের পৌরুষ নিয়ে জমিয়ে তর্ক করে। অলকা চায় নারী-পুরুষের মধ্যে একটি সহজ সম্বন্ধ। নারী বন্ধু, কেবল উত্তেজনার বস্তু নয়। কিন্তু প্রকৃতির এমনই বিধান "পাশাপাশি থাকলেই উত্তেজনা হবে। আর ঐ মধুর উত্তেজনাকে ভালোকরে পালিস করাতেই মেয়েদের এত সজ্জা এত উপকরণের দরকার।" নারী-পুরুষের বন্ধুত্ব এখনও একটা আইডিয়া মাত্র। অলকা তাই নিজেও নরেশের কাছে ধরা দিয়ে ফেলে। 'সমী ও দীপ্তি'-তে (১৩৪৬) লেখিকা মন্তব্য করেছেন —"এ যুগের নর-নারী ক্রমশ নিজেদের আবিষ্কার করিতেছে।" 'লগন বয়ে যায়' গল্পের তরুণিমা, মাধবী ও সাথীরা জীবনটাকে ফুলের মত শোভাগন্ধময় বলে মনে করে। অথচ তাদের সখ তারা দেশসেবা করবে, অর্থ নৈতিক অধিকারের জন্য আন্দোলন করবে। তারা এক সাথে হলেই তাদের আলোচ্য বিষয় ভিয়েনার কুকুর মেডেল পেয়েছে না

সার্টিফিকেট পেয়েছে। অথচ এদের পাশেই পথ চলেছে শোভনরা। এরা 'লাভ মেকিং'—এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে জীবনের আদর্শ, লক্ষ্যকে। জীবনকে তারা গভীরভাবে জানতে চায়।

'মধুচন্দ্রিকা' উপন্যাসের নায়িকা সুনন্দা বেথুন কলেজে আই. এ. পড়া মেয়ে। দাম্পত্য-জীবন সম্বন্ধে তার একটা ধারণা গড়ে উঠেছে। "প্রথম হইতে কল্পনা করিয়া আসিয়াছে বিবাহের পরই স্বামীর ঘরণী গৃহিণী হইবে, তথাকার সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধিশ্বরী পদে অভিষিক্তা হইবে। কোন বন্ধন নাই, কোন জটিলতা নাই। সরল স্বচ্ছ স্বাধীন জীবন।" সুনন্দার ভাবী স্বামী চাকরী করে না। এখন তার পাঠদ্দশা। সুনন্দার ভাগ্যে জুটলো 'সত্যযুগের মানুষ'। সুনন্দা মানুষ হয়েছে নব্যশিক্ষা এবং নবযুগের আলোতে। শচীকান্ত বিনয়ী এবং পিতৃমাতৃবৎসল বলেই সে এযুগে জন্মেও সত্যযুগের মানুষ হয়ে গেছে। শচীকান্ত যৌথ পরিবারে বাস করে, উপার্জন না করে বিবাহ করে—এগুলি দোষ না হলেও, মেয়েদের কাছে গুণ বলে প্রতিপন্ন হচ্ছে না। শিক্ষিতারা পরিবার বলতে বোঝে স্বামী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা। সুনন্দার সতীর্থ লটি মিত্রের বিয়ে হয়েছে ডেপুটীর সঙ্গে। সুনন্দার স্বামী ও তার পরিবারেব সব কথা শুনে লটি মিত্র বলে, "কি আশ্চর্য, সুনুর যথেষ্ট জ্ঞানবুদ্ধি হয়েছে, স্বাধীন মতামত রয়েছে, সে যদি এ হীনতা স্বীকার কবতে না চায়। বিয়ে মানে আত্মসম্মান বিসর্জন নয়। আজকের দিনে এ কথা না মেনে উপায় নেই।" সুনন্দা সাওতাল পরগণায় মধুচন্দ্রিকা যাপন করতে যেয়ে বুঝলো, আলাদা কবে ঘব-সংসার করাব কোন যোগ্যতা তার নেই। পুঁথিপড়া বিদ্যাই তার সম্বল। 'বুদবুদ'—গল্পে কালীমোহনের শিক্ষিতা স্ত্রী দাস-দাসীর উপর বাড়ীর সব ফেলে সমাজসেবা, শ্রমিকউন্নয়নের কাজ করে বেড়ান। ড্রইং রুমে পাখার তলায় বসে বরফ দেওয়া ঠাণ্ডা জল খেতে খেতে শ্রমিকদের কথা ভেবে 'বুক ফেটে যায়'। অথচ কালীনাথ, পুত্র কন্যারা কি খায়, কখন ঘরে ফেরে, তাদের কি প্রয়োজন, কোন সংবাদই তিনি রাখেন না। এ জাতীয় মিথ্যাচারকে আশালতা সিংহ তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছেন। 'চিরন্তন ভ্রান্তি'-তে চপলা সন্তানকে মানুষ করার জন্য মন্তেশ্বরী, বার্টণ্ড রাসেল, রবীন্দ্রনাথের শিশুভোলানাথ, ক্রিসেণ্ট মুন প্রভৃতি গ্রন্থ পড়ে। তার সব জ্ঞান, সব প্রয়াসকে ব্যর্থ করে দিল তার মেয়ে। 'কনে-দেখা'-র সুন্দরী বিমলার বিয়ে হল মধ্যবিত্ত পরিবারে। অথচ কনে-দেখার সময় তাকে বায়রন, কীটস, দেশী-বিদেশী রান্নার, আরও কতশত আজগুবী প্রশ্ন করা হল, যার সঙ্গে পরিবার বা দাম্পত্যজীবনের কোন সংযোগ নেই। একালের মেয়েদের বক্তব্য—"আমাদের বিয়ে মানে বাঁদীগিরি নয়, পার্টনারশিপ।

সমান অধিকার, সমান দাবী।" (বিনাপণের-মর্যাদা)। 'কলেজের মেয়ে' উপন্যাসের উচ্চশিক্ষিতা সুমিত্রার, স্বামীগৃহে স্বামী ব্যতীত তার আগ্রহ খুবই সীমিত। সুমিত্রার কুমারীজীবনের স্বপ্ন এবং বিবাহিতজীবনের বাস্তব অবস্থার সঙ্গে কোন মিল নেই। স্বামীর সঙ্গে তার কর্মস্থল কলকাতায় থাকতে চায়। স্বামীকে সে স্পষ্ট করেই বলে—'তাদের জন্য আমাকে বিয়ে করে আননি।' সুমিত্রা স্বামী সুধীরের মা-বাবা-ভাইবোনের সঙ্গে থাকতে রাজী নয়। সুমিত্রা তার বাবা-মাকে জানিয়ে দেয়— 'তোমরা আমাকে কলেজে লেখাপড়া শিখিয়ে এক সেকেলে বাড়ীতে বিয়ে দিয়েছ। সমস্ত বশ্যতা স্বীকার করে আমি আমার জীবনটা নষ্ট করতে পারবো না।' আশালতা সিংহের উপন্যাস ও ছোট গল্পে আধুনিকা মহিলাদের নানাপ্রকার অভীপ্সা ও সমস্যা তুলে ধরেছেন। যুগের ব্যর্থতা, বেদনা, দুর্ভাগ্য ও আশা-স্বপ্নের কথা তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও বিশ্লেষণের দ্বারা ব্যাখ্যাত হয়েছে। তাঁর মূল্যায়ন নেতিবাচক নয়, ইতিবাচক। এ কালের লেখক-লেখিকাদের লেখায় গভীরতা খুব বেশি না থাকলেও, সম্পূর্ণ জীবন অন্বেষণের অভাব ঘটলেও এদের কথা কান পেতে শুনতে ভাল লাগবে। অনেক কথাই মনে ধরবে। আশালতা সিংহের উপন্যাসে বর্ণিত যুগ, মেয়েদের স্বপ্নভঙ্গের যুগ। আগে মানুষ কোন একটা আদর্শের জন্য লড়াই করতো—হয় মরতো, না হয় বাচতো। এখন জীবনে নেমেছে সর্বব্যাপী হতাশা, ব্যর্থতা। নানা সমস্যার দহনজ্বালায় তারা অস্থির, তারা নিঃসঙ্গ। বিনয়, শ্রদ্ধা, কর্তব্য শব্দগুলি এখন বিদ্রূপের মত শোনায়। সমাজ ও পরিবার সম্বন্ধে একালের নারীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বার্থপর, কোথাও আবার উদাসীন। নারীত্ব, মাতৃত্ব নিয়ে তাদের বাড়াবাড়ি নেই। যৌন সম্বন্ধীয় ব্যাপারে এরা পুরানো সংস্কারগুলো ভেঙ্গে ফেলেছে। প্রতিভা বসুর 'মনের ময়ূর'-এর নায়িকা অনসূয়া, 'মালতীদির গল্প'-র নায়িকা মালতীদি, 'মধ্যরাতের তারা'-র নায়িকা সুজাতা কুমারী জীবনে অন্তঃসত্ত্বা হয়েছে। অনসূয়া, মালতী আধুনিক চিকিৎসা বিদ্যার সাহায্যে মুক্তি পেয়েছে এবং আবার তাদের বিয়ে হয়েছে। সুজাতা কুমারী অবস্থায় সন্তান প্রসব করে মারা গেছে। অবশ্য প্রতিভা বসু অমরেশ্বরকে পুত্রটি গ্রহণে বাধ্য করেছেন। একালের অনেক অভিভাবকই মনে করেন—"টাকাই পুরুষ মানুষের মনুষ্যত্ব, টাকাই স্ত্রীলোকের সুখ শান্তি।" (মুক্তি)। 'মুক্তি' গল্পে সবিতার জীবনে বিবাহের পাত্র রূপে এসেছে সুধীর, অবনী পালিত আরো অনেকে। তার মা-র কাউকেই পছন্দ হয়নি। তার মা-র প্ররোচনায় তাকে এদের আসঙ্গ লিপ্সা পূরণ করতে হয়েছে। অবশেষে এল অজস্র টাকার মালিক প্রতাপ সিং। চরিত্রহীন, লম্পট

মানুষটির পাশে চলতে চলতে সবিতার মনে হয়— "সাধ্বী বলতে সাধারণতঃ যা বোঝায় সত্যিই তো সবিতা তা নয়—এ হাত কি আর কাউকেই ছুঁতে দেয়নি? এই শরীরে কি তার অনেক বিষ লুকিয়ে নেই? নাকি এই প্রণয় সম্ভাষণই সে আরো মুখ থেকে শোনেনি? অনেক অসংযম, অনেক অন্যায়—যা করা সত্যিই উচিত নয় তাও সে অনেকবার করেছে।" প্রতিভা বসু নরনারীর দেহগত মিলনের আনন্দ ও রোমাঞ্চের কথা খোলাখুলি ও সবিস্তারে বলেছেন। 'বিচিত্র-হৃদয়' গল্পে সুমন্ত্রর বিধবা পত্নী ভালবেসে ফেললো তারই বন্ধু বিমলেন্দুকে। সুমন্ত্রর কিশোরী কন্যা বিমলেন্দুর স্বাস্থ্য এবং রূপে প্রথম থেকেই অজানা আকর্ষণ অনুভব করছিলো। মার বিবাহের প্রস্তাব শুনে, কন্যা বুলু বিমলেন্দুর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সেও বিমলেন্দুকে বিবাহ করতে চায়। এ হৃদয়ই কেবল বিচিত্র নয়, বিচিত্র মা ও মেয়ের সম্পর্ক ও সমস্যা। 'সুমিত্রার অপমৃত্যু' এবং 'সমুদ্র হৃদয়' উপন্যাসদুটিতে মুসলমান যুবকের প্রণয়পাশে আবদ্ধ হয়েছে হিন্দু যুবতী। সুমিত্রা ভালোবাসলো সত্যেনকে। পরে জানতে পারলো এটা ইউসুফের ছদ্মনাম। ভালবাসার জাত ধর্ম নেই। ভালবাসা মনুষ্যত্বের সর্বোত্তম প্রকাশ। সুমিত্রা সব জেনেই ইউসুফের সঙ্গে পালিয়ে গিয়ে, তাকে বিয়ে করলো। সুমিত্রা জাত, ধর্ম, সমাজশাসনের ভয়ে পিছিয়ে যায়নি। পুলিশ দিয়ে তার বাবা তার স্বামী ইউসুফের কাছ থেকে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে এল। তার উপর নির্মম অত্যাচার করলো। জীবনের গভীর যন্ত্রণার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সুমিত্রা বলেছে—"মারো-মারো-মারো, মেরে ফেল, তবুও বলবো না অন্যায় করেছি, খুন করে ফেল তবুও বলবো না।" সুমিত্রা পাগল হয়ে গেল। একদিন আত্মহত্যা করে মুক্তি পেল। 'সমুদ্র-হৃদয়' উপন্যাসে প্রৌঢ়া জাবেদান্নেসা সুলেখাকে বলেছিল, "প্রেমই জীবন। প্রেমই প্রাণ। প্রেমই একমাত্র সত্য।" কথাটা হাজার হাজার বছরের পুরাতন। নূতন হল জীবনে একে গ্রহণ করার ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী। সুলেখা মুসলমান-বিদ্বেষী, নবাব সুলতান আমেদ হিন্দু-বিদ্বেষী। এই বিদ্বেষ ভালবাসায় পরিণত হল। হিন্দু দাঙ্গাকারীরা নবাবকে হত্যা করলো। তার আগেই সুলেখা নবাবকে তার স্বামী বলে পরিচয় দিয়েছে। এখানে হিন্দু মুসলমানের সামাজিক বা ধর্মীয় প্রশ্ন বড় নয়। বড় হল নারী পুরুষের ভালবাসার প্রশ্ন। উপন্যাসটিতে প্রেমের ক্ষেত্রে অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গীর কথাই বড় হয়ে উঠেছে।

'বিবাহিত স্ত্রী' উপন্যাসে সুনির্মল তার স্ত্রী প্রমীলার আচার ব্যবহারে বিরক্ত। এই বিরক্তিই তাকে পৌঁছে দিয়েছে শকুন্তলার কাছে। সুনির্মল শকুন্তলাকে গভীর

ভাবে ভালবাসে। তাই বারবার শকুন্তলার কর্মস্থল পাটনায় ছুটে যায়। শকুন্তলা 'প্লেটোনিক লাভ্'-এ বিশ্বাসী নয়। তাই সুনির্মলকে বলে—'আমি ত একটা মানুষই, মানুষের মত আমার বাসনা কামনা। এই ভালবাসার পবিত্র বেদিতে দেবী হয়ে বসে থেকে আর আমার মন ভরছে না, প্রাণভরে না। পার্থিব ইচ্ছা প্রচণ্ড হয়ে আমাকে ছিঁড়ে খায়। আমি আর পারিনে—পারিনে।' সবাই জানে সুনির্মল বিবাহিত। শকুন্তলার সঙ্গে তার সম্বন্ধ 'অবৈধ, অন্যায়, ঘৃণিত' তবুও শকুন্তলার মোহ কাটে না।

রাধারাণী দেবী মূলত কবি। রাধারাণী দত্ত, রাধারাণী দেবী, অপরাজিতা দেবী-এই তিন নামেই তিনি কবিতা লিখেছেন। 'আঙিনার ফুল' (১৩৩৪), 'বুকের বীণা' (১৯৩০), 'পুরবাসিনী' (১৯৩২), 'সীথি মৌর' (১৯৩২), 'লীলাকমল' (১৩৩৬), 'বিচিত্ররূপিনী' (১৯৩৭), 'বনবিহগী' (১৯৩৭) কাব্যগ্রন্থগুলি প্রকাশিত হয়। স্বামী নরেন্দ্র দেবের সঙ্গে 'কাব্য দীপালি' সম্পাদনা করেছেন। তাঁর ভালবাসার 'রীতি-নীতি-জাত' নেই। কবি সমাজশাসন, শাস্ত্রের বিধান মেনে মাটির পুতুলের মত বাঁচতে চান না। জীবনের সব বাসনা ও কামনাকে নিজ জীবনে স্বীকার করেছেন। এই স্বীকৃতি যেমন বলিষ্ঠ তেমনি কামনায় কাতর। ভালবেসে কবি জীবনের কঠিন পথে হাসি মুখে চলতে চান।

"পাশে আছে প্রিয়, বুকে আছে প্রেম ভার,
করিনেকো ভয় ধরণীতে কিছু আর।" (সীঁথি মৌর, পৃ-২)।

সংসার, সমাজ বসে বসে তুলাদণ্ডে পাপ পুণ্য, ন্যায় অন্যায় বিচার করুক, কবি প্রেমিকের মধ্যে নূতন জীবনের সন্ধান পেয়েছেন। বাঁচার নূতন মন্ত্র—

"সংসারের নির্মমতা করে না কাতর,
খুঁজিয়া পেয়েছি প্রেমে পরশ-পাথর।" (ঐ, ৩০, সং, কবিতা)।

জীবনকে আর ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিতে প্রস্তুত নন। তাই কবি হতাশাবাদী নন্। ব্যক্তির প্রয়োজনের কাছে তাঁরা আর কিছুকেই প্রাধান্য বা প্রশ্রয় দিতে প্রস্তুত নন্। 'যৌবনের উন্মাদনাকে সংযত করা যেতে পারে কিন্তু তার আবেদনকে নিষ্ফল করা চলতে পারে না। তাকে প্রবীণরা সুপরিচালিত করতে পারেন কিন্তু তার চলার পথ রুদ্ধ করতে পারেন না।'[২৯] দেহ মনের ক্ষুধাকে সমাজ শাসনের ভয়ে উপেক্ষা করতে প্রস্তুত নন্। ('সারা তনু মনে আছে শুধু রুক্ষ ক্ষুধা')। 'উতলা-অধীর যৌবন'কে কবি সঁপে দিতে চান তাঁর প্রেমিকের বাসনার সায়রে। কবির জীবনে প্রেমের ক্ষেত্রে সামাজিক ও পারিবারিক দিক থেকে নানা বাধা হয়তো এসেছিল।

কাব্যে বারবার তার উল্লেখ দেখি। কবি জাগতিক সুখের বাসনাকে দার্শনিক ব্যাখ্যার বঞ্চনায় ভুগতে দেননি।

অপরাজিতা দেবী ছদ্মনামে রচিত কবিতাগুলিতে পুরুষোচিত ভাব ও ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। 'কাব্য দীপালী'র 'শেষ রাত্রি' ও 'পুববাসিনী' কাব্য গ্রন্থের 'নববধূ' কবিতায় কবির কামনার উগ্র প্রকাশ ঘটেছে। ডঃ সুকুমার সেন, অপরাজিতা দেবী ছদ্মনামে রচিত কবিতাগুলির মধ্যে কিরণধনের কবিতার সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন।[৩০]

বাণী রায়ের প্রথম উপন্যাস 'প্রেম' (১৯৪৬)। উপন্যাসটির নায়িকা রূপালীর জীবনে কলেজের অধ্যাপক, গানের শিক্ষক, চিত্রশিল্পী, বোনের ননদের স্বামী, মোটর চালক, পাঞ্জাবী ঠিকাদার, আমেরিকান অতিথি, সঞ্জীব, ইন্দ্রজিৎ এবং কর্মচারী পুত্র নানাভাবে তার দেহের ও মনের সংস্পর্শে এসেছে। রূপালী স্ত্রী-পুরুষের যৌন মিলনেব কথা ভাবতে ভালবাসতো এবং যখনি সে দৈহিক মিলনের উদগ্র বাসনা অনুভব করেছে তখনি কল্পনায় প্রিয়ের সাথে মিলিত হয়েছে। যৌন মিলনের নানা অবস্থার কথা ভেবে তৃপ্ত হয়েছে। পরে তার জীবনে অনেকেই এসেছে সবাই তাদের উদ্দেশ্য পূরণ করে চলে গেছে। আজ তার বয়স চল্লিশ। সবাই যখন নানাভাবে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ঘর সংসার করছে রূপালী তখন নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করছে। ইন্দ্রজিৎ ব্যারিষ্টার, তাকেও শেষে ফিরিয়ে দিল রূপালী। "ইন্দ্রজিতের প্রেম, স্মরণে শিহরণ আনে। সে জেগে উঠে চায় তৃপ্তি। কামনাকে জাগানহয়েছে প্রেমের উপাচারে। এখন তাকে খোরাক দাও। সুতরাং বিবাহ।" এই হল রূপালীর ব্যাখ্যা। রূপালী বিশ্বাস করে না দেহ কামনা ব্যতীত পুরুষের আর কিছু আছে।

বাণী রায়ের দ্বিতীয় উপন্যাস 'শ্রীলতা ও সম্পা' ১৯৪৮-এ প্রকাশিত হয়। প্রাচীন জমিদার পরিবাবেব মধ্যযুগীয় বিধিনিষেধের প্রাচীরে আবদ্ধ জীবনের মাঝখানে, শ্রীলতা ও সম্পা দুই বোন উচ্চশিক্ষা লাভ করলো। শ্রীলতা কিশোরী বয়স থেকেই প্রেম চর্চা করেও দীপঙ্করের বাহুবন্ধনে ধরা দিল না। তার অত্যুগ্র স্বাধীনতা স্পৃহা তাকে ধনীর অন্তঃপুরের চেয়ে কেরাণীগিরির জীবিকা গ্রহণে প্রণোদিত করেছে। এর পরের ঘটনা দীপঙ্করের অভাবে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করছে শ্রীলতা। সম্পার জীবনে পারিবারিক মূল্যবোধের খড়্গ নেমে এসে মধ্যপথেই তার ভালবাসায় ছেদ টেনে দিয়েছে।

প্রতিভা বসু এবং বাণী রায়ের উপন্যাসে দেখি মেয়েদের জীবনে নিঃসঙ্গতা নেমে আসছে। জীবনে তাদের সঙ্গীর অভাব নেই। কিন্তু জীবনসঙ্গী নির্বাচনে তারা ব্যর্থ হচ্ছে। অথচ দেহ মনের মিলন প্রায় ক্ষেত্রেই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, ভারতের স্বাধীনতালাভ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, বাংলা বিভক্তি এবং পশ্চিমবঙ্গে অগণিত ছিন্নমূল মানুষের আগমন সামাজিক জীবনে বিপর্যয় ডেকে আনলো। নারীর আব্রু, মর্যাদা, অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য নষ্ট হয়ে গেল। পারিবারিক জীবনের উপর বড় আঘাত এল। জীবিকা ও আবাসের জন্য সংগ্রাম করতে যেয়ে অনেক ক্ষেত্রেই তারা ভারসাম্য হারিয়ে ফেললো। এই অস্থিরতার মধ্যে মেয়েরাও আর ঘরে বসে থাকতে চাইলো না। নারী বলে এতদিন তারা যে অনুকম্পা, সহানুভূতি পেয়ে আসছিল, তা নানা কারণেই বন্ধ হল। সে না চাইলেও পুরুষ প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠলো। এই প্রতিযোগিতায় নারীকে জীবনের নানা ক্ষেত্রে পারদর্শিনী হতে হল।

১৯৪০ সালের স্টেট্‌সম্যান পত্রিকায় লক্ষ্মী মেনন বলেছিলেন, নারীদের দৃষ্টিভঙ্গী বলে স্বতন্ত্র কোন দৃষ্টিভঙ্গী নেই। সব সমস্যাই সমাজের, সুতরাং নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের। বাণী রায় তাঁর 'লেখিকা মন' সংকলন গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন—"একটি অর্থহীন উক্তি প্রায়ই শুনি যে, মেয়েদের লেখা মেয়েলী। তাহলে কি ছেলেদের লেখা সম্বন্ধে মন্তব্য হবে যে লেখার দোষে লেখাগুলি পুরুষালী? রচনার এমন এক একটি স্তর আছে যেখানে স্থানবিশেষে মহিলা-কলম উপযোগী।"... আজকাল মেয়েরা নারী হবার পূর্বেই ব্যক্তি হতে শিখেছে। নারী-পুরুষের দেহগত পার্থক্য হেতু মানসিক দিক থেকেও কিছু পার্থক্য দেখা দেওয়া অস্বাভাবিক নয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পর সারা বিশ্বে কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতীদের অবাধ মেলামেশাকে প্রশ্রয় দেওয়ার ফলে যৌন স্বাধীনতা এসে গেল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এবং ভারত বিভক্তির পর ভারতীয় জীবনেও তার যথেষ্ট প্রভাব দেখা গেল। প্রেম, বিবাহ, সংসার, সন্তান প্রভৃতি সম্বন্ধে নারী-পুরুষের ধ্যান-ধারণাও পালটে যেতে থাকে। এ বিষয়ে নারী-পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গী অভিন্ন।

১৯৫০, ২৬ জানুয়ারী গৃহীত নূতন শাসনতন্ত্রে নারীদের পুরুষের সমমর্যাদা ও অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করার ফলে নারী মুক্তি আন্দোলনের ধার ক্ষয়ে গেল। এতদিন নারীরা ভোটাধিকার, নারীর শিক্ষা, চাকরীগত অধিকারের পক্ষে আন্দোলন করছিল। আজ সেই সব রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকার লাভের পর তারা নিজেদের দিকে একান্তে তাকাবার সুযোগ পেল। এবার আরম্ভ হয়েছে নতুন যুগ। নারীরা এখন বাইরের জগতে পুরুষের সহকর্মী—তাদের রচনায় তাই সহধর্মিণীর নয়, সহকর্মিণীর নানা সমস্যা ও বৈসাদৃশ্যের কথা থাকবে। মেয়েরা বর্তমান তিন চার দশক ধরে ঘর ও বাইরের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করতেই হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। একদিকে সে

ভারতের শ্রম-শক্তির অংশীদার, আর একদিকে জননী, ভগ্নী, প্রেয়সী ও গৃহিণী প্রভৃতি পরিচয়ের মমত্বে জড়িয়ে আছে।

মেয়েদের আত্মবোধ আজ আবার এক নতুন সংকটের মুখে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এতো হোল উচ্চবিত্ত বাঙ্গালী বর্ণহিন্দুর গৃহের কথা। বাঙ্গালার অন্ত্যজ ও দরিদ্র শ্রেণীর নারী জীবন কি সাহিত্যে অবহেলিত থাকবে? মধ্যবিত্তের চোখে দেখা তাদের কিছু কিছু পরিচয় শরৎচন্দ্র, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর সাহিত্যে এসেছে। শরৎচন্দ্রের 'অভাগীর স্বর্গে' দুলে সমাজ এবং তাদের মেয়েদের জীবনের ছবি, 'মহেশ' গল্পের গফুর-আমিনার মধ্যে দরিদ্র মুসলমান কৃষক পরিবারের চিত্র যথেষ্ট দরদ দিয়ে চিত্রিত হয়েছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি'-র মৎস্যজীবী সম্প্রদায়, 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পে দরিদ্রের ক্ষুধা (উদর এবং যৌন) উপস্থিত হয়েছে। তারাশঙ্করের মহৎ শিল্পসাধনার দর্পণে জীবনের বিচিত্র রূপ ফুটে উঠেছে। 'কালিন্দী-র সাঁওতাল রমনী সারী, 'কবি'-র বসন, ঠাকুরঝি এবং ঝুমুর সম্প্রদায়ের এমন জীবননিষ্ঠ পরিচয়, 'বেদেনী', 'নাগিনী কন্যার কাহিনী', 'হাঁসুলি বাকের উপকথা' প্রভৃতির নারী চরিত্রগুলি ইতিপূর্বে বাঙ্গালা সাহিত্যে ছিল না। উদাহরণ আরোও দেওয়া যেত—বাহুল্যবোধে বিরত হলাম। নারীজীবনের নানা সমস্যা উত্থাপিত হলেও নিম্নশ্রেণীর নারীরা এখনও তাদের বক্তব্য উপস্থাপিত করতে পারেনি। তাদের কথা হয়তো একদিন তারাই বলবে, ময়মনসিংহ গীতিকার গল্পগুলির মত সহজ, সরল ও জীবনধর্মী করে। জীবন আজ পুরাতন গুহায় ফিরবে না। আজ একটি প্রশ্নই তাদের কাছে বড় হয়ে উঠেছে, কোন পরিচয় তার বড় হবে, স্ত্রী-পরিচয়ে না সহকর্মী পরিচয়ে? বাংলা উপন্যাস এখনও তার যথাযথ উত্তর দিতে পারেনি। ভবিষ্যতের জন্য তা মুলতুবী থাকল।

পাদটীকা

১. A Room of One's Own—Virginia Woolf, 1954, P—58.

২. Women's part in the New Renaissance-Lucia A. Zimmern, Modern Review, May, 1923, P—622.

৩. নারীর উক্তি—ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, আদর্শ, পৃঃ ৬৪—৬৫, ১ম সং

৪. ঐ ঐ ঐ ঐ

৫. ঐ ঐ ঐ ঐ

৬. ঐ ঐ স্বপ্রভা, পৃঃ—২৫

৭. Women Civil Resisters, Modern Review, 1922, P—249

৮. Modern Review, 1922, P—102

৯. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (৪র্থ খণ্ড)— ডঃ সুকুমার সেন, পৃঃ—১৯৪

১০. সাহিত্যে নারী : স্রষ্টা ও সৃষ্টি-অনুরূপা দেবী, ১৯৪৯, পৃঃ—৪২৬

১১. বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা—ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ—৩২০

১২. বঙ্গীয় কথা সাহিত্যে লেখিকা—বাণী রায়, রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা, ৯ম বর্ষ সংখ্যা-৪, পৃ—৩৫২

১৩. Modern Bengali Literature—Surendra Nath Sen, Calcutta Review 1924, P—48

১৪ British Policy and the Muslims in Bengal (1757-1856)-Azizur Rahaman Mullick, Dacca 1961, P—26

১৫. শৈলবালা ঘোষজায়া স্মরণে —অধ্যাপক পরিমল চক্রবর্তী, সাহিত্যিক বর্ষ পঞ্জী, ১৩৮২, পৃঃ—৬৪

১৬. Bengali Muslim Public Opinion as Reflected in the Bengali Press, 1973.-Mustafa Nurul Islam Bangla Academy, P—143

১৭. The Emancipation of woman in Bengal-P. C. Mozoomder, Calcutta Review 1904, P—128

১৮. বাংলার নারী জাগরণ—প্রভাত চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, ১৩৫২, পৃঃ—৯২

১৯. The Psychology of Women—Helen Deutsch M.D , 1946, P-150

২০. নারী-প্রতিভা—জ্যোতির্ময়ী দেবী, ভারতী ১৩৩১, পৃঃ—৮০০

২১. নারীর উক্তি—ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, ভূঃ—৭০

২২. কল্লোলের কাল—ডঃ জীবেন্দ্র সিংহরায়, পৃঃ—১৫

২৩. The Twentieth Century Mind—Ed. C.B.Cox & A E. Dyson, Oxford, Vol-11, Introduction-X,

২৪. জাতীয় আন্দোলনে বঙ্গনারী—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ—২৭

২৫. Modern Review, April 1923, Woman Labour in Mines-Kamini Roy. P—24

২৬. All India Women's Conference, 17th Session, 1944, P—1

২৭. ঐ ঐ P—24

২৮. প্রবাসী, ১৩৫৭, ফাল্গুন, প্রাচীন ও নবীন সাহিত্য—শান্তা দেবী, পৃঃ—৪১২-১৫

২৯. মাসিক বসুমতী, বৈশাখ-আশ্বিন, ১৩৫৩ যৌবনের ভ্রান্তি—শ্রীনন্দিতা দাশগুপ্তা পৃঃ—২২১

৩০ বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস (৪র্থ খণ্ড)—ডঃ সুকুমার সেন, ১৯৫৮, পৃঃ—২৬৩।

সমাপ্ত

॥ নির্ঘণ্ট ॥

॥ অশুদ্ধি-সংশোধন ॥

পৃষ্ঠা	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
৩	প্রস্থত	প্রস্তুত
৭	লক্ষণ	লক্ষ্মণ
৬৭	বাজায়ে	বাজারে
৬৭	ইন্‌পেকটার	ইন্‌সপেকটার
৬৮	গৃবসংস্কার	গৃহসংস্কার
৬৯	propositin	proposition
৬৯	ore	one
৬৯	preents	presents
৭২	lfe	life
৭৩	পারিজীবন	পারিবারিক জীবন
৭৫	অপ গ্রন্থ	অপর গ্রন্থ
৭৫	নেট ফরাসী	সেই ফরাসী
৮৫	মদন মাধুরী	মদন মঞ্জরী
১০১	মিসেস ব্রাউনিং	মিঃ ব্রাউনিং
১৪২	স্বপ্নবা-র	স্বপ্নবাণীর
১৪৫	12th century	19th century
১৭৩	বৎস	বৎসর